দেওয়াল

দ্বিতীয় খণ্ড

বিমল কর

প্রথম প্রকাশ

ফাল্গুন ১৩৬৪

প্রকাশক

শ্রীগোপালদাস মজুমদার

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদশিল্পী

সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক

শ্রীতীর্থপদ রাণা

শৈলেন প্রেস

৪ সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা

দাম : ছ'টাকা

'দেওয়াল' তিন খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাস। প্রথম খণ্ড 'ছোট ঘর'; দ্বিতীয় খণ্ড 'ছোট মন'; তৃতীয় খণ্ড 'খোলা জানালা'। বর্তমান গ্রন্থটি দ্বিতীয় খণ্ড।

এই উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক। তথাপি কোন চরিত্রের সঙ্গে যদি নামে অথবা কোন বিষয়ে কোথাও মিল ঘটে যায় সেটা সম্পূর্ণ-ই আকস্মিক। বলা বাহুল্য, যে-অঞ্চল মুখ্যত এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল—সে-অঞ্চলের একটি গলির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

শ্রীবিমল দত্ত

বন্ধুবরেষু

ছোটমন

দ্বিতীয় খণ্ডের ঘটনাকাল ১৯৪২-এর জুলাই থেকে
১৯৪৩-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত

ভোররাতে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বাতাসের দাপট, জলের ঝাপটা আর মেঘের ডাক থামল সকালে। শ্রাবণের আকাশ-ভাঙা বৃষ্টিতে এরই মধ্যে রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে। রোদ ওঠেনি। আকাশের চেহারাটা ফরসা নয়। জমাট কালো মেঘ ভেসে আসছে উত্তর থেকে, মাঝ-আকাশের কাছাকাছি পৌঁছে চিড় ধরছে তার মাথায় মাথায়। ফাটা ফাটা মেঘের তখন আলুথালু ভাব। ধোঁয়ার এক একটা কুণ্ডলী যেন পাক খেয়ে খেয়ে পশ্চিমের স্থির আঁট-সাঁট থমথমে আকাশে মিশে যাচ্ছে।

কর্পোরেশনের লোক জল দিতে রাস্তায় নামে না এমন সকালে, শহর প্লাবনে এইটুকু হঠাৎ-ছুটির সুখ তাদের। গ্যাসের আলোগুলো নিভতে চায় না সহজে। ঝাড়ুদার জমাদার পাড়া ছাড়া। ময়লা ফেলা ঠেলা-গাড়ি গলি-ঘুঁজির ত্রিসীমানায় মুখ গলাবে না আর। হয়ত সারাদিনই। জল সরে যাবার পরও।

বহুবাজারের ফটিক দে লেনের চেহারায় চটক নেই। লতায় পাতায় যতটা বাড়, গায়ে গতরে ততটা খাটো। হাড়-জিরজিরে কৃশ-করুণ, গড়নটা পর্যন্ত অদ্ভুত। কচ্ছপের পিঠের মতন অনেকটা; দু'দিকে ঢালু, মাঝখানটা উঁচু। গলিতে জল জমলে দু'পাশ থৈ থৈ। খড়কুটো নোঙরা এঁটোকাঁটা মল-ময়লা ভাসতে ভাসতে অন্যের সদরে ঢুকে যায়।

এগারোর এক বাড়িটা সুধাদের। নীচু ভিতের বাড়ি। রাস্তার জমি লাগিয়ে সদর। দরজা বন্ধই ছিল। রাস্তার জল আটকাচ্ছিল বোধ হয়।

এমন দিনে, এই রকম বিশ্রী সকালে সুধাদের বাড়ির সদরে কড়া নড়ে উঠল। একটা ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। অর্ধেকের

ওপর ঢাকা জলের তলায়। ভেঙে মচকে, ঘোড়া-সমেত মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে যেন এই এসে দাঁড়াল।

বাসু বাড়ি নেই। সুধা তাড়াতাড়িতে চাল ডাল সেদ্ধ করে নিচ্ছিল রান্নাঘরে। রত্নময়ীর জ্বর। জ্বর গায়েই উঠতে চেয়েছিলেন, সুধা ধমক দিয়ে থামিয়েছে। দিদির পাশে বসে আরতি হাতে হাতে মশলা নুন এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছিল।

নীচে, সদরে কড়া নড়ে উঠতে আরতি ভেবেছিল বাসু। বিরক্তমুখে দরজা খুলে দিতে গিয়ে দেখে নতুন মানুষ। দরজার সামনে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড় করানো।

'এটাই তো এগারোর এক ?' ঘোড়ার গাড়ির দরজার ফাঁক থেকে মাথা গলিয়ে বুড়ো মতন এক ভদ্রলোক শুধোলেন।

মাথা নোয়াল আরতি। হ্যাঁ, এগারোর এক বাড়ি। খুব অবাক আর কৌতূহলী হয়ে গাড়ির মানুষদের দেখছিল ও। এরা কে ! কেন এসেছে !

'বাড়িতে তোমার বড় কে আছেন ? দিদি, মা এঁরা আছেন না ?' গাড়ির ভদ্রলোক আরও একটু মুখ বাড়িয়ে বললেন। ঝুঁকে-পড়া একটি মেয়ে ওঁর আড়ালে দেখা যাচ্ছিল। বেঁটে আর মোটা মতন। উলটো দিকের সিটে বসে রয়েছে একটি রোগাসোগা চেহারার ছেলে। কোলের ওপর সুটকেস। পাশে দড়িবাঁধা মোটকা এক বিছানা ঠাসা। পায়ের তলার জায়গাটুকুতে জিনিসপত্র। কোনোগতিকে তার ওপর পা তুলে সব বসেছে।

'মার অসুখ।' আরতি ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'দিদিকে ডেকে দেব ?'

মাথা হেলালেন ভদ্রলোক। দিদিকে ডেকে আনতে ছুটল আরতি।

খিচুড়ির হাঁড়ি উনুনে চাপিয়ে সুধা একটু বিরক্ত মুখেই বসেছিল। সামনে আনাজের ছোট ঝুড়িটা পড়ে আছে। দু'তিনটি আলু আর কয়েকটা কাঁচা-লঙ্কা ছাড়া আর কিছু নেই তাতে। রাতটা এই দিয়ে চালাতে হবে। এ-বেলা শুধু খিচুড়ি। তাও তাতে তেল নেই, ঘি নেই। বিশ্রী বিস্বাদ এক গন্ধ

উঠছে হাঁড়ির মুখ থেকে। আজ ক'টা টাকা ধার করতে হবে। পাঁচটা টাকা পেলে ভালই হয়, মাসের এই শেষ দু'তিনটে দিন কেটে যাবে কোনো-গতিকে। কিন্তু ধার পেলে হয়। কাল অবশ্য অমলাদিকে বলে রেখেছে সুধা। নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি। 'আমায় ক'টা টাকা দেবে অমলাদি; বাড়িতে আর একটাও নেই', ও বলেছিল। জবাবে মাথা নেড়েছে অমলা। দেবে। কিন্তু যা বৃষ্টি আজ, অমলাদি এই বৃষ্টিতে অফিসে এলে হয়। সুধাই বা কি করে যাবে? গলিটা ত নদী নালা হয়ে রয়েছে। পয়সা থাকলে রিকশায় যাওয়া যেত—অন্তত বড় রাস্তাটুকু পর্যন্ত। পয়সা যখন নেই তখন হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে, খালি পায়ে যত-রাজ্যের নোংরা জল ঘাঁটতে ঘাঁটতে চল। সুধা পায়ের ওপর কাপড় তুলতে পারে না। তার খারাপ লাগে, বিশ্রী লাগে। এর ফলে শাড়িটাও আজ নষ্ট হবে। শুধু নষ্ট নয়, ওই ভিজে জবজবে নোংরা শাড়িটা পায়ের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেপটে থাকবে। কী অস্বস্তি! আবার ফিরে এসে কাচো সাবান দিয়ে। যতই ভাবছিল সুধা, ততই বিরক্ত হচ্ছিল।

রত্নময়ী ডাকছিলেন। সাড়া দিল সুধা। আরতিও যে নীচে গেছে সদর খুলতে, তা জন্মের মতনই গেছে। ফেরবার নাম নেই। হয়ত দরজা খুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে বাসুর কোনো বন্ধুর সঙ্গে। হ্যাঁ, আজকাল সুযোগ সুবিধে পেলেই আরতি দাদার বন্ধুদের সঙ্গে খানিকটা আড্ডা দিয়ে নেয়। সুধার চোখে পড়েছে। বারণ করে দিয়েছে বোনকে। কিন্তু সে-বারণ আরতি যে কতটা শুনছে এবং না-শুনছে সেটা ভগবানই জানেন। নীচের তলায় বাসু আজকাল দুপুরে তাস আর খোশগল্পের আড্ডা বসিয়েছে। সুধা তখন অফিসে থাকে। কাউকে তোয়াক্কা করার কিংবা ভয়ডর করার কিছু নেই। বাসুর বন্ধুরা আসে। বিকেল পর্যন্ত আড্ডা দেয়। আরতির ডাক পড়ে যখন তখন, জল দিতে, কেটলি দিয়ে আসতে, চায়ের গেলাস-বাটি খুলিয়ে দিতে।

ব্যাপারটা পছন্দ করেনি সুধা। রত্নময়ীও খুব খুশী নন। বাসুকে নিষেধ করতে গিয়ে ভাইবোনে বিশ্রী এক ঝগড়া বেঁধে উঠেছিল। তারপর মায়েতে

ছেলেতে। এবং শেষাবধি যা হয়, দশ কথায় কথা বেড়ে এমন সব প্রসঙ্গ উঠল যার ফলে সুধা এবং রত্নময়ীর মধ্যে কথা কাটাকাটি, রাগবিরাগ, মান অভিমানের একটা ঝাপটা বয়ে গেল।

তারপর থেকে সুধা চুপ হয়ে গেছে। সহজে আর কথা বলে না, বলতে চায় না।

রত্নময়ী আবার ডাকলেন। আরতি আসছে না দেখে সুধা পিঁড়ি ছেড়ে উঠল। রান্নাঘরের চৌকাট ডিঙোতেই আরতির মুখোমুখি।

'তোমায় ডাকছে দিদি।'

সুধা ছোট বোনের অবাক বোকা এবং কৌতূহল ভরা মুখের দিকে বিরক্ত চোখেই তাকাল। 'আমায়—?'

আরতি ঘাড় নোয়াল। 'তোমাকেই ডেকে দিতে বলল। ঘোড়ার গাড়ি করে দু'তিনজন লোক এসেছে। সঙ্গে বিছানা বাক্স!'

সুধা অবাক। তাদের বাড়িতে আবার কে আসবে? কে আছে তাদের? ভাবতে গিয়ে সুধার কপালে যেন আরও খানিকটা বিরক্তি ফুটে উঠল। 'এই বাড়ি? ঠিক জানিস? অন্য কোনো বাড়ি খুঁজছে না ত?'

'নম্বর বলল। তোমাকেই ডাকছে।'

রত্নময়ীর ঘরের দিকে দু'পা এগিয়ে সুধা বললে, 'নীচে নাকি কারা এসে ডাকছে, দেখে আসছি।' কোমরের আঁচলটা গায়ের উপর টানতে টানতে সুধা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পিছু পিছু আরতি।

নীচে নেমে এসে সুধা দেখল, সদরের চৌকাটের কাছে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। বয়স্ক মানুষ। বেশ লম্বা। মাথা কপাট ছাড়িয়ে এই অল্পউঁচু পথটার ছাদ ছোঁয়-ছোঁয়। রঙ না-ফরসা না-কালো। মাথার চুল অর্ধেক প্রায় পাকা। চোখে চশমা। পরনে খদ্দরের মোটা ধুতি পাঞ্জাবি। ধুলি মলিন।

'তোমার নাম সুধা?' সুধা কাছে আসতে ভদ্রলোক শুধোলেন।

মাথা নাড়ল সুধা। 'হ্যাঁ।'

'আমরা আসছি হেতমপুর থেকে।' ভদ্রলোক বুকপকেট থেকে

হাতড়ে একটা চিঠি বের করে এগিয়ে দিলেন, 'বলাইবাবু এই চিঠিটা তোমাদের দিয়ে দিয়েছেন। এ বাড়ির নীচের তলাটা আমরা ভাড়া নিয়েছি।'

সুধা অপলক চোখে ভদ্রলোককে দেখছিল। এবার হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল।

গাড়ির মধ্যে থেকে ততক্ষণে কোনোগতিকে পা বাড়িয়েছে মেয়েটি। ভদ্রলোক বলছিলেন, মেয়েটিকে লক্ষ্য করেই, 'লাফালাফি করতে যাস না তুই উমা, পারবি না। ধীরে সুস্থে নাম। জলে পা দিয়েই।'

ধীরে সুস্থেই নামল উমা। তবু মাথায় একটা ঠোক্কর খেল গাড়ির দরজায়। জলের মধ্যে ঝপ্‌ করে পড়ল। যেন ডুবেই গেল অর্ধেকটা দেহ।

সদরের কাছে উঠে আসতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সুধা ভীষণ অবাক। আরতি অর্ধস্ফুট একটা শব্দ করে উঠেছিল প্রায়।

উমার চেহারাটা দেখলে চমকেই উঠতে হয়। বিস্ময়ে এবং ভয়ে। মাথায় এতটুকুন—দশ বারো বছরের মেয়ের মতন, কিন্তু গায়ে যেন উনিশ-বিশ বছরের বাড়। পা দেখা যাচ্ছিল না, হাত আর মুখ আর মাথা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। বয়স্ক মেয়ের সবটুকু পরিপুষ্টতা সেখানে। মোটা মোটা গোল হাত, গলাটা ছোট কিন্তু মোটা, মুখ চৌকো ধরনের। সে-মুখ লালিত্যহীন। গালের হাড় বড় প্রখর, ভাঙা চিবুক, চোখ দু'টো ছোট, ভোঁতা নাক। উমার নীচের ঠোঁটটা এত পুরু যে ঝুলে পড়েছে, সামনের ক'টা দাঁত সব সময় বেরিয়ে থাকে। সমস্ত মুখখানার চেহারাই এতে যেন আরও কুৎসিত হয়েছে। কেমন যেন নির্বোধ, পশু পশু দেখায়। গায়ের রঙটা কিন্তু ফরসা উমার, বড় বেশি ফরসা, কট্‌কট্‌ করছে। চোখে লাগে।

পাতা-পাড় ঘোর নীল শাড়ি পরে অত টুকুন চেহারার মেয়েটা যখন চৌকাট ছাড়িয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, সুধা আর আরতি তখন চমকে না উঠে পারে নি। জীবনে এ-রকম অদ্ভুত চেহারার মেয়ে তারা আর দেখে নি। এ-পাড়াতেই একটা মুচি ছিল, মাথায় হাত তিনেক, গাট্টা-গাট্টা চেহারা, লোকে বলত বামন। উমাও তাই।

জলের মধ্যে নেমে আসতে গিয়ে উমার প্রায় কোমর পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। শাড়িটা পায়ে লেপটে গেছে। জল ঝরছিল চুঁইয়ে চুঁইয়ে মেঝের ওপর। আর চৌকাট ডিঙিয়ে ভেতরে এলেও সুধা বা আরতির দিকে চোখ নেই তার। ঘোড়ার গাড়ির দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

আরতি উমার ঘাড়ের ভাঙা খোঁপা দেখছিল। বেশ বড়, আঁট খোঁপা, কাঁটা গোঁজা। মাথার দিক থেকে দেখলে মনেই হয় না, অত বড় খোঁপার মেয়েটা মাত্র ওইটুকুন, পাশাপাশি দাঁড়ালে আরতিরও বুকের তলায় পড়বে হয়ত।

ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে থেকে এবার রোগা মতন ছেলেটি পায়ের কাছের জিনিসগুলো একে একে বাড়িয়ে দিচ্ছিল, আর ভদ্রলোক ধরাধরি করে সদরের এ-পাশে এনে রাখছিলেন।

গাড়িঅলা ছাদ থেকে দু'টো ভিজে ভিজে তোরঙ্গ নামিয়ে দিল। রাস্তার জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই তোরঙ্গ ধরতে, সদরের গলিতে এনে তুলতে হিমসিম খেয়ে গেল ছেলেটি।

জিনিসপত্র নামানো সব শেষ। 'গাড়ির মধ্যেটা একবার ভাল করে দেখে নাও, নিখিল।' ভদ্রলোক জামার ভেতর ফতুয়ার পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে ভাড়ার টাকা গুণে-গেঁথে ঠিক করতে লাগলেন।

গাড়ির মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে নিল নিখিল। না, কিছু পড়ে নেই।

ভাড়াটাড়া মিটোতে খানিকটা সময় গেল। কোমর-ডোবা জল ঠেলে ঘোড়ার জান মারতে মারতে এসেছে গাড়িঅলা, এত সরু গলি জানলে আসত না। ইয়ে গলি হ্যায় না নালি হ্যায় বাবুজী ; ফের ভি লোট্না হোগা। এখন ফিরে যেতে পারলে বাঁচে। ভাড়া যা ঠিক হয়েছিল তার ওপর আরও দু'টো টাকা দাও।

ভদ্রলোক দিতেই চেয়েছিলেন আগেভাগে, তবে দু' টাকা নয়, আনা বারো। এক টাকায় শেষ পর্যন্ত রফা হয়ে গেল।

সুধারা দু' বোন এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়েছিল। যেন দাঁড়িয়ে থাকাটাই তাদের একমাত্র কর্তব্য এখানে। আরতি তখনও থেকে থেকে উমাকে

দেখছে! রোগাসোগা ফরসা মতন ছেলেটির সম্পর্কে কারও বিশেষ কোনো কৌতূহল নেই। নেহাত চোখে পড়েছে ছেলেটা, এক পলক তাই দেখে নিয়েছে তাকে। ছিটের একটা শার্ট আর মালকোঁচা দেওয়া ধুতি, পায়ে কাবলি জুতো, উস্কোখুস্কো একমাথা চুল, চোখে চশমা। চেহারাটা শুধু নয়, মানুষটাই চোখে না পড়ার মতন। চৌকাটের এ-পাশে টাল করে ফেলা জিনিসপত্র নিয়ে এখনও সে ব্যস্ত। কিছুই করছে না, তবু মাথা হেঁট করে কোমর নুইয়ে এটা টানছে, ওটা ঠেলছে।

ভদ্রলোক এবার সুধার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল বুঝি সারা রাত ধরেই বৃষ্টি হয়েছে?'

মাথা নাড়ল সুধা। না। 'ভোররাত থেকেই হচ্ছে।'

ভদ্রলোক একপাশ কাত করে এমন ভাবে সামান্য একটু মাথা হেলালেন, যার অর্থ, তাতেই এই অবস্থা!

একটু এলোমেলো অকারণ চুপচাপ। ভদ্রলোকই শেষে বললেন, 'নীচের ঘরটরগুলো তা হলে এবার খুলেটুলে দিলে—'

সুধার খেয়াল হল। তাই ত' এতক্ষণ বোকার মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? ওদিকে উনুনে খিচুড়ির হাঁড়ি চাপান। পুড়েঝুড়েই গেল বোধ হয়। 'ঘরটর খোলাই আছে। আসুন আপনারা।' সুধা বললে, বলে আরতির দিকে চাইল, 'এঁদের সব দেখিয়ে দে।'

কথাটা শেষ করে সুধা চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে হল, ফিরে দাঁড়াল। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে, একটু যেন কৈফিয়ত দেবার মতন করে বলল, 'আমি রান্না চাপিয়ে এসেছি। ও আপনাদের সব দেখিয়ে দেবে।' সুধা আর দাঁড়াল না।

খিচুড়ির হাঁড়ি রত্নময়ী নামিয়ে ফেলেছেন। তলা ধরে গন্ধ বেরুচ্ছিল। সুধা এসে দেখে, রত্নময়ী বসে বসে খুন্তি দিয়ে তলাটা নাড়ছেন।

'পুড়েছে?'

'আর একটু হলেই পুড়ত। তলাটা ধরেছে।' রত্নময়ী মেয়ের দিকে

তাকালেন না। খুন্তির আগায় একটু তলানি নিয়ে গন্ধ শুঁকলেন, ছেলে-মেয়েগুলো এ-অন্ন মুখে দিতে পারবে কি না পরখ করলেন যেন।

'তুমি সরো, আমি দেখছি।' সুধা মার পাশে বসে পড়ল।

দেখার অবশ্য আর কিছু ছিল না। হাঁড়িটা একপাশে সরিয়ে রেখে ছোট থালা চাপা দিয়ে দিলেন রত্নময়ী। ঘটির জলে ভাতের এঁটো হাত ধুয়ে নিলেন।

'কে এসেছিল নীচে?' রত্নময়ী একটু পিছু ফিরে ধোঁয়ার কালিতে চিট্ ধরে-যাওয়া কালো কুচকুচে তেথাকা থেকে একটা কৌটো নামিয়ে নিলেন।

ভদ্রলোকের দেওয়া চিঠিটা এতক্ষণ হাতেই ধরা ছিল। সময়ই পায়নি সুধা দেখবার।

'নীচের তলায় নতুন ভাড়াটে এল।' জবাব দিল সুধা। খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের করতে করতে বললে আবার, 'এক বুড়ো মতন ভদ্রলোক, বড়-সড় দুটি ছেলেমেয়ে।'

রত্নময়ীর হাত থেমে গিয়েছিল। মেয়ের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকলেন।

'বলাইবাবু চিঠি দিয়েছেন।' সুধা চিঠি পড়তে পড়তে বলল।

সুধা চিঠি পড়ছে। কাজেই রত্নময়ীকে চুপ করে থাকতে হল। সেই ফাঁকে তার হাত দুটো আবার নড়েচড়ে উঠল। একটা বাটি টেনে নিয়ে কৌটো থেকে সবটুকু বেসন ঢেলে নিলেন। অল্পই ছিল। কৌটোটা ঠুকে ঠুকে গায়েরটুকু পর্যন্ত। জল ঢাললেন সামান্য। গুলতে বসলেন।

চিঠি পড়া শেষ হল সুধার। মার দিকে চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বলাইবাবুর জানাশোনা লোক।'

রত্নময়ী পরিষ্কার করে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। নতুন ভাড়াটেই বা কোথা থেকে এল, বলাইবাবুর চিঠিই বা কিসের?

'তুই পড়, আমার বেসন-গোলা হাত। ভাড়াটেরা কি নীচে এসে পড়েছে?'

'বা, এতক্ষণ তবে নীচে আটকে ছিলাম কেন!' সুধা রত্নময়ীর চোখে

চোখ রেখে বলল, 'বলাইবাবুর চিঠি নিয়ে হেতমপুর থেকে আসছে। হাওড়া স্টেশন থেকে সটান এখানে এসে উঠল।'

রত্নময়ী মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তবু। কথাটা যেন পুরো বোঝেন নি। অপেক্ষা করছেন চিঠিটা শোনার আশায়। শুনলে হয়ত সবটা বুঝতে পারবেন।

চিঠিটা সুধা পড়তে শুরু করল : মা সুধা, মাসখানেক পূর্বে তোমাদের একটি পত্র পাইয়াছিলাম। এক মাসের ভাড়াও মনিঅর্ডারে পাইয়াছি। নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট ও দুশ্চিন্তায় থাকার জন্য দিব দিব করিয়াও জবাব দিতে পারি নাই। কিছু মনে করিও না। এই পত্রের বাহক গিরিজাপতিবাবু আমার পরিচিত। তিনি কলিকাতায় যাইতেছেন। তোমাদের বাসার নীচের তলা আমি তাঁহাকে ভাড়া দিয়াছি। আনন্দবাবুরা গত জানুয়ারী মাসে চলিয়া যাওয়ার পর হইতে আজ সাত আট মাস নীচের তলাটি খালিই পড়িয়া আছে। উহার ফলে আমার ক্ষতিই হইতেছিল। উপস্থিত গিরিজা-পতিবাবু ভাড়াটে হওয়ায় আমার কিছুটা উপকার হইল। তিনি প্রবীণ ও অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। বড়ই ভালমানুষ। তোমাদের সহিত বনিবনা ভালই হইবে। আমার নতুন ভাড়াটেদের সুখ সুবিধার প্রতি প্রথম প্রথম একটু লক্ষ্য রাখিও। এই দুঃসময়ে তোমরা একা ছিলে, বাড়িতে লোক হইয়া ভালই হইল। তোমাদের নিকট যে তিনমাসের ভাড়া বাকী পড়িয়াই আসিতেছে তাহার একটা ব্যবস্থা এবার করিবার চেষ্টা কর। বিদেশে স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া বড়ই টানাটানিতে কাটিতেছে। সবই এখানে দুর্মূল্য। বড় বেশী মানুষের ভিড়। সকলেই বোমার ভয়ে আসিয়া জুটিয়াছে। এদিকে ত শুনিতেছি কলিকাতার অবস্থা এখন নাকি আর ততটা খারাপ নয়। কেহ কেহ আবার বলিতেছে, খুবই ভয়ংকর। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ভাগ্যে যে কি আছে জানিনা। ঈশ্বর যাহা করেন। তোমার মাকে আমার নমস্কার জানাইও। তোমরা ভাইবোনেরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি। আশীর্বাদক বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

চিঠি পড়া শেষ করে সুধা বললে, 'মাস তিনেকের ভাড়া যে জমে গেছে

সেটা আর ভুলতে পারছে না বাড়িঅলা। যখনই চিঠি লেখে কথাটা একবার মনে করিয়ে দেয়।' বিরক্ত আর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঠোঁট বেঁকায় সুধা। 'এখানে সবই দুর্মূল্য! যেন কলকাতায় সব জলের দরে বিক্রী হচ্ছে।'

রত্নময়ী কোন জবাব দিলেন না কথার। পাশ থেকে তাওয়া টেনে উনুনে বসিয়ে দিলেন। পলায় করে সামান্য একটু তেল ছিটোলেন গোল করে। 'আলু ক'টা দে ত, বেসনে ভেজে দি।'

সুধার ঠিক খেয়াল ছিল না, মার কথায় খেয়াল হল। বললে, 'তুমি বুঝি বড়া ভাজতে বসলে? তিনটে ত আলু, তাও এখন খেয়ে রাখলে তারপর রাত্তিরে?'

'হবে'খন। তাড়াতাড়ি কেটে দে।' রত্নময়ী অপেক্ষা করতে লাগলেন হাত পেতে।

গোল গোল সরু সরু আলু কেটে জলে ধুয়ে নিলে সুধা। রত্নময়ী বেসনে ডুবিয়ে গরম তাওয়ার পাশে গোল করে বসিয়ে দিতে লাগলেন। অল্প তেলে, একরকম তেল ছাড়াই, ভিজে নেতার জলে এ-ভাবে আলু কি বেগুন কি বড়া ভাজতে রত্নময়ীর দক্ষতা অসাধারণ। কষ্টের সংসারে এ-সব কতরকম যে তিনি শিখেছেন, জেনেছেন।

রাত্রের জন্যে তুলে রাখা তিনটে আলুর এ-রকম অপচয় সুধার ভাল লাগে নি। অপ্রসন্ন হয়েছিল ও। যেন সেটা লক্ষ্য করেই রত্নময়ী বললেন, 'শুধু ওই চাল ডাল সেদ্ধ দিয়ে কি খেতে পারিস!'

'এখন না হয় বড়া ভেজে খাওয়ালে, তারপর রাত্রে? তখন তুমি কোন ছানা পোলাও খাওয়াবে আমাদের?'

রত্নময়ী মেয়ের বিরক্ত মুখের দিকে চেয়ে কি ভেবে একটু হাসলেন। 'তখনই দেখিস।'

মার হাসি, মুখের ভাবভঙ্গি দেখে সুধার কেমন সন্দেহ হল। 'তোমার কাছে পয়সাকড়ি কিছু আছে নাকি?'

সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন রত্নময়ী। তাওয়াটা খুব গরম হয়ে ধোঁয়া উঠছিল। বড়াগুলো কালচে হয়ে এসেছে। উনুনের থেকে তাওয়া নামিয়ে

বড়াগুলো উলটে পালটে দিতে দিতে বললেন, 'ছেলের আজ কি মর্জি হয়েছে কে জানে, একটা টাকা দিয়েছে সকালে। বিকেলে কিছু আনাজ আনিয়ে রাখবোখন ওকে দিয়ে!'

'তুমি বুঝি চেয়েছিলে?' সুধা রত্নময়ীর দিকে ভাল করে তাকাল।

'না।'

'নিজের থেকেই দিল—?' সুধার গলার স্বরে অবিশ্বাস আর ব্যঙ্গ। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আবার বলল সুধা, 'টাকা পেল কোথায়?'

ভাজা বড়াগুলো বাটিতে রাখতে রাখতে রত্নময়ী বললেন, 'আজকাল এটা-ওটা কি করছে যেন।'

সুধা খুব অবাক হয়ে রত্নময়ীর মুখের দিকে চাইল। সামান্যক্ষণ চেয়ে থেকে কিছু যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় আরতি এল।

'ওরা একটা ঝাঁটা চাইছে দিদি, জলের বালতিও।'

'জলের বালতি কোথায় পাব? কলঘরের ছেঁদা বালতিটা নিতে বল।'

'আমাদের উঠোন-ঝাড়া ঝাঁটাটা দিই ওদের?' আরতি বাঁ-গালের পাকা ব্রণটা টিপতে টিপতে বলল।

সুধা কোন জবাব দিল না। অন্যমনস্কভাবে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

'ওদের ঘরদোর পরিষ্কার হলে মেয়েটাকে একবার ওপরে আসতে বলিস ত আরতি।' রত্নময়ী বললেন।

'হাত ধরে তাকে তুলে আনতে হবে?' আরতি সুধার দিকে চেয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসল।

রত্নময়ী আরতিকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু কথাটা তাঁর কানে গেল। একটু অবাক হয়ে শুধোলেন, 'কেন? অন্ধ-টন্ধ নাকি?' প্রশ্নটা সুধাকে। যেন সুধা এ-খবর এতক্ষণ তাঁকে দেয়নি।

কেমন যেন লাগল সুধার। বলল, 'না, অন্ধ নয়। খুব বেঁটে দেখতে।'

'কী হতকুচ্ছিৎ, বাবা!' আরতি দিদির পাশ থেকে মুখ বাড়াল। 'মুখখানাও যেমন ধেবড়া, তেমনি বিচ্ছিরি।'

রত্নময়ী একটু সময় ভীষণ বোকার মতন মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আচমকা বললেন আরতিকে, 'তুমিও এমন কিছু অপ্সরী নও মা।'

কথার সুরে ভর্ৎসনা আর অসন্তোষ মেশান ছিল, আরতি বুঝতে পারল। ধমক খেয়ে রান্নাঘরের চৌকাট ছেড়ে সরে গেল ঝাঁটা খুঁজতে।

তাওয়া থেকে শেষ বড়া ক-টা নামিয়ে রত্নময়ী হাত ধুয়ে উঠে পড়লেন।

সুধার পিছু পিছু ঘরে আসতে আসতে রত্নময়ী বললেন, 'চান করতে যাচ্ছিস?'

'চান করব না, মুখ হাত ধুয়ে এসে খেয়ে নি, ন'টা বোধ হয় বেজেই গেছে।' খোলা বিনুনিটা ঘাড়ের ওপর তুলে খোঁপার মতন পাক দিয়ে কোন গতিকে জড়িয়ে রাখতে রাখতে সুধা বলল। গামছা আগেই নিয়েছে। সাবানের ভাঙা কৌটোটা জানলার ওপর থেকে তুলে নিল এবার।

'নীচে থেকে আসবার সময় একবার খোঁজ নিয়ে আসবি—চা-টা যদি খায় করে দিতে পারি। দুপুরে খাওয়ারই বা কি করবে ওরা কে জানে।'

'যাই করুক তুমি ত আর ভাত মাছ রান্না করে খাওয়াতে পারছ না।' সুধা কেমন যেন নিঃস্পৃহ গলায় বলল, 'বরং আরতিকে ডেকে দিচ্ছি একটু চা করে দিয়ে আসুক। তুমি কিন্তু আর ঘরবার করো না।' বলতে বলতে সুধা দালান পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

ঘরের ভেতরটা বাইরের মতনই মেঘলা হয়ে রয়েছে। জানলা সবটা খুলে রাখতে পারেননি রত্নময়ী। ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। ঘরের আবছা ভাবটা কাটাবার জন্যে রত্নময়ী জানলা এবার পুরোটা খুলে দিলেন। ভিজে ভিজে হাওয়া এল এক দমক। ময়দার গুঁড়োর মতন ঝিরঝিরে বৃষ্টিও পড়ছে আবার। হয়ত এখনি থেমে যাবে। বাইরের বাদলার দিকে খানিক-ক্ষণ অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে থাকলেন রত্নময়ী। নীচের ভাড়াটেদের দু'-একটি অস্পষ্ট কথা ভেসে আসছিল। হঠাৎ মনে পড়ল রত্নময়ীর, ঠিক এমনি এক শ্রাবণের সকালে তাঁরাও এসেছিলেন, এই শহরে, কলকাতায়। ওরাও এল।

দুই

নতুন ভাড়াটে 'গিরিজাপতিদের সম্পর্কে সুধার খুব একটা কৌতূহল বা উৎসাহ ছিল না। আবার বিরাগ বিতৃষ্ণাও নয়। ভাড়াটে বাড়ি, যার খুশি ভাড়া নেবে, থাকবে—তাতে সুধাদের পছন্দ অপছন্দ, ইচ্ছে অনিচ্ছেয় যায় আসে না। তবে হ্যাঁ, ভাড়াটেরা লোক ভাল হলেই ভাল; তুচ্ছ কারণে মন কষাকষি, কথা কাটাকাটি হতে পারে। সুধা কি রত্নময়ী কেউই এটা পছন্দ করে না। পারুল বৌদিদের আগে এক ভাড়াটে এসেছিল, মাস তিনেক ছিল বোধ হয়, এক পুঁটলি বাচ্চাকাচ্চা, যেমন জেদি কর্তা তেমনি তিরিক্ষি মেজাজী বউ। গলায় যেন তাদের কাঁসা বাজত। বউটি প্রায় প্রত্যহ খুঁটিনাটি নিয়ে চিল-চেঁচান চেঁচাত, মাথায় করে রাখত বাড়িটা। সুধা সেই বউটির সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে সাহস করত না।

নতুন ভাড়াটেরা সে-রকম নয় বলে মনে হচ্ছে। বাড়িঅলা অবশ্য আগে-ভাগে চিঠিতে গেয়ে রেখেছে, এরা অতি ভাল মানুষ, সুধাদের সঙ্গে বনিবনা হবে। বনিবনার দরকার নেই, বাড়িতে দিনরাত্রি কুরুক্ষেত্র বেঁধে না থাকলেই সুধারা বাঁচে।

তবু একটা ব্যাপারে সুধার একটু যেন অপছন্দ ছিল মনে মনে। সেটা আর কিছু নয়, সাত আট মাস একা একা গোটা বাড়িটা নিজেদের ভোগ-দখলে রেখে অনেক রকম সুবিধে তারা ভোগ করেছে, এখন আর সে-সব চলবে না। যা ভেবে সবচেয়ে অস্বস্তি হচ্ছিল সুধার তা কলঘর ভাগাভাগি নয়, নিজেদের মন ভাগাভাগি। রত্নময়ী, সুধা, বাসু, আরতি—আজকাল এই চারটি মানুষের চার রকম মন হয়ে গেছে, হয়ে যাচ্ছে আরও। কেমন সব পৃথক পৃথক। নিজেদের মধ্যে তাই কথা কাটাকাটি, রাগারাগি, ঝগড়াঝাঁটি প্রায়ই হয়। সংসারের এই সমস্ত বিসদৃশ

ব্যাপারগুলো এতদিন যত সহজে মন খোলাখুলি ভাবে হয়েছে তাতে কাউকেই চুপচুপ ঢাকঢাক করতে হয়নি। কে শুনছে না-শুনছে তার জন্যে যেমন সতর্ক হতে হয়নি, তেমনি নিজেদের সংসারের নানারকম কথা কে শুনল, কে জানল, তার জন্যে লজ্জা সংকোচে মুখ হেঁট করার দরকার হয়নি। এবার থেকে হবে।

ভাবলে সুধারই যেন কেমন লাগে। কই আগে তো ওরা এমন ছিল না। বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন—এই বাড়ি—তাদের দোতলাটা যেন দুপুর বেলার সংসারের মতন একটু আধটু শব্দ আর শান্ত পরিবেশ দিয়ে ভরা ছিল। ওরা ভাইবোনেরা অন্য রকম ছিল। সুধা বরাবরই শান্ত, আপন-ভোলা গোছের—সারাটা দিন তার কাটত মার টুকটাক কাজ করে দিয়ে, বাবার জিনিসপত্র গুছিয়ে, অবসরে লেখাপড়া নিয়ে। মা সংসার নিয়ে সারাক্ষণ কাটাত। রান্নাঘর আর স্বামী আর ছেলেমেয়ে। কত শান্ত ধীর স্থির ছিল মা তখন। খুব জোরে, হাঁক ডাক করে কাজ করতে কি কথা বলতে মা পারত না। গোলমাল হৈচৈ বাবাও পছন্দ করতেন না। বাবা স্কুলে চলে না যাওয়া অবধি মা-র উঁচু গলার ধমক টমক পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের শুনতে হত না একরকম। বাড়িতে বান্টুর গলায় তখন শব্দ ছিল না। যত বদমাশি দুরন্তপনা সব বাড়ির বাইরে সেরে আসত। এক যা আরতিটাকেই সামলানো যেত না। তার খেলা, ছুটোপাটি, আব্দার বায়না—এ-সব সামলানো অসাধ্য ছিল। মা-ও পারত না। বাবার বড় বেশি আদরের জন্যে এমন হত। তবু, এ-কথা ঠিক, কেঁদেকেটে চিৎকার করে জিনিসপত্র ভেঙে বাড়ি মাথায় করে রাখার মতন দুষ্টু বা বেয়াড়া আরতি ছিল না। খুব বেয়াড়াপনা করলে মা ওর নড়া ধরে টানতে টানতে বাবার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বলত, নাও, ধরো তোমার আব্দারীকে, খামচে খুমচে আমার গা-হাতে জ্বালা ধরিয়ে দিল। এমন বেয়াড়া মেয়ে আর আমি দেখি নি বাপু।...বাবা মুখ তুলে দেখতেন একটু। মুচকি হাসতেন। কিছু বলতেন না তখন। রত্নময়ী চলে গেলে কাছে টেনে নিয়ে শুধোতেন, ওই সেই লাল লাল বলের মতন মিষ্টি মিষ্টি খেতে, ওগুলোকে কি বলে রে?...বুড়ির চুল,

আরতি জবাব দিত। বাবা মাথা নাড়তেন, ঠিক, বুড়ির চুল; চারটে পয়সা দেব তোকে, কিনবি। এখন চুপ করে বসে থাক এখানে। আমার পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দে।

বাবা মারা গেলেন—সে-সব শান্ত সুন্দর দিনও শেষও হল। তারপরই যে এ-বাড়িতে মায়েতে মেয়েতে, ভাইবোনে ঝগড়াঝাটি লাঠালাঠি বেঁধে গেছে তা নয়। অনেকদিন পর্যন্ত আগের জের বয়ে আসছিল। তাই মনে হত। কিন্তু আসলে তা নয়, একটু একটু করে বদলাচ্ছিল। যেন আগের স্রোতের সেই জল ঘাট থেকে ঘাটে যেতে যেতে রঙ বদলে ঘোলা হয়ে আসছিল। সংসারের অভাব অনটন, দাও দাও, নেই নেই-এর সঙ্গে নিত্য যে রেষারেষি, তার সঙ্গে মিশছিল তাদের ভাইবোনদের গায়ে-মনের বাড়টা। বাসু তার শিশুবেলায় কি কিশোর বয়সে যে সমীহ, বাধ্যভাব নিয়ে ছিল, আজ যোয়ান ছেলে হয়ে মা কিংবা দিদির প্রতি সেই নম্রতা, নম্যতা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে না। সুধারও তাই। রত্নময়ীর কর্তৃত্বের কাছে, তাঁর ব্যক্তিত্বের, মাতৃত্বের কাছে তখন ওর যে স্বাভাবিক বশ্যতা ছিল, এখনও কি তাই আছে? না। সুধা নিজের মন ত বুঝতে পারে। সে বোঝে, আজ আর মা তার কাছে সেই পুরনো মা নয়। তখন যার কাছে নিজের সমস্ত অস্তিত্ব হারিয়েও সে-সম্পর্কে চেতনা ছিল না, ক্ষোভ ছিল না—এখন তার কাছ থেকে বোধে, বিচারে, পছন্দ-অপছন্দে, চিন্তায় পৃথক হতে পেরেছে। এই স্বাতন্ত্র্য কে দিয়েছে সুধাকে? বয়স। দেহের বৃদ্ধি। এবং মনেরও। আরও একটা কারণ আছে, সুধা ভেবে দেখেছে এবং মনে মনে তার মতন করে বুঝে নিয়েছে, সেটা অন্য কিছু নয়—এই অবস্থা, এখনকার সংসারের অবস্থা। রত্নময়ীর যদি দারিদ্র্য না থাকত, যদি আজ কন্যার মুখাপেক্ষী না হতেন তিনি, তবে—, তবে কি এত সহজে, এত তাড়াতাড়ি নিজেকে পৃথক করতে পারত সুধা? পারত না। হয়ত বোধে, বিচারে, চিন্তায় সে স্বতন্ত্র হতে পারত কিন্তু মার কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে পারত না, এখন যা পারছে। শুধু পারছেই বা কেন, সুধার বিচার বুদ্ধি ইচ্ছা অনিচ্ছার কাছে রত্নময়ী নিজেকে সমর্পণ করে দিন—এটাই চাইছে ও।

কথাগুলো ভাবলে খারাপই লাগে সুধার। মনে হয়, মা আর মেয়ে যেন কত দূরে সরে যাচ্ছে দিন ·দিন। কে জানে, এ-ভাবে সরে যেতে থাকলে একদিন এই বাড়ির মধ্যে ওদের সম্পর্কটা নতুন এক ধরনের ভাড়াটের মতন হয়ে দাঁড়াবে কি না।

দুঃখ হয়, গ্লানি হয়, বড় অপরাধী মনে হয় নিজেকে সুধার—যখন জটিল এত সব কথা মনে আসে। চিন্তাটাকেই ঘোলাটে করে ফেলে। তারপর হঠাৎ কেমন একটা আত্মরক্ষার আক্রোশে রত্নময়ীর পরিবর্তনটাও বিচার করতে বসে যায়।

তুমিও ত বদলে গেছ, কত বদলে যাচ্ছ। সুধা মনে মনে রত্নময়ীকে ভীষণভাবে অভিযোগ জানায়, তুমি আর আগের মতন আমাদের মধ্যে নেই। এখন আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কেমন স্বার্থপরের মতন। আমি যদি আরও টাকা আনতে পারতাম, তুমি আরও খুশী হতে ; আমি পারি না, তাই তুমি মুখ ভার করে থাক।

আক্রোশের মাথায় আচমকা অভিযোগটা জানিয়েই সুধার যেন মনে হয়, খুব খারাপ খুব অন্যায় একটা কিছু সে করে ফেলেছে। আরও অপ্রসন্ন, আরও বিরক্ত হয়ে ওঠে সুধা। নিজের ওপর, মার ওপর।

তারপর বুকটা কেমন ব্যথা ব্যথা করে ওঠে। গভীর যন্ত্রণাদায়ক এক অভিমানে গলা টন টন করতে থাকে।

নিজেকে একটু সংযত করে সুধা পরে অবশ্য ভাবে, মা আগের সেই শান্ত সুন্দর শিষ্ট নির্বিরোধ মানুষ আর নেই। এখন অশান্তিতে তাঁর মন মলিন হয়ে গেছে, স্বভাবের সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে ; শিষ্টতা যে-টুকু আছে তাও যেন মরা প্রদীপের মতন। কথায় কথায় মুখ ভার হয়, সহজ কথায় বাঁকা জবাব, সামান্যতে অসহিষ্ণু।

মা আর মেয়েতে যখন ধীরে ধীরে সম্পর্কটা এ-রকম হয়ে আসছে তখন ভাই আর বোনেতে কেমন হতে পারে? আরও খারাপ। বাসু কারও কোনো তোয়াক্কা আর করে না। সুধার সঙ্গে ত রীতিমত রেষারেষির সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে। বড় বোনের সঙ্গে তার যেন জন্মান্তরের শত্রুতা। সুধা

যদি বলে পুব মুখে তাকা, ও পশ্চিমে তাকাবে। কী অদ্ভুত অসহ তার ঔদাসীন্য। বলুক যা খুশি সুধা, করুক যা খুশি, বাসুর তাতে কিছুই যায় আসে না। নিজেকে নিয়ে, নিজের বন্ধু বান্ধব, উপদ্রব, দায়িত্বহীনতা এবং ক্ষুদ্রতা বর্বরতা নিয়ে চমৎকার আছে বাসু। সুধা যদি বলে, ছোটো-লোক কোথাকার। বাসু পালটা জবাবে বলবে, তুমি কোন ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়ের মতন থাকো তা আমার জানা আছে।

আর থাকে আরতি। সবার পর, সবার শেষে, সবচেয়ে যে ওদের মধ্যে ছোট। কিন্তু আরতি আর ছোট নেই। তারও বয়স তাকে বড় করে তুলছে। আর এই সংসার, এই পরিবেশ তাকে গড়ছে। বদলে যাচ্ছে আরতি। সুধা বুঝতে পারছে, স্পষ্টই দেখত পাচ্ছে। যে-আরতি এতদিন চুপ করে ছিল, এখন সেও মুখ খুলতে শিখেছে। নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। মুখ ফুটে তার নিজের কথা বলতে পারছে।

আজকাল ওদের সংসারের এই ত চেহারা। চারটে মানুষ চার রকমের। একই ঘরের চার বাসিন্দে যেন। কিন্তু এক জায়গায় এই চারটি মানুষের অস্তিত্ব স্বতন্ত্র থাকতে পারে নি, এক হয়ে গেছে। সেটা কি? অশান্তি। হ্যাঁ, তারা কেউই শান্তিতে নেই, তাদের সুখ বলে কিছু থাকছে না। ওরা শুধু অভাব অনটন, অশান্তি আর কষ্ট নিয়ে বেঁচে আছে।

এ-সংসারে তাই নিত্য ছোটখাট বিষয় নিয়েও খিটিমিটি, রাগারাগি, গালমন্দ, মান অভিমানের পালা লেগে আছে। হাতের টাকা যখন ফুরিয়ে যায়, অথচ বাড়িতে চাল থাকে না, কয়লা থাকে না—তখন সবাই অসহিষ্ণু অবিবেচক। একটা অত্যন্ত ইতর রকমের জ্বালা সারা বাড়িটা আর মানুষগুলোকে বেহুঁশ করে দেয়। কে কি বলে, কাকে কি বলে তার খেয়াল করে না। আর এ-সংসারে চাল কি কয়লা ত সব সময়ই বাড়ন্ত। কাজেই জ্বালাটাও প্রায় সব সময় ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছে।

নতুন ভাড়াটে এসেছে, এবার ওপর তলার সংসারের এই দৈন্য, ইতরতা, অশোভনতা, কুশ্রীতা তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে। কী লজ্জা, কী লজ্জা। আমরা বাড়ির ভাড়া দিতে পারি না, চাল আটা ফুরিয়ে গেলে

কিনে আনতে পারি না, আমাদের সংসারে মাছের আঁশটুকু পর্যন্ত কদাচিৎ আসে, ছেঁড়া কাপড় পরি আমরা, স্নানের সময় মাথায় তেল জোটে না কতদিন, গায়েমাখা সাবানের টুকরোটা ফুরিয়ে গেলে কাপড়কাচা হলুদ সস্তা সাবান দিয়ে কাজ চালাই। আর, আর আমরা—মা মেয়ে, ছেলে, ঝগড়া করি ছোটলোকের মতন। এই আমরা একটি ভদ্র পরিবার। ঈশ্বর চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্যের স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা।

নতুন ভাড়াটেরা আসার পর, কোনো এক অবসরে তাদের কথা ভাবতে বসে সুধা কেমন এক আবেগে এই সব কথা না ভেবে পারল না। স্রোতের মতন যেন ভাবনাটা এল আর তাকে গ্রাস করল। তারপর সুধার মনে বিশ্রী এক গ্লানি এবং ক্ষোভ যখন জমতে জমতে উপচে পড়ার মতন হল, তখন কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে বলল রত্নময়ীকে।

'যাই বলো, আমরা বেশ ছিলাম। এখন এক ফ্যাসাদই হল।'

'কিসের ফ্যাসাদ!' রত্নময়ী সুধার ইঙ্গিতটা বুঝতে না পেরে বললেন।

'কিসের আর, ওই যে আর-এক ভাড়াটে এসে জুটল।' সুধা বিরস মুখ করে বলল।

রত্নময়ীর জ্বর কাল সারাদিনই ছিল। রাত্রেও। আজ সকাল থেকে গায়ের তাপটা গেছে। সর্দির সেই কাবু করা ভাবটা কমেছে, কিন্তু চোখ দুটো এখনও ছলছলে হয়ে আছে, মুখ খুবই শুকনো, গলার স্বরটাও ভার ভার। রত্নময়ীর ভয় হয়েছিল হাঁপানির টানটা বুঝি বেড়ে যাবে এই সর্দিজ্বরে। না, তা হয়নি। বুকের ওপর দিকে ব্যথা ব্যথা ভাবটা আছে, তবে অসহ নয়।

কাল সারাটা দিন দাঁতে কুটো কাটেন নি। শরীর খারাপ হলে উপবাসটা তাঁর স্বভাব। বার দুই তিন একটু চা খেয়েছিলেন। আজও দিনের বেলায় চা আর এক মুঠো মুড়ি ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি। জিব বিস্বাদ হয়ে রয়েছে, কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না। সুধা অফিস থেকে ফিরে এলে তাকে চা করে দিচ্ছিলেন। চাল থেকে বেছে রাখা খুদকুঁড়ো ভেজেছেন। সামান্য তেল দিয়ে নেড়ে, নুন ছিটিয়ে সুধাকে এগিয়ে দিয়েছেন। কাঁচা একটা লঙ্কা নিয়ে সুধা সেই চাল ভাজা চিবোচ্ছিল।

'ওরা লোক ভাল।' রত্নময়ী মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তারপর নিজের চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন আস্তে আস্তে। 'মেয়েটাকে দেখলে কষ্ট হয়।'

সুধা কথা বলল না। কলাই করা চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে এনে ফুঁ দিতে লাগল। এ-বাড়ির চা এই রকম। সস্তার গুঁড়ো চা; দুধ না থাকায়ই সামিল, চিনির বিকল্পে গুড়। কিন্তু প্রায়-ফুটন্ত। স্বাদ তাই বোঝা যায় না, গরমটা বোঝা যায়।

'তা হঠাৎ এ-সময় কলকাতা এল কেন?' সুধা শুধোল। তার কথা সে ভোলেনি। বলবে, একটু পরে, একটু গুছিয়ে।

'জানি না। উমা ত কিছু ভাল করে বলল না। তার দাদার পড়া-শোনার কথাই যা বলল। হয়ত তাই।' একটু থামলেন রত্নময়ী, ভাবলেন। 'উমার কাকাও হয়ত কিছু করবেন টরবেন।'

গিরিজাপতির সঙ্গে ছেলে এবং মেয়েটির সম্পর্কের কথা কাল বিকেলে শোনা হয়ে গিয়েছিল সুধার। এরা দু'জনেই ওঁর ভাইপো ভাইঝি। ভদ্রলোক বিপত্নীক, নিঃসন্তান।

'মেয়েটার সঙ্গে তুই একটু ভাবসাব করলি না?' রত্নময়ী মেয়েকে বললেন, মনে হল একটু যেন অনুযোগ আছে, 'ও বলছিল?'

সুধা মার দিকে তাকাল। দৃষ্টিতেই তার মনের ভাবটা স্পষ্ট। 'বলছিল, কি বলছিল?'

'তুমি নাকি খুব গম্ভীর, চুপচাপ।' রত্নময়ী যেন মেয়ের এই বিশেষণ-ভূষণে মজা পেয়ে একটু হাসলেন। 'আরতিকে বলেছে, তোমার দিদি স্কুলে পড়ায় নাকি ভাই, কী রকম মাস্টারনী মাস্টারনী, না?' আরও একটু খুশী খুশী হাসিতে রত্নময়ীর মুখ ভরে উঠল, 'যা না একটু আলাপ করে আয়, কাল সকালে এসেছে—কাল সারাদিন গেল, আজও কাটল। কি ভাববে!'

'হবে'খন; সারাদিন খেটেখুটে এসে এখন আলাপ-টালাপ ভাল লাগে না!' সুধা অনাগ্রহের সুরে বলল।

রত্নময়ী মেয়ের অপ্রসন্ন, অন্যমনস্ক, নিরাসক্ত মুখের দিকে কয়েক পলক

তাকিয়ে থাকলেন। আর কিছু বললেন না। মনে মনে বোধ হয় সামান্য ক্ষুব্ধ হলেন।

উনুনে ছোট বাটলইয়ে জল ফুটছিল। কাঠের তক্তা থেকে কৌটো পেড়ে রত্নময়ী খানিকটা ডাল ঢেলে নিলেন।

'বুঝলে মা—' সুধা চায়ের মগটা চিবুকের কাছে আনল; চুমুক দেবার ভান করে ঠোঁট নাক এবং চোখের সামান্য একটু আড়াল করল। কী রকম এক অস্বস্তি আর দ্বিধা কাটাল যেন সুধা। রত্নময়ী বাটিতে ডাল ধুয়ে নিতে নিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। সুধা বলল, 'সাত আটমাস একলা এ-বাড়িতে থেকে থেকে আমাদের অভ্যেসই হয়ে গেছে—বড্ড জোরে জোরে কথাবার্তা বলি, সংসারের খুঁটিনাটি সব। এবার থেকে একটু ভেবেচিন্তে চলতে হবে। এইটুকু বাড়ি, নীচে লোক—। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বাইরের লোকের কানে যাওয়া ভাল নয়।' মগের চা-টুকু শেষ হয়েছিল, তবু একটু সময় তলানিটুকুই জিতে ঠেকিয়ে মুখটা আড়াল করে রেখেছিল সুধা। এবার নামাল। মগটা রেখে মার দিকে অল্প ঘাড় তুলে তাকাল।

সুধা অপেক্ষা করছিল। রত্নময়ীর মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে একবার সে লক্ষ্যও করেছে। এখনও আশা করছিল জবাবের। অথচ রত্নময়ী নিরুত্তর। এ-ব্যাপারে যেন তাঁর মনোযোগই নেই।

খুশী হল না সুধা। রত্নময়ী যদি এমন একটা ভাবভঙ্গি করতেন মুখ-চোখের, যাতে অন্তত মনে হত কথাটায় তিনি সায় দিলেন, বিচার করলেন তা হলেও সুধার প্রত্যাশা বোধ হয় মিটত।

জবাব না পেয়ে ঈষৎ বিরক্ত গলায় সুধা আবার বললে, একটা খোঁচা দিয়েই, 'তোমার গুণধর ছেলেকে বারণ করে দিও। তার আবার যেমন গলা তেমনি কথা বলার ছিরি, ছোটবড় জ্ঞান থাকে না ত।'

'তুমিই বলো।' রত্নময়ী এবার জবাব দিলেন মেয়ের দিকে না তাকিয়ে। 'সংসার তো আর শিল নোড়া নয় যে, দিনে একবার পাড়লাম আবার তুলে রাখলাম। পাঁচজন মানুষ থাকলেই দুটো কথা হয়, কখনো হাসির কখনো রাগ ঝগড়ার। সে সব কথা কে কান বাড়িয়ে শুনল না শুনল অত কেউ

খেয়াল করে না।' জলের হাঁড়িতে খানিকটা হলুদ আর নুন ফেলে দিলেন রত্নময়ী। হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে আবার বললেন, 'একে ওকে বলার দরকার কি ; যে যার নিজের মতন মুখ বুজে থাকলেই হল।' রত্নময়ীর পুজোর সময় বয়ে যাচ্ছিল। সন্ধ্যে হয়েছে। আরতি সন্ধ্যেটা অবশ্য দিয়ে গেছে। পিঁড়ি সরিয়ে রত্নময়ী উঠে পড়লেন।

'আমি রাগের কথা কিছু বলিনি মা।' সুধা চৌকাটের সামনে যেমন ভাবে বসেছিল তেমনি ভাবেই বসে থাকল, রত্নময়ীকে পাশ ছাড়ল না। যেন রত্নময়ীর এই অহেতুক রাগের বিপক্ষে সুধা তার কৈফিয়তটা বুঝিয়ে দিতে তাঁকে আটকে রাখতে চাইছে।

'তুমি কি বলেছ মা তুমিই জান, আমার রাগ দুঃখ করার দরকার নেই।'

সুধা তবু পাশ দিল না। উঁচু মুখ করে মার দিকে চাইল। রত্নময়ীর মুখে ক্রোধ নেই কিন্তু কেমন এক গুরুতা আছে। এবং বিষণ্ণতা।

'তুমি আজকাল একটুতেই—' সুধা রত্নময়ীর মুখ থেকে চোখ নামিয়ে কি বলবে তা ভাবতে গিয়ে মুখে কথা পেল না। আগের মতন অতটা বিরক্তি বিরূপতাও যেন নেই। মনের মধ্যে সহজ ভাবনাটাও ঘোলাটে হয়ে গেল রত্নময়ীর কথাটাই ও ভাবছে ; যে যার নিজের মতন মুখ বুজে থাকলেই হল। সুধা নিজে কি মুখ বুজে থাকে ? ভাবল সুধা। ভাবনা এবং কথা আরও ঘোলাটে হল। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ অনুনয় এবং অভিমানের সুরেই প্রায় বলল, 'আজকাল একটুতেই কেমন হয়ে পড় তুমি।' একটু থামল সুধা, 'কথাটা কি বলছি তা ভাল করে শুনবে না, বুঝবে না।' পিঠের পাশ দিয়ে পাক-খাওয়া যে-টুকু আঁচল সামনে পড়েছিল সে-টুকু কাপড় তালুর ওপর নিয়ে সুধা লুফতে লাগল। হঠাৎ যেন সব, সমস্ত ব্যাপারটাই খুব হালকা তরল করে ফেলতে চাইছে। 'আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে যা খুশি করি, বলি তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু অন্য লোক সে-সব দেখলে শুনলে আমাদেরই লজ্জা, মা।' সুধা যেন রত্নময়ীকে ব্যাপারটা খুব সরল সহজ করে বুঝিয়ে এবার চোখ তুলল।

রত্নময়ী শুনলেন কথাগুলো, কিছু বললেন না। পাশ দিয়ে যাবার জন্যে

পা বাড়ানোর ভঙ্গি করলেন। সুধা এক পাশে হেলে জায়গা দিল। রত্নময়ী চলে গেলেন।

সুধা খানিকক্ষণ চৌকাটের সামনেই বসে থাকল। মুখ হেঁট করে। তারপর সরে পিঁড়ির ওপর বসল। ডালের হাঁড়ির ওপর ফেনা উপচে উঠেছে। খানিকটা গড়িয়ে উনুনে পড়ল। ভ্যাপসা পোড়া পোড়া এক গন্ধ। সুধা জোড়া হাঁটুর ওপর চিবুক ঠেকিয়ে বসে থাকল।

কিছুই আর ভাল লাগছিল না সুধার। মনটা বড় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কথাগুলো বোধ হয় না বললেই হত। কি দরকার তার কথা বলার। মুখ বুজে থাকাই ভাল। ভাল কথাতেও যখন অশান্তি, তখন এ-সংসারে যার যা খুশি করুক। এ-পরিবারের মান মর্যাদা, নিজেদের ভব্যতা ভদ্রতা রাখার দায় তার একার নয়—অন্য তিনজনেরও। তারা যদি না রাখে, না বোঝে, না বুঝুক। সুধা কেন ছটফটিয়ে মরে।

অন্যমনস্ক চোখে উনুনের ওপর চাপানো ডালের হাঁড়িটা দেখতে দেখতে কখন তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে খেয়াল থাকে নি। মনের আবেগটাও যেন ডালের ফেনার মতন খানিকটা উপচে উঠে পড়ে গিয়েছে। তারপর আর উথলে না পড়ে ভেতরে ভেতরে ফুটছে।

গভীর এবং দুর্বোধ্য এক দুঃখ সুধার মনে ঘন হয়ে আসছিল। ওর মনে হচ্ছিল, সমবেদনা দেখাবার, সহানুভূতি জানাবার মতন তার কেউ নেই। ওকে কেউ বুঝতে চায় না। আপনার জন হয়েও এরা—এই মা, বাসু, আরতি বাস্তবিক তার আপন নয়। ওরা যে পর, তাও না। তবু এ-কথা ঠিক, সুধা আজকাল অনুভব করতে পারছে, যে নিবিড় সম্পর্ক থাকলে অন্য একজনকে নিজের, একান্ত নিজের বলে মনে হয়—তেমন সম্পর্ক এদের সঙ্গে তার আর নেই। একদিন ছিল, এখন আর নেই। ফুরিয়ে গেছে। যখন ছিল তখন এ-ভাবে অনুভব করার মতন তার চেতনা ছিল না, আজ চেতনা এসেছে কিন্তু সম্পর্কটা আর নেই।

নিঃসঙ্গতার অতল কূপের মধ্যে সুধা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছিল, ভারি ঘন বেদনা তার মনের অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমার কেউ নেই, কেউ না। অনেকটা যেন হতাশ এবং ব্যাকুল হয়ে নিজেকেই বলছিল সুধা।

একজন আছে। ঠিক এমন সময়, এই রকম আকুলতার মধ্যে তাকে বড় বেশি, খুব স্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে। সে যেন সুধার আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকে, সুধার কান্না, সুধার দুঃখ, তার ব্যাকুলতা দেখলেই নিঃশব্দে কাছে এসে দাঁড়ায়। হাত দিয়ে এ-মানুষকে ছোঁয়া যায় না, কিন্তু মনের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ এবং একান্ত করে আর কাউকে টেনে নেওয়াও যায় না।

এখন সেই মানুষটিই এল। সুচারু। এতক্ষণ সমবেদনা আর সহানুভূতির কামনায় কাতর, অস্থির হয়ে সুধা যেন তাকেই খুঁজছিল। আজকাল এ-রকম হয় সুধার। নিবিড় একান্ত এক সম্পর্কের অভাব অনুভব ক'রে যখন অসহায়তা আর গভীর নিঃসঙ্গতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে তখন সুচারুকে বড় বেশি করে সে ডাকে, ডেকে নেয়। যেন ওই মানুষটাই তার একমাত্র সম্বল। এতে মন খানিক হালকা হয়। যদিও এখন মনের মধ্যেই সুচারুর আসা যাওয়া, তবু কী আশ্চর্য এক অস্তিত্ব আছে সুচারুর এই কাল্পনিক উপস্থিতির মধ্যেও।

সুচারুর কথা ভাবতে বসলে অবশ্য যতটুকু সুখ, তার বহুগুণ বেদনা তাকে অনুভব করতে হয়। তবু এ-বেদনা অন্যরকম। একাকিত্বের অসহ বেদনা এ নয়, দূরত্ব রক্ষার বেদনা।

'দিদি—!'

সুধার ঘোর কাটল। বিহ্বলতা এসেছিল একটু। মুখ ফিরিয়ে আরতির দিকে অর্থহীন ভাবে চেয়ে থাকল ক'পলক। তারপর খেয়াল হতেই মুখ ফিরিয়ে নিল।

'আমাদের ঘড়িটা ঠিক আছে? উমাদি জিজ্ঞেস করল। কাকাবাবুদের ঘড়িটা মেলাতে হবে।' আরতি সুধার দিকে মুখ করে বলছিল। দিদির মুখ দেখে সে বুঝেছে একটা কি যেন হয়েছে। থমথম করেছে মুখটা। চোখে

জল টলটল করছে। দিদি কাঁদছিল। দিদির কোনো হুঁশ ছিল না, কিছু ভাবছিল, ডালের হাঁড়ির জল শুকিয়ে চড়চড় শব্দ হচ্ছে।

সামনের ঘটিটা তুলে আরতিই তাড়াতাড়ি খানিকটা জল ঢেলে দিল। খুন্তি দিয়ে নেড়ে ঘুঁটিয়ে দিতে দিতে আর একবার সুধার মুখের দিকে আড়চোখে তাকাল।

'ক'টা বেজেছে আমাদের ঘড়িতে?' সুধা ছোট বোনের সামনে চোখ মুছতে না পারায় ভীষণ অসহায় বোধ করছিল। অস্বস্তি লাগছিল। ডালের হাঁড়িতে জল ঢেলে দিয়ে আরতি যেন তাকে আরও বিশ্রী অবস্থার মধ্যে ফেলল। ঘাড় হেঁট করে মুখ ফিরিয়ে সবজির ঝুড়ি আর বঁটি টেনে ব্যাপারটা এড়াতে চাইল সুধা।

'পৌনে সাত।' আরতি জবাব দিল।

'ওই রকমই হবে। আমাদের ঘড়িটা ঠিক নেই।'

আরতি এখন অনেক কিছুই বুঝতে পারে। বুঝতে পারল, দিদির সামনে থেকে সরে যাওয়া তার উচিত। চলেই যাচ্ছিল ও, সুধার কথায় দাঁড়াল। নিজের অবস্থাটা বাঁচাচ্ছে, বাঁচাতে চাইছে কোনো রকমে সুধা। 'উমা কি করছে? ওর সময় হলে একবার ওপরে আসতে বলিস।'

আরতি সবটা কথা শুনে নিয়ে চলে গেল।

আরতি চলে গেলে চোখটা ভাল করে মুছে আলু কুটতে বসল সুধা। আর ভাবল: ঘড়িটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। একেবারে বন্ধ নয়, চলছে। দম দিলে চলে, আগের মতনই টিক টিক আওয়াজ তুলে। বিবর্ণ-রঙ দাগ-কাটা কাগজটার ওপর মরচে ধরে যাওয়া কাঁটা দুটো ঘুরে যাচ্ছে নিয়মিত। দেখলে বোঝার উপায় নেই। রত্নময়ীও ঠিক বুঝতে পারেন না, বিশ্বাস করতেও পুরোপুরি বাধে হয়ত। এই ত সেদিনের ব্যাপার। সেই ঘড়ি এত শীঘ্রি খারাপ হয়ে যাবে! না; খারাপ নয়, হয়ত একটু আগুপিছু হয়ে যাচ্ছে কাঁটা দুটো। এটা শুধরে নেওয়া যায়। যায় না কি!

সুধা জানে, এ আর শোধরাবার নয়। ঘড়িটা আওয়াজ তুলবে, তার কাঁটা দুটোও ঘুরে যাবে, কিন্তু আর ঠিক মতন কাজ দেবে না। আগে ওর

কাঁটা আর শব্দ যে নির্ভুল ঘাটে বাঁধা ছিল এখন আর তা নেই। ছোট ছোট কলকজার কোথায় একটা গণ্ডগোল ঘটে গেছে। কোথায়? সুধা ঘড়িটার দিকে একনজরে তাকিয়ে থেকেছে মাঝে মাঝে, বড় গোলমেলে এক নকৃশা অস্পষ্টভাবে মনে এসেছে কি আসেনি, সব কেমন জট পাকিয়ে অন্য একটা ছবি মনে ভেসে উঠেছে। সে-ছবি তো ঘড়ির নয়, ঘড়ির বাইরে থাকা এ-ঘরের এবং পথেরও। এই ঘর, বাসুর ঘর, সিঁড়ি—নিচে সদরের কাছে ঢাকা গলির মত পথটুকু, অফিস, রাস্তা, সেই চায়ের দোকানটা এবং সুচারু। মনের মধ্যে এদের ছবি, এতোগুলো দিন, কত বড়—কত যে দীর্ঘ! যেন নিশ্চল এক মেঘ, এ-প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত অবধি ছড়িয়ে রয়েছে।

ঘড়িটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। সুধা মনের অন্ধকারে তলিয়ে গিয়ে দুর্বোধ্য কলকজার খোঁজ নেবার চেষ্টা করে, একটুও আভাস যদি কোথাও পাওয়া যায়, কেন—কেন এমন হল, এমন কেন হয়!

বাড়ির ঘড়িটা চলছে চলুক, ওতে আর আস্থা নেই সুধার।

তিন

নীচের তলায় ভাড়াটে আসার পর থেকে বাসুদের দুপুরের আড্ডাটা ভেঙে গেছে। কিছুদিন বেশ জমানো গিয়েছিল এ-বাড়িতে। স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে আলসে মেজাজে সুপুরি চিবোতে চিবোতে সবাই এসে জুটত, গৌরাঙ্গ, মদন, পঞ্চানন, হাবুল, মণ্টা। নীচের তলায় ঘরটা ছিল ঠাণ্ডা। ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে সবাই বসে পরত। তাস চলত দুপুর ভোর, সঙ্গে খোশ গল্প। একটা সিগারেট পাঁচ-ছ-জনে ভাগাভাগি করে খেত, সবাই তিন চার টান করে। বিড়ির বেলায় এতটা কৃচ্ছ্রতা ছিল না, একজন ধরালে অন্যজনে শেষ করত।

তা দুপুরটা ভালই কাটত তাস পিটে, গল্প করে, মাদুরে গড়াগড়ি দিয়ে, ঘুমিয়ে। চারহাতে তাস বাটা হয়ে গেলে বাড়তি দু-জন খানিকটা সময় খেলা দেখত, অন্যের হয়ে মুরুব্বিয়ানা করত, তারপর ঘুম দিত। কিংবা ছ'আনা আট আনা-বালা রোমাঞ্চ সিরিজের ডিটেকটিভ গল্পের বই পড়ত। পাড়ার লাইব্রেরীর এন্তার বই তখন পাঠকের অভাবে ধুলো খাচ্ছে, আর পঞ্চানন সেগুলো আমদানি করছে এখানে।

নতুন ভাড়াটেরা আসার পর এই আড্ডা ভাঙল। আর কোথাও দুপুরের মজলিশটা বসাবে এমন জায়গা ছিল না। নন্তুরা কলকাতা ছেড়ে পালাবার পর তাদের বৈঠকখানাটা বন্ধ হয়ে গেছে। মণ্টাদের বাড়িতে গৌরাঙ্গ আর বাসু দিন কতক সন্ধ্যেবেলায় তাস খেলতে যেত, এখনও যেতে পারে, কিন্তু মণ্টার বাড়ির সে-আড্ডা ঠিক এ-রকম নয়। সেখানে স্ফূর্তি নেই। অন্দর মহলের মেয়েছেলে সঙ্গে করে খেলা ; বিড়ি ফোঁকা যায় না, দু'চারটে এদিক ওদিক কথা বলবারও উপায় নেই, তা ছাড়া মণ্টার সেই ভেজা পটলের মতন বড় বড় চোখবালা ফুলকো-লুচি মাসিটার এখন বিয়ের সম্বন্ধ আসছে,

খুব আঁট মেরে রয়েছে আজকাল। জল যেন বরফ মেরে গেছে। বাসুর আর ভালই লাগে না যেতে। 'তাস খেলতে কে যায়রে ওখানে, গৌরে; তুই-ই বল, যাই ত শালা একটু কাল্কি মারতে, তা পটলিই যদি আঁট মেরে যায়, কি ফায়দা গিয়ে? আমার বাবা স্ট্রেট্ টক্।'

অমন সুখের আড্ডাটা বেহাত হয়ে যেতে বাসু নতুন ভাড়াটেদের ওপর মনে মনে চটল। মুখেও দু'চারটে বুলি ছাড়ল নিখিল আর উমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। কিন্তু ঠেস দেওয়া কথা বলে আর কতটা জ্বালা মেটান যায়। তার ওপর রত্নময়ীও বাসুর কথাবার্তা শুনে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গালমন্দ করলেন। আরতিটা পর্যন্ত নতুন ভাড়াটেদের হয়ে যা তা শুনিয়ে দিল তাকে। বাসু অবাক হয়েছে, আরও ক্ষেপে গেছে, কিন্তু সরাসরি আর কিছু করতে পারেনি। গৌরাঙ্গকে বলেছে, 'বুঝলি রে—সব একেবারে বিভীষণ। শত্রু মাইরি, ঘরের শত্রু; নয়ত ও-শালাদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে দিতাম। আড়াই হাতি বেগুন গাছটার আবার কী চোট্ রে, গৌরে। তাকায় যেন কাঁটা ফুটিয়ে দিচ্ছে পট পট করে।'

দুপুরের এমন জমাট আড্ডাটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বাসুর অনেকটা সময় একেবারে যেন বেওয়ারিশ হয়ে গেল। কি করে যে দুপুরটা কাটাবে। গৌরাঙ্গর বাড়ী অবশ্য যাওয়া যায়। কিন্তু সে-বাড়ি আবার অন্য ধাতের। বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা হুড়োহুড়ি সে-বাড়িতে চলে না। গৌরাঙ্গদের বাড়ির সবাই যেন সর্বক্ষণ ঘোমটা টেনে বসে আছে। বাইরের লোকের সামনে তারা বেরোয় না, কথা বলে না! কতদিন গৌরাঙ্গকে ডাকতে গিয়ে বাসু ওর মার গলার শব্দটাই শুধু শুনেছে, চোখে দেখেনি। যদিও বা দেখেছে, জানলার পর্দার ওপর শুধু ঘোমটা টানা মুখখানা আবছাভাবে চোখে পড়েছে। গৌরাঙ্গর বাবাও প্রায় সেই রকম মানুষ। সকালের দিকে একবার ফতুয়া আর হাঁটুঝুল কাপড় পরা অবস্থায় ভদ্রলোককে দেখা যায়। খড়ম পায়ে থলি হাতে বাজারে যাচ্ছেন। মাছের জন্যে আলাদা এক পাত্র। তারপর ভদ্রলোককে অফিসের সময় অফিস যেতে আর বিকেলে ফিরতে দেখা যায় বাড়িতে। এ-ছাড়া কচিৎ কদাচিত।

গৌরাঙ্গদের বাড়ির বাইরের দিকে ছোট মতন ঘর আছে একটা। ও সেখানে বসে পড়াশোনা করত এককালে সরস্বতীর পট টাঙিয়ে। এখন ঘরটা সংসারের যত জঞ্জাল রাখার ঘর হয়েছে। দুপুরের দিকে গৌরাঙ্গ সেই ঘরে শোওয়া বসার মতন একটা জায়গা করে নিয়েছিল। কিন্তু দুপুরটা এতদিন এক রকম বান্টুদের বাড়ির আড্ডায় কাটছিল বলে ব্যবহার করতই না। আজ ক'দিন আবার দুপুরটা কাটাচ্ছে ও-ঘরে।

কালও গিয়েছিল বান্টু গৌরাঙ্গের ঘরে। গুঁতোগুঁতি করে তার পাশে শুয়ে কোনো রকমে দুপুরটা কাটিয়েছে। গৌরাঙ্গ একটা কেল্লামাত করা বই পড়ছিল। বান্টু শুনছিল। সবটা শোনা হয়নি। আজ বাকিটা শুনে নিতে হবে। কি করল তারপর সেই মেয়েটা? বাড়ি ছেড়ে পালাল না গলায় দড়ি দিল?

সময় মতন আজও বান্টু হাজির হল গৌরাঙ্গর কাছে। জানলায় বান্টুর আঙুলের টোকা পড়তেই গৌরাঙ্গ উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। ঘরে ফিরে এসে অন্দরের দিকের দরজাটা একেবারে বন্ধ করে দিল গৌরাঙ্গ ছিটকিনি তুলে।

'দেশলাই আছে? দে।' লুকানো জায়গা থেকে পাসিংশো সিগারেটের একটা পুরনো প্যাকেট বের করল গৌরাঙ্গ। 'পেট ফুলে গেছে মাইরি।'

দেশলাই ছিল না, তবে কয়েকটা কাঠি ছিল বান্টুর কাছে। মেঝেতে বারুদ ঘষে কাঠিটা পলকে জ্বালিয়ে নিল বান্টু। গৌরাঙ্গ সিগারেট ধরাল। মুখ বুক ভর্তি করে ধোঁয়া টানল, গিলল! যেন এতক্ষণ সত্যিই পেট ফুলে মরে যাচ্ছিল।

'আজ বুঝি কিছু মালকড়ি ঝেড়েছিস?' বান্টু গৌরাঙ্গর মুঠোয় সিগা-রেটের প্যাকেটটা ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বললে।

'সকালে টুনুমামার বাড়ি গিয়েছিলাম; গোয়াবাগান। কিছু রোজগার হল।' গৌরাঙ্গ হাত দুয়েক চওড়া বেঁটে তক্তপোশটার ওপর এসে আবার শুয়ে পড়ল। খুব আরাম করে ধোঁয়া গিলতে লাগল।

'তোর টুনুমামারা না পালিয়েছিল?' বান্টু গৌরাঙ্গর পাশে এসে

বসল। মনে মনে রোজগারের কথাটা ভাবছিল। গৌরাঙ্গর কাছে কত আছে—টাকা খানেক না তারও বেশি। বাসুর পকেটে আজ একটাও পয়সা নেই। দু'চার আনা ধার করবে তা হলে।

'ফিরে এসেছে।' গৌরাঙ্গ কাত হয়ে শুয়ে বাসুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাখির ম্যালেরিয়া ধরে গেছে বাইরে গিয়ে।' একটু চুপ। 'অনেক লোক আবার ফিরে আসছে, দেখছিস বাসু।'

'আসবে = কি, মামি বলেছিলুম কি জাপানী মাল। কি-স্যু হবে না।' বাসু এবার হাত বাড়িয়ে দিল সিগারেটটার জন্যে।

শেষ একটা টান মেরে গৌরাঙ্গ সিগারেটটা বাসুকে দিল। মাথার কাছে একটা ময়লা, মলাট-ছেঁড়া পত্রিকা পড়েছিল। সেটা উঠিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল।

বাসুর বেশ গরম লাগছিল। কপাল গলা ঘাড় ঘামছিল। গায়ের গেঞ্জিটা খুলে ফেলল বাসু। 'আমাকে আনা চারেক ধার দিবি?'

জবাব দিল না গৌরাঙ্গ। মাথা হেলাল। হ্যাঁ, দেবে। চোখ দুটো তার পত্রিকার একটা পাতায় আটকে গেছে। বাসু শুধু বন্ধুর মাথা হেলিয়ে সায় দেওয়াটা দেখল। কি পড়ছে গৌরাঙ্গ, সে-বিষয়ে তার এতটুকু আগ্রহ নেই। পয়সাটা পাওয়া যাবে এই নিশ্চিন্ততায় মনটা বেশ খুশী হয়ে উঠল। সিগারেটে টান দিতে লাগল।

'একটা গুলি—বন্দুকের গুলির খরচা কত বল ত?' গৌরাঙ্গ হঠাৎ শুধোল।

বন্দুকের গুলির খরচা? বাসু কথাটা যেন বুঝেও বুঝতে না পেরে গৌরাঙ্গর দিকে তাকাল। পত্রিকাটা পাতা খোলা অবস্থাতেই বুকের ওপর উলটে রেখে গৌরাঙ্গ তাকিয়ে আছে তার দিকে। বন্দুকের গুলির খরচ? বাসু ভাবল, অনুমান করবার চেষ্টা করল। কত হবে, কত হতে পারে? ধর্মতলায় দোকান আছে; লালবাজারেও বন্দুকের দোকান দেখেছে বাসু। দোকানগুলো তার মনে পড়তে লাগল। কিন্তু দোকানগুলোর

চেহারা ঠিক স্পষ্টভাবে মনে করতে পারল না। গুলির দাম? গুলি যে কেমন দেখতে হয়, ছবিতে ছাড়া বাসু আর তা দেখেই নি। বউবাজারের সেই বড় স্যাকরার দোকানের দাড়িবালা দারোয়ানটাকে মনে পড়ল। বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকে, ক্রসবেল্টের মতন বেল্টে গোটাকয়েক গুলি এঁটে। সঙ্গে সঙ্গে বাসুর কেন যেন মনে হল একটা গুলির দাম নিশ্চয় পাঁচ দশ টাকা হতে পারে না। আরও একটু হাতে রেখে বাসু শেষে বললে, 'দেড় দু' টাকা।' বলে গৌরাঙ্গর মুখের দিকে চেয়ে থাকল।

'এ-ক আনা।' গৌরাঙ্গ আঙুল দেখিয়ে এক সংখ্যাটা যেন আরও বিশ্বাস্য করে বুঝিয়ে দিল।

বাসু একেবারে থ। বিশ্বাসই হল না তার। কি বলবে ভাবছে, গৌরাঙ্গ আবার শুধোল, 'ওই যে বালির বস্তাগুলো দেখেছিস না, বলতো একটা বালির বস্তার খরচা কত?'

হ্যাঁ, বালির বস্তা দেখেছে বাসু। কত হতে পারে? বালির আর দাম কি, বস্তাটারই যা দাম। একটাকা পাঁচসিকে হোক্ বড় জোর। 'কত আর, টাকা খানেক হবে।'

'থ্রি অ্যানাস।' গৌরাঙ্গ এবার তিনটে আঙুল দেখাল। মুখের ভাবটা ওর এমন যেন এ-সব সে কত দেখেছে নেড়ে-চেড়ে। বাসুকে—বাসুর বুদ্ধিকে পরখ করে করে দেখছে।

রগড়টা গুলির বেলায় সহ্য করেছে বাসু, এবার আর সহ্য করতে পারল না। 'তিন আনা, ভাগ্ শালা। গুলপট্টী চড়াবার আর জায়গা পেলি না।'

'গুল। বেট্ ফেল।' গৌড়াঙ্গ তড়াক করে উঠে বসল, হাত বাড়িয়ে দিল বাজি ফেলার জন্যে।

'যা যা বেট্ ফেলতে হয় না।' বাসু পরম অবহেলায় শুয়ে পড়ল।

একটুক্ষণ বাসুকে দেখল গৌরাঙ্গ। তারপর পাশে শুয়ে পড়ে হাতের পত্রিকাটা দেখাল। 'গুল মারছিলাম। এই দেখ।'

বাসু দেখল। সত্যিই তাই। একেবারে ছাপার অক্ষরে লেখা। শুধু লেখা নয়, ছবিও রয়েছে। একপাশে ছোট্ট ছোট্ট ছবি! গুলি, বালির বস্তা,

এরোপ্লেন আর তার পাশে পাশে নাম লেখা। বেশ একটা কৌতূহল আর উৎসাহ বোধ করল বাসু।

'মাইরি!' অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা বিশ্বাস করে বাসু বোকার মত বলল। 'ওটা কি, পিস্তল?—কত দাম রে?'

'পঞ্চাশ।'

'রাইফেলটার?'

'একশো।'

ছবির পাশে নামটা লেখা ছিল, রাইফেল, পিস্তল, টমীগান। খুব মনোযোগের সঙ্গে ওরা দেখতে লাগল। গৌরাঙ্গও পড়তে লাগল। টমীগান আটশো পঞ্চাশ টাকা। মেসিনগান এক হাজার আটশো। অ্যান্টি এয়ার ক্রাফ্‌ট্...

'কি রে ওটা—?' বাসু শুধলো।

'এরোপ্লেন যখন উঁচুতে থাকে এই কামানে করে গুলি ছোঁড়ে। দেখিস না কাগজে লেখে, রেডিয়োতে বিমানধ্বংসী কামান। সেই—।'

'ও! কত দাম?'

'চল্লিশ হাজার।'

বাসু যেন দিশে পেল না। চল্লিশ হাজার। গৌরাঙ্গ বাকি ক'টাও পড়ে ফেলল। ফাইটার প্লেন এক লক্ষ চল্লিশ হাজার; ট্যাংক দু লক্ষ সাত— সাত হাজার। বোম্বার, মানে বুঝলি বাসু, যে প্লেনগুলো করে বোমা ফেলে রে তার এক একটার দাম দু'লক্ষ সত্তর হাজার।

আর পড়ার মত কিছু ছিল না। যা যা ছিল তাতে দু' বন্ধুর কারও উৎসাহ ছিল না। শ'য়ের পর যখন হাজার উঠল তখনই ওদের কল্পনার দৌড়টা যেন থমকে গিয়েছিল। তারপর লাখ-টাকের ব্যাপার। বোবা এবং বোকার মতন দুজনেই ছাপা পাতা এবং ছবির দিকে তাকিয়েছিল। কেউ কোনো কথা বলতে পারছিল না।

বেশ খানিকটা চুপচাপের পর বাসু বললে, 'হ্যাঁরে, এক একটা যুদ্ধে কত বন্দুক, কামান, এরোপ্লেন লাগে?'

'অনেক।' বাসুর বোকার মতন প্রশ্নের, গৌরাঙ্গ অত কোনো জবাব খুঁজে পেল না।

'তা হলেও কত হবে—আন্দাজ! শ—দুশো—পাঁচশো—?'

'তারও বেশি—হাজার হাজার—।' গৌরাঙ্গ আর কল্পনা করতেও পারল না। হঠাৎ যেন হতাশ এবং বিরক্ত হয়ে বলল, 'কে জানে শালা কত লাগে।'

আবার চুপ। বাসু কড়িকাঠ দেখছে। গৌরাঙ্গ চাপড়া খসে পড়া ছাদের কিম্ভূতকিমাকার চেহারা আর ঝুল। কেউ আর কথা বলছে না, নড়ছে না পর্যন্ত।

দু লাখ, তিন লাখ এক একটা বোমা ফেলা এরোপ্লেনের দাম। তার ওপর বোমার দামও আছে। সেও ক'হাজার করে কে জানে। তা ছাড়া বন্দুক, কামান ট্যাংক···। হাজার হাজার।

'কোটি কোটি টাকার চেয়েও বেশি টাকা খরচ হয় যুদ্ধ করতে, না রে গৌরে?'

গৌরাঙ্গ জবাব দিল না। বাসুও জবাব চায় নি। আপন মনেই বলছিল। নিজের খেয়ালেই ভেবে যাচ্ছিল যা খুশি।

'তোকে আমাকে লাখ খানেক করে দিয়ে দিক না মাইরি; এতো যখন টাকা ওদের।' বাসু গৌরাঙ্গর দিকে পাশ ফিরে একসময় হঠাৎ বলল, অর্থহীন গলায়। নির্বোধের মতন হাসতে হাসতে।

'কি করবি তুই?' এমনিই প্রশ্ন করল গৌরাঙ্গ। কিছু না ভেবে। কোনো জবাব প্রত্যাশা না করে।

'কেন, প্রেমসে খাবো দাবো, মাঞ্জা চড়াবো, কাপ্তেন হয়ে ঘুরবো—আর—' বাসু কি ভাবতে গিয়ে মুখটা আচমকা আহ্লাদ-আতিশয্যে ফাটোফাটো করে গৌরাঙ্গর গলা খপ্ করে জড়িয়ে ধরল। তার গায়ে মুখ গুঁজে শিহরিত হবার ভঙ্গি করে উথলে-পড়া গলায় বলল, 'আর না মাইরি গণ্ডা কয়েক মাগি রাখব।' বাসু বেশ জোরে, টেনে টেনে হাসতে লাগল।

'অ্যাই, অত জোরে হাসিস না, শালা। ভেতরে শুনতে পেলে হুড়কো

দিয়ে দেবে।' বাসুকে একটা ঠেলা মারল গৌরাঙ্গ। তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বাসুর গলা জড়াল। 'আমাকে একটা হারমোনিয়াম কিনে দিস যাইরি তখন, তোর মাগিদের কাছে বসে বাজাব।' চাপা গলায় বেশ পুলক ভরেই তার রসিকতাটা শেষে যোগ করে দিল গৌরাঙ্গ।

রঙ্গরসিকতার ভাবটা গৌরাঙ্গ ... টা তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল। বলল, 'এর মধ্যে একটা গল্প পড়লাম, ফাস্ট্‌ কেলাস।'

'কোথ্‌ থেকে আনলি কাগজটা?' বাসু শুধোল।

'টুনুমামার বাড়ি থেকে।' গৌরাঙ্গ পাতা উলটে আর একটা গল্প বের করে নিল। 'শুনবি নাকি এটা? পড়ব?'

'গল্প-টল্পর কাগজে ও-সব কেন থাকে রে—গুলি বন্দুকের দাম টাম?' বাসুর হঠাৎ প্রশ্নটা মনে হল।

'থাকে। বিজ্ঞাপন। ইংরেজরা টাকা চাইছে লড়াইয়ের জন্যে।' গৌরাঙ্গ জবাব দিল, 'আরও একটা এ-রকম আছে এই বইয়ে।'

'কই দেখি।'

'পরে দেখিস।' গৌরাঙ্গর আর ভাল লাগছিল না বাজে কথায়। গল্পর আকর্ষণ তাকে টানছিল, 'গল্পটা শুনবি?'

'পড় তুই।' বাসুর গলায় বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না।

গৌরাঙ্গ পড়ে যেতে লাগল। বাসু চুপ করে শুয়ে কড়িকাঠ আর মাথার ওপর ঝুলানো খানিকটা ইলেকট্রিকের কালো অকেজো তার দেখতে লাগল।

গৌরাঙ্গ রিডিংটা মন্দ পড়ে না। উচ্চারণ স্পষ্ট। থেমে থেমে আস্তে গলায়, কথাবার্তাগুলো যেমন ভাবে থাকে ঠিক তেমন ভাবেই ঝোঁক দিয়ে দিয়ে, তর তর করে পড়ে যাচ্ছিল এই গল্পটাও। বাসুর মনোযোগ অল্পই ছিল। তার কানে কমল আর সুষমা এই নাম দুটো ছাড়া আর বিশেষ কিছুই ঢুকছিল না। ওরা লেকের পাশে বসে 'লভ্‌' করছে এটাও বাসু বুঝতে পারছিল। আসলে অন্য কথা ভাবছিল বাসু। কিছু পয়সা কড়ি রোজগার করতে হবে। সিভিক গার্ডটা ছেড়ে দিয়ে অনেক কিছুই বেহাত হয়ে গেছে। চায়ের দোকান, পানের দোকান, লণ্ড্রি, কোনো শালাই আর খাতির করে

না।' বেলেঘাটার সেই শিশি বোতল ধোওয়া কাজটাও যদি না ছাড়ত বাসু তবু চলত এক রকম। আজকাল একেবারে পাইসলেস অবস্থা। পালিতদের দোকানের খানিকটা তার লোপাট করেছিল বাসু, গাড়ি থেকে সে-দিন, খুব পাতলা তার, তা প্রায় সের পাঁচেক ওজন। একটু তফাতে গিয়ে ঝেড়ে দিয়েছিল। মন্দ পাওয়া যায় নি। লোকটা হিন্দুস্থানী। বাসুকে বলেছিল, দুসরা কুছ রাহেনেসে ইঁহা লে আনা, বাবু। লোহেকো যো কুছ চিজ, কাঁটি তার—। লোকটার কথা থেকে বুঝতে পেরেছিল বাসু লোহার জিনিসের খুব দাম আজকাল। তার বিক্রীর সেই টাকাটায় কয়েকটা দিন বেশ কেটেছিল। বাসু আবার পকেটে পয়সা রাখতে পারে না। এলেই উড়িয়ে দেয়। তারপর হাত কামড়ায়। তার লোপাটের রোজগার থেকে মাকে দিয়েছিল টাকা দেড়েক, আরতিকে দু-চার আনা। কাল আবার হাতে পায়ে ধরে আরতির কাছ থেকে সেই দু-আনা ধার নিয়েছে। না, এবার থেকে একটু টাইট হতে হবে। গৌরাঙ্গটা চার আনা পয়সায় হপ্তা কাটিয়ে দিতে পারে। শালা এক নম্বরের কিপ্টে! আজ নিশ্চয় ওর পকেটে কিছু এসেছে ; নয়ত সিগারেট কিনত না। কিন্তু শালা কী ছোট লোক, বাসুকে একটা গোটা সিগারেট দিতে পারল না। বাসু হলে দিত, দেয় ; যদি থাকে। আর এতক্ষণে বোধ হয় চার পাঁচটা ফুঁকেই দিত।

হঠাৎ কেমন একটা জেদ চড়ে গেল বাসুর। গৌরাঙ্গকে ঠেলা দিয়ে বলল, 'একটা সিগারেট ছাড়'।

'এই না খেলি।' গৌরাঙ্গ কান দিল না, গল্পটা পড়ে চলল।

'এই খেলাম—, সে শালা কখন কোন জন্মে খেয়েছি, তাও তো পোঁদটুকু ঠেকিয়ে দিলি, তুই গৌরে বাপ কো বেটা, বেনের বাচ্চাই।'

গল্পর তখন চরম পর্যায়। মুমূর্ষু সুষমা দার্জিলিংয়ে বসে কমলকে চিঠি লিখছে। গৌরাঙ্গ চটে উঠল, 'বড্ড ডিস্টার্ব করিস তুই। সিগরেট ফিগরেট নেই।'

'কেন পট্টি দিচ্ছিস?' বাসু গৌরাঙ্গর হাতের পত্রিকাটা টানতে লাগল!

চটে মটে এক কাণ্ডই করল গৌরাঙ্গ। মাথার চিট বালিশের তলা থেকে

পাসিংসোর প্যাকেটটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল। 'খা, খা শালা—।' প্যাকেটটা কোথায় পড়ল না-পড়ল তাকিয়েও দেখল না—আবার পড়তে লাগল। মনে মনে।

বাসু উঠে বসে সেই গুদোমের মতন ঠাসা ঘরটায় প্যাকেটটা খুঁজতে লাগল হেঁট হয়ে, উবু মেরে। অ্যায়সা ছুঁড়েছে শালা যে কোন্ ফোকরে ঢুকে গেছে কে জানে। এদিক ওদিক খুঁজে একটা ভাঙা বেঁটে আলমারির তলায় হাত ঢুকোতে গিয়ে হঠাৎ বাসুর চোখে পড়ল, কাঁচভাঙা আলমারির তাকে ছুটো কলের মুখ আর পাইপ জোড়া ছোট ছোট কয়েকটা প্যাঁচ পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই হিন্দুস্থানী দোকানটার কথা মনে পড়ল। একটুক্ষণ সব কটা জিনিস দেখল বাসু। গৌরাঙ্গর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার। এখনও পড়ছে গৌরাঙ্গ।

প্যাকেটটা খুঁজে বের করে সিগারেট একটা ধরাল বাসু। আরও একটা আছে প্যাকেটে। গৌরাঙ্গর পাশে এসে বসল। আলমারির দিকে বার বার তার চোখ যেন কে টানছে।

গল্পটা শেষ হল গৌরাঙ্গর। খুব সম্ভব কাহিনীর শেষটায় মন ভাল হবার মতন কিছু ছিল। বাসুর ওপর যে চটে গিয়েছিল ও সে-কথা ভুলে গিয়ে বলল, 'ফিনিসটা বেড়ে দিয়েছে রে।' উঠে বসে হাত বাড়াল, 'টেনে ফাঁক করে দিলি যে একলাই—, দে।'

'আর একটা তো আছে, খা না।' বাসু প্যাকেটটা দেখিয়ে দিল।

'আমার বাপের টাঁকশাল দেখেছিস না কি তুই, খুব মেজাজ দিয়ে যে বলচিস।'

'বাপের না হোক্, তোর টুনুমামার ত আছে।'

বাসুর হাত থেকে প্রায়-নিঃশেষ টুকরোটা কেড়েই নিল এক রকম গৌরাঙ্গ। বলল, 'টুনুমামা আমাকে একটা চাকরি করিয়ে দেবে বলেছে।'

একটুক্ষণ গৌরাঙ্গর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল বাসু। অবিশ্বাসের চোখেই খানিকটা। 'কিসের চাকরি?'

'তা জানি না। বলেছে।' গৌরাঙ্গ হঠাৎ গলার স্বর একটু খাটো করে

বলল, 'টুনুমামা মালের বোতল বের করে ঝাড়ছে। কী দাম রে—! আমাকে এক জায়গায় একটা দিয়ে আসতে বলল। বিবেকানন্দ রোডে। কাগজে মুড়ে টুড়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল আমি কিছু বুঝব না। আমরা শালা বউবাজারের ছেলে, পোয়াতির পেটে হাত বুলোলে ছেলেমেয়ে বুঝতে পারি।' গৌরাঙ্গ নিজের কৃতিত্বে খুশী হয়ে হাসল।

'তাই বুঝি তোকে কিছু ছেড়েছে?'

'ঠিক তা নয়, এমনিতেও দেয়।' সিগারেটটা নিবিয়ে ফেলে দিতে দিতে বলল গৌরাঙ্গ।

একটু চুপচাপ। বাসু গেঞ্জিটা তুলে গলা বুকের ঘামটা মুছল। 'এক গ্লাস জল নিয়ে আয় গৌরে, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।'

গৌরাঙ্গরও তেষ্টা পেয়েছিল। ও উঠল। বাইরের দিকের জানলাটা এবার খুলে দিল। ধোঁয়ার গন্ধ তাড়াতেই যেন।

গৌরাঙ্গ দরজার ছিটকিনি খুলছে, বাসু বললে, 'এই, আসার সময় সেই চার আনা নিয়ে আসিস, আমি কিন্তু জল খেয়েই চলে যাব,—বাড়িতে একটু কাজ আছে।'

গৌরাঙ্গ চলে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে রেখে। বাসু একটু অপেক্ষা করল কপাটের দিকে তাকিয়ে। খুব সতর্ক চোখে, কান খাড়া করে। তারপর চট করে উঠে আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তাকাল আবার দরজার দিকে। হাত বাড়াল। হঠাৎ কেমন একটা ভয় হল। মনে হল, গৌরাঙ্গ যেন দরজা খুলছে। হাত গুটিয়ে নিয়ে বাসু একটু সরে এল। না, কেউ আসছে না। কপাট তেমনি ভেজান। তবে কি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছে? গৌরাঙ্গই দেখছে নাকি, না অন্য কেউ?

না, হল না। বাসুর কেমন যেন বিশ্রী লাগছিল। ভয়ও। এখন না হলেও পরে গৌরাঙ্গর কাছে সে ধরা পড়ে যাবে। ও ঠিক বুঝবে, কে এই ঘর থেকে কলের মুখ গেঁড়িয়েছে। তখন? বন্ধু—তার বন্ধু গৌরাঙ্গর কাছে তখন বাসু কি কৈফিয়ত দেবে? আলমারির পাশ থেকে আরও একটু সরে এল বাসু।

একটু পরেই গৌরাঙ্গ ঘরে এল। হাত বাড়িয়ে গ্লাস নিয়ে জলটুকু নিঃশেষ করল বাসু। আবার মুখের ঘাম মুছল পুঁটলি করা গেঞ্জিটা দিয়ে। হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল, হাই তুলল। এ-সবই নিজেকে বেশ সহজ করার চেষ্টা। তক্তপোশ ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে একটু হাঁটাহাঁটি করল। আলমারির কাছে গিয়ে নিজের মাপের সঙ্গে ' উচ্চতা মেলাল। এই দিসটাকে আর রেখেছিন কেন, ফেলে দে গৌরাঙ্গ, তবু খানিকটা জায়গা হবে ঘরটার।' বলতে বলতে যেন হঠাৎ চোখ পড়েছে কলের মুখটা এমনি এক ভঙ্গি করে বাসু দেখল আলমারির মধ্যেটা। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল একটা কলের মুখ। 'তোদের?' গৌরাঙ্গকে দেখিয়ে শুধোল।

মাথা নাড়ল গৌরাঙ্গ। হ্যাঁ, তাদের ছাড়া কার হবে!

একটু ভাবল বাসু। 'দিদি একটা কেনার কথা বলছিল, আমাদের কলের মুখটা খারাপ হয়ে গেছে। এটা আমায় দে না। প্রায় নতুনই ত। দিদি দাম দিলে তোকে দিয়ে দেব।'

'তা নে।' গৌরাঙ্গ জানতই না ওখানে কলের মুখ পড়ে আছে। কেউই হয়ত জানে না—খেয়ালই নেই কারুর।

বাসু হাত বাড়িয়ে আর একটা কলের মুখও তুলে নিল। বলল, 'দুটোই নিয়ে যাই, যেটা লাগে রাখব, অন্যটা তোকে ফেরত দিয়ে দেব।'

গৌরাঙ্গ আপত্তি করল না। মিনিট খানেক চুপচাপ। বাসু বললে, 'দে পয়সাটা দে, আমি যাই।'

'চ আমিও যাব।' গৌরাঙ্গ কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।

'চা খাওয়াবি ত!' বাসু গেঞ্জিটা কাঁধে ফেলে নিল।

'হ্যাঁ, রে হ্যাঁ। শালাকে পয়সা দাও, চা খাওয়াও, সিগারেট খাওয়াও—বিয়ে করলে বউটাও তোকে দিয়ে দেব। নে চল্ এখন।' গৌরাঙ্গ বাসুর কাঁধে একটা ঠেলা দিল।

বাইরে বেরিয়ে গলি দিয়ে এগুচ্ছে—দেখল, হাবুল ছুটতে ছুটতে আসছে। তার খানিকটা পেছনে মণ্টা। সেও ছুটছে। দূর থেকেই হাবুল চেঁচিয়ে বলল, 'ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মারপিট হচ্ছে।'

বাসু গৌরাঙ্গ দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাবুল ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে। প্রশ্ন করার দরকার হল না, হাবুল নিজেই বলল, 'ফাইট্ লেগে গেছে। খুব পেঁদাচ্ছে রে! বেধড়ক।' হাবুলের মুখে চোখে উত্তেজনা। খবরটা দিয়েই আবার সে ছুটতে লাগল। মণ্টাও কাছে এসে গেছে।

'কি হয়েছে রে মণ্টা?' বাসু শুধোল।

'মেরে লাট করে দিচ্ছে শালারা ওয়েলিংটনে।' মণ্টা না দাঁড়িয়ে ছুটতে ছুটতে বলল।

বাসু আর দাঁড়াল না, ছুটতে লাগল। পিছু পিছু গৌরাঙ্গ। শ্রীনাথ দাস লেন হয়ে, গলি ঘুঁজি দিয়ে ছুটতে ছুটতে চলল ওরা। হাবুলকে ধরে ফেলল। কলের মুখ দুটো গৌরাঙ্গর হাতে দিয়ে ছুটতে ছুটতেই গেঞ্জিটা গায়ে গলিয়ে নিল বাসু।

মলঙ্গা লেনের ভেতর দিয়ে ওয়েলিংটনের কাছাকাছি আসতেই গলির মুখে আশে পাশে পাড়া বেপাড়ার কিছু লোক চোখে পড়ল। বই খাতা হাতে কিছু ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে মনে হয় কলেজের ছেলে সব। তাদের মুখ চোখে অস্বাভাবিক এক উত্তেজনা। কারুর জামা ছিঁড়েছে—কারুর পায়ে জুতো নেই, কেউ বা ভাঙা চশমাটা বার বার দেখছে। একটি মেয়েকেও দেখা গেল, আঁচল-ছেঁড়া শাড়ি কোমরে জড়িয়ে কি যেন বলছে।

গৌরাঙ্গ বা বাসু কেউই ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। বোকার মতন সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

বাসু একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিল কর্পোরেশন স্কুলটার দিকে। তে-কোণা ক্ষুদে পার্কটার কাছেও যায় নি, আচমকা কে যেন তাকে ডাকল। ঘাড় ঘুরিয়ে বাসু দেখে, পিছু থেকে সাধনদা ডাকছে। মলঙ্গা লেনের সাধনদা। বাসু ফিরে এল ক' পা। সাধন বলল, 'এই একটা কাজ কর ত। একটা মেয়ের মাথা ফেটে গেছে। তাকে নিমাইবাবুর ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে পারবি?'

কাজটা কঠিন নয়। কিন্তু বাসুর এখন এ-জায়গা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে নেই। 'নিমাই ডাক্তার এখন বাড়িতে—সন্ধ্যের আগে ডাক্তারখানায় আসে না।' বাসু জবাব দিল।

‘কম্পাউণ্ডারটা ত আছে ; নিয়ে যা।’

গৌরাঙ্গ কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখে বাসু যেন উপায় খুঁজে পেল। ‘গৌরাঙ্গকে দিয়ে পাঠিয়ে দিন, ওর সঙ্গে কম্পাউণ্ডারের চেনা আছে।’ সাধনের মুখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলল বাসু। তারপর গৌরাঙ্গর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল ‘তুই নিয়ে যা গৌরাঙ্গ। তুই গেলে কাজ হবে।’

সাধনের আপত্তি হল না। বাসু আর না দাঁড়িয়ে আবার এগুতে লাগল। কর্পোরেশনের স্কুলের পেছন দিকের গলিটায় দু একজন দাঁড়িয়ে আছে। গলিটা ছোট, সোজা ওয়েলিংটন স্ট্রীটে পড়েছে। গলির সেই মুখ থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ার দশ বিশ পা। বাসু গলির দিকেই এগিয়ে চলল। গণেশ অ্যাভিনু ফাঁকা।

পাঁচিল ঘেরা স্কুলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল বাসু। বাঁ দিকের লাল বাড়ির দোতলার সব জানলাগুলো বন্ধ, সদর দরজাটা আধ-ভেজান। কপাটের আড়ালে কারা যেন আছে। রকের নীচে এক ছোকরা দাঁড়িয়ে। কাপড় গুটিয়ে হাঁটু পর্যন্ত তোলা। গায়ের শার্টটার বুক পিঠ ভেজা। কালো চেহারা। মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো। রকের পাশে গোটা পাঁচেক থান ইঁট রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ওরই আর এক সাকরেদ। গলির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে গলা বাড়িয়ে কি দেখছে আর হাত নেড়ে ইশারা করছে।

বাসু একটু দাঁড়াল। তাকাল ছোকরার দিকে। তারপর ওর দিকে একটু সরে গিযে শুধোল, ‘কি হয়েছে দাদা?’

ছোকরা প্রথমে যেন ভ্রূক্ষেপই করল না বাসুর কথায়। দাঁত দিয়ে কব্জিতে বাঁধা রুমালটায় আরও শক্ত করে গিঁট দিতে লাগল। বাসু আবার শুধোল।

‘এতক্ষণ কি ঘুমুচ্ছিলেন নাকি, কি হয়েছে জানেন না।’ বাসুকে খিঁচিয়ে উঠল ছোকরা। ‘যান না, গিয়ে দেখুন।’

কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ সেই ছোকরা তড়িৎ গতিতে লাল বাড়ির ভেজান দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গলির মুখের ছেলেটিও তীরের বেগে ছুটে এদিকে আসছে। পালাতে বলছে হাত নেড়ে।

বান্নুর গায়ের ওপর এসে পড়ল ছেলেটি। তখনও বোকার মতন দাঁড়িয়ে বান্নু। হতভম্ব। ব্যাপারটা সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

পলকে ছেলেটি লাল বাড়ির আধ খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরজা ওরা বন্ধ করে দিয়েছে বেশ বুঝতে পারল বান্নু। পিছু তাকিয়ে দেখে মলঙ্গা লেনের মধ্যে থেকে সব সরে গেছে। রাস্তাটা ফাঁকা। সামনে গলির মুখের ভেতর পুলিসের লাল মটর-বাইক ঢুকে পড়েছে। পলকে বান্নু পিছু ফিরে দৌড় মারল।

প্রথমেই যে ডান হাতি ছোট গলি তার মধ্যে ঢুকে পড়ল বান্নু। দু তিন জন উঁকিঝুঁকি মারছিল। বান্নুকে ঢুকে পড়তে দেখে তারাও খানিকটা পিছু ছুটল।

পুলিস আসছে না দেখে আবার সব একে একে গলির মুখের কাছটায় এসে দাঁড়াল।

'আপনিই ফাঁসাবেন মশাই।' বান্নুরই বয়সী একটি ছেলে বলল।

'আর একটু হলেই ত হালুয়া বের করে দিত।' আর একজন বললে।

বান্নু কোনও জবাব দিল না। মণ্টা, হাবুল কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না বান্নু। গৌরাঙ্গ কি নিমাই ডাক্তারের ডাক্তারখানায় গেছে। গেছে নিশ্চয়। এতক্ষণে ব্যাণ্ডেজ ট্যাণ্ডেজও বাঁধা হয়ে গেছে বোধ হয়। সেই কালো রোগা মতন মেয়েটি কোথায় লুকিয়েছে? সাধনদার বাড়িতে কি? বান্নুর বুকের মধ্যে দ্রুত তালে একটা ধক্ ধক্ শব্দ বেজে চলেছে। মুখ চোখে ঝাঁঝ ছুটছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? এরা সবই কলেজে টলেজের ছেলে মনে হচ্ছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে কেন এসেছিল? পুলিসই বা ওদের তাড়া করছে কেন?

'আমাদের বিদ্যাসাগরের ছুটোকে নাকি অ্যারেস্ট করেছে?' একজন বললে বান্নুর পাশ থেকে।

'ফোর্থ ইয়ারের সুনীতকে ধরেছে নিশ্চয়। ও একেবারে সামনে ছিল। ফ্ল্যাগ হাতে।' অন্য জন বলল। 'মেয়েটি কোথাকার বলতে পারিস?'

'কোনটা, যার মাথা ফেটেছে?'

'না, না—যার হাত থেকে ফ্ল্যাগ কেড়ে নিল সার্জেন্টটা ?'

'ওয়্যানসের বোধ হয়।'

মলঙ্গা লেনের ফাঁকা পথে আবার একজন দু'জন করে এগিয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে। বাসুও বেরিয়ে এল গলি ছেড়ে। সাধনদাদের বাড়ির দিকে এগুতে লাগল আস্তে আস্তে।

কর্পোরেশন স্কুলের পেছনে আবার একটু ভিড়। বাসুকে খিঁচিয়ে-ওঠা সেই ছোকরাও দাঁড়িয়ে আছে। তখন একটু চটেছিল, এখন কিন্তু তার ওপর বাসুর আর রাগ হল না। সে-সময়ই যেন এখন নয়। অন্য এক রকম অবস্থা। কী যেন হয়েছে, হচ্ছে। পাড়ার মধ্যে দু'দলে ঝগড়া নয়, পাড়া বে-পাড়ায় মারপিট নয়, অন্য কিছু। দু'টো ছেলেকে পুলিসে ধরেছে, একটা মেয়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, ফ্ল্যাগ কেড়ে নিয়েছে।

ছোট জটলাটার কাছে এসে দাঁড়াল বাসু। সেখানেও সেই এক কথা। দু'জন, তিনজনকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিসে; তিন নয়, পাঁচ। পুলিসের লাঠির চোট খেয়েছে বিশ পঁচিশ জন, মাথা ফেটেছে হাত ভেঙেছে জনা পাঁচেকের। সার্জেন্টের ব্যাটনে পিঠের মেরুদণ্ডও ভেঙেছে একজনের। সেই শুয়ারের বাচ্ছা সার্জেন্টটা সামনেই দাঁড়িয়ে আছে—ওয়েলিংটন স্ট্রীটের ওপর। আর তার পায়ের কাছে এখনও ফ্ল্যাগটা পড়ে রয়েছে।

জটলার মধ্যে কে একজন বললে, 'মিছি মিছি আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, প্রসেসান ভেঙে গেছে, পনেরো আনাই ত ফিরে গেছে। চলো আমরাও ফিরি। কাল একবার দেখা যাবে।'

এক মুখ ব্রণ, চোখে পুরু কাচের চশমা, দোহারা চেহারার ছেলেটি রাজী হল না। তার কথা, ফ্ল্যাগটা যেমন করেই হোক রাস্তা থেকে তুলে আনতে হবে।

কে যাবে আনতে ? কার সে-সাহস আছে ?

'এই অরুণ—' বাসুকে যে খিঁচিয়ে উঠেছিল সেই ছোকরা বললে, ব্রণওয়ালা ছেলেটিকে, 'তুই যদি একটা ইঁট ঝেড়ে সার্জেন্টটাকে একটু পিছু হটাতে পারিস—আমি ফ্ল্যাগটা তুলে স্ট্রেট সামনের গলি দিয়ে কেটে পড়ব ওদিকে—।'

কথাটা মনঃপূত হল যেন সকলের। তা হলে এই গলিটা আগে সাফ কর, না হলে শালারা এদিকেই ছুটে আসবে।

এই, পালাও সব। ভেগে যাও। হাত দিয়ে ঠেলে ঠুলে ইশারা করে সকলকে সরে যেতে বলল। চলে গেল অনেকেই। বাসু তবু দাঁড়িয়ে।

ব্রণওয়ালা ছেলেটি বলল, 'ইঁট যদি মিস করে নির্মল, তোকে তা হলে আর ফিরে আসতে হবে না।'

'নেভার মাইণ্ড্। ন্যাসনাল্ প্রেস্টিজ আগে। তুই আয়—।' ও এগিয়ে যেতে লাগল।

অরুণ একটা থান ইঁট তুলে নিল। ভাঙলো দু' টুকরো করে। বাসুর দিকে চোখ পড়ল হঠাৎ। সে-চোখ কেমন যেন। বাসু এ-ভাবে আর কাউকে তাকাতে দেখে নি। ও কি হাসছে, ও কি বাসুকে ঠাট্টা করছে, না কি বাসুকেও ইঁট তুলে নিতে বলছে।

দপ্ করে একটা আগুনের হল্কা যেন বাসুর মাথা আর হাত দুটোকে জ্বালিয়ে দিল। পায়ের ডিম দুটো কাঁপল একটু। আর কোন রকম খেয়াল থাকল না বাসুর। খপ্ করে দু হাতে দুই থান ইঁট তুলে নিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলল, 'চলুন।'

আশ্চর্য, সে-ছেলেটিও কিছু বলল না। দু'জনে পাশাপাশি এগুতে লাগল।

গলির মুখে নির্মল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কাছে আসতে নির্মল বলল অরুণকে, 'সোয়াইনটা কি রকম দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ। একেবারে সামনে।'

গলির মুখের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে অরুণ দেখল। দেখে যেন হতাশ হল।

কৌতূহল বাসুরও কম নয়। মুখ বাড়িয়ে অবস্থাটা সে দেখবার এবং বোঝবার চেষ্টা করল। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের ও-দিকটা—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের ক্রসিং পর্যন্ত ফাঁকা—একেবারে খাঁ খাঁ করছে। এ-দিকেও বউবাজারের এ-পাশটায়ও অনেকটা পথ মানুষ জন চোখে পড়ে না। কাছাকাছি দোকান-গুলোর দরজা ভেজান না বন্ধ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে সামনে ওদিকের

ফুটপাথের নিউ রেস্টুরেন্ট আর লণ্ড্রি, পানের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। রেস্টুরেন্টের কাছে—রাস্তার ওপর নির্মলদের সেই সার্জেন্টটা দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনেই ট্রাম লাইনের ওপর একটা ফ্ল্যাগ লুটোপুটি খাচ্ছে। স্কুলের দিকে রাস্তার একপাশে একটা ডাস্টবিন। ওদিকের ফুটপাথে এক ভাঙা ঠেলা গাড়ি। খানিক রাস্তায়, খানিক ফুটপাথে উঠে গেছে। এদিকে ওদিক দু একটা খাতা পত্র, ছেঁড়া পাতা, বই, স্যাণ্ডেল। সমস্ত জায়গাটা কেমন যেন এলোমেলো ; এই দুপুরেও নিঃঝুম।

বাসু ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল। গণেশ অ্যাভিন্যুর মোড়ের কাছে সার্জেন্টের লাল মটর-বাইক। সেখানেও এক বেটা সার্জেণ্ট দাঁড়িয়ে। চার মোড়েই দু চার জন করে পুলিস। বাকি দলটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে পার্কের কাছে মসজিদটার গায়ে। গাছের ছায়ায়। পুলিসের গাড়ির ওপর দু চার জন পা ঝুলিয়ে বসে।

অরুণ আর নির্মলে কথা হচ্ছিল। ‘ওই শুয়ারের বাচ্চাটা সরবে না, না কি।’ নির্মল অসহিষ্ণু। ‘সরবে নিশ্চয়, তবে কতক্ষণে কে জানে।’ অরুণের ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব।

বাসুও অনেকক্ষণ থেকে ভেবে চিন্তে হিসেব করে ফেলেছে! গোটা দুয়েক ইঁট আচমকা ঝাড়তে পারলে—ও-বেটা ঠিক খানিকটা পিছু হটে যাবে। সেই ফাঁকে একজন ফ্ল্যাগটা কুড়িয়ে সটান অক্রুর দত্ত লেন দিয়ে কেটে পড়। খুব সোজা ব্যাপার।

কথাটা বলল বাসু অরুণকে। বুঝিয়ে দিল কত সহজেই কাজ হয়ে যায়। তারপর নির্মলের দিকে চেয়ে বলল, ‘আমি ও-বেটাকে হটিয়ে দিচ্ছি ইঁট ঝেড়ে, আপনি ফ্ল্যাগ নিয়ে কেটে পড়ুন।’

‘অত ইজি ব্যাপার নয় স্যার—’ নির্মলের অসহিষ্ণু হতাশ মুখে বিরক্তি আর উপহাস। ‘আপনার আর ইঁট ঝেড়ে দরকার নেই। তার চেয়ে কেটে পড়ুন। তাতে কাজ দেবে।’

বাসু আর কিছু বলল না। ছোকরা এতক্ষণ যে কেন রোয়াব নিচ্ছিল ভেবে হাসি পাচ্ছিল ওর। এ একেবারে খাস কলকাতায় বাচ্চা। বাত

আছে লম্বা চওড়া, কাজে কিছু নয়। রাস্তার মধ্যে বসে পড়ে ইট দুটো ভেঙে চার টুকরো করতে লাগল বাসু।

দূরে বউবাজারের দিক থেকে, একটা শব্দ ভেসে আসছিল। বহু কণ্ঠের স্বর। নির্মল আর অরুণ একটুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকল। ইঁট ভাঙা শেষ করে একটা ভাঙা টুকরো হাতে করে উঠে দাঁড়াল বাসু।

'আর একটা প্রসেসন আসছে!' নির্মল বলল।

'কাদের রে?'

'রিপনের হবে বোধ হয়।'

'সিটিরও হতে পারে।'

বাসুও কান পেতে থাকল। অথচ চোখ সামনের দিকে। সার্জেণ্টটাকেই দেখছে বাসু আড়াল থেকে। কিন্তু ওকি—? মসজিদের ছায়া থেকে একদল পুলিস এদিকে এগিয়ে আসছে। গণেশ অ্যাভিন্যুর মোড় থেকে সার্জেণ্টটাও ছুটতে ছুটতে আসছে।

নির্মল আর অরুণ গলির মধ্যে খানিকটা ঢুকে পড়ল। ডাকল বাসুকে, 'সামনে দাঁড়াবেন না মশাই, ভেতরে চলে আসুন। ঝামেলায় ফেলবেন না আমাদের।'

বাসু নড়ল না! চুপ করে দাঁড়িয়ে। পায়ের কাছে তিনটে আধ ভাঙা ইঁট, ডান হাতে একটা।

প্রসেসানই বটে। কাছে এসে পড়েছে ওরা। খুব সম্ভব লালবিহারী ঠাকুর লেন ছাড়িয়ে চলে এসেছে। ওদের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই, মহাত্মা গান্ধী জিন্দাবাদ, বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারত ছাড়। ভারত ছাড়, ভারত ছাড়।

ওয়েলিংটন স্ট্রীটের চুপচাপ নিরিবিলি নিঃঝুম ভাবটা হঠাৎ কখন যেন কেটে গেল। অকস্মাৎ এক কোলাহল আর উত্তপ্ত ভাব। পুলিসের দল ছুটতে ছুটতে সামনে এসে পড়ল। সার সার দাঁড়িয়ে সারাটা রাস্তা আটকে ফেলেছে। সেই সার্জেণ্টটা এগিয়ে এসেছে আরও ক' পা। হাতে ব্যাটন। ক্রস বেল্টের রিভলবারটা বাঁ হাতে চেপে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বাপ্পু পিছু ফিরে তাকাল। গলির মধ্যেও পাতলা ছাড়া ছাড়া ভিড়। নির্মল আর অরুণ আবার এগিয়ে এসেছে।

প্রসেসানটাকে এবার দেখতে পাওয়া গেল। ওদিকের আধখোলা দোকানগুলো ঝটপট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এরাও সব কলেজের ছেলে। ধুতি শার্টের চেয়ে প্যান্ট্ শার্টের বাহুল্যই বেশি। বেশ বড় বড় ছেলে। সামনে সার্জেণ্ট আর পুলিসের পাঁচিল দেখে অকস্মাৎ যেন এক অদ্ভুত উল্লাস ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের গলায়। উত্তেজনা টগবগিয়ে উঠল। বন্দে মাতরম। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই। কুইট ইণ্ডিয়া। 'মেডিকেল কলেজ।' নির্মল চিৎকার করে উঠল, 'অরুণ, মেডিকেল কলেজ রে।'

বাপ্পুর পা যেন পাথর হয়ে গেছে। চোখ দুটো অপলক। হাতের শিরায় থেকে থেকে কেমন এক কাঁপুনি উঠছে থর থর করে।

প্রসেসান আর পুলিস মুখোমুখি—হাত দশেকের ব্যবধান। সার্জেণ্টটা কি যেন বলছে। হাত নাড়ছে। গো ব্যাক্। গো ব্যাক্। ইউ উইল নট বি অ্যালাউড টু গো। ক্লিয়ার আউট।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর এক পাগলা বাতাস যেন ঝাপটা মেরে বয়ে গেল। করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা। ডু অর ডাই। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের রাস্তা কাঁপিয়ে থরথর এক শব্দ ভেসে উঠল। ওরা এগিয়ে যাবেই। যাবেই। বাধা মানবে না।

কিন্তু ওকি? বাপ্পুর বুকের মধ্যে ধক্ করে এক শব্দ হল। পুলিস এলোপাথাড়ি লাঠি চালাচ্ছে। সার্জেণ্টটা ব্যাটন হাঁকড়াচ্ছে যেদিক সেদিক। পেছন থেকে আরও পুলিস ছুটে আসছে। বুটের শব্দ। আরও দু-জ'ন সার্জেণ্ট। ছেলেরা ছত্রাকার। সামনের দিকটা ছিঁড়ে ছটকে গেছে, পিছনের দল থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটা ফরসা গোলগাল মতন ছেলে রাস্তায় পড়ে গেছে মুখ থুবড়ে। টুপি খোলা সার্জেণ্টটা তার বুট সমেত লাথি মারল ছেলেটার মাথায়। গলির মুখে ঢুকে পড়েছে আর একটি ছেলে মাথা দিয়ে দরদর করে রক্ত। কার হাত ভেঙেছে। কেউ পিঠ কুঁজো করে কাতরাতে কাতরাতে বসে পড়েছে ফুটপাথে।

সার্জেণ্টটা এবার এদিকেই ছুটে আসছিল—গলির দিকেই।

বাসুর পা দুটো আবার একটু কাঁপল, কাঁধের কাছে খানিকটা মাংসপিণ্ড যেন থর থর করে উঠল।

আর মাত্র হাত পাঁচ ছয় দূরে সার্জেন্টটা। ব্যাটন উঁচিয়ে মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে আসছে। গালাগাল দিতে দিতে।

খুব আচমকা বাসুর ডান হাতের ইঁটটা এবার ছুটে গেল। তারপর পায়ের কাছে যে কটা ছিল—সব কটা। পর পর।

একটু যেন থতমত খাওয়া অবস্থা। সার্জেন্টটা মাথা মুখ দুহাতে চেপে বসে পড়েছে। পিছন থেকে এবার ছুটে আসছে গোটা পাঁচেক পুলিস আর এক দিশী সার্জেন্ট।

ইঁট আর নেই। বাসু চোখের পলকে পিছু ফিরে দৌড়। গলিটা ততক্ষণে খালি হয়ে গেছে।

আধ ঘণ্টা খানেক পরে আবার এল বাসু। মলঙ্গা লেনের সেই গলি দিয়েই। মুখ বাড়িয়ে দাঁড়াল। রাস্তা ফাঁকা। কিছু কিছু পুলিস আছে তখনও। লাল মটর-বাইকে করে দুজন সার্জেন্ট একবার বউবাজার—আর একবার ওয়েলিংটনের দিকে যাচ্ছে আর আসছে। রাস্তাটা আবার নিঝুম, শান্ত হয়ে এসেছে। কেমন এক ছন্নছাড়া চেহারা। কার যেন একটা রুমাল দমকা হাওয়ায় একটু একটু করে উড়ে অক্রূর দত্ত লেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাসু চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। পাশে তার মণ্টা।

পড়ন্ত বেলার রোদ উলটো দিকের দোকানগুলোর মাথায় উঠে গিয়েছিল। রাস্তাটা ছায়ায় ভরা। একটা খেঁকি কুকুর ট্রাম লাইনের ওপর পড়ে থাকা সেই ফ্ল্যাগ দাঁতে করে ছিঁড়ছিল। খেলছিল বোধ হয়।

এক লাল-পাগড়ি পুলিস যেন অনেকক্ষণ ধরে দেখছিল ব্যাপারটা। আচমকা প্রাণপণে হাতের লাঠিটা ঝাড়ল তার পিঠে।

বিশ্রী, জঘন্য এক চিৎকার। কঁকিয়ে লেজগুটিয়ে পিঠ দুমড়ে কুকুরটা চেঁচাতে চেঁচাতে ছুট দিল।

কুকুরটাকে দেখছিল বাসু। বেশ ভাল লাগছিল দেখতে।

চার

গুমোট গরম দিন। দুপুরের দিকে মনে হয়েছিল, এক পশলা বৃষ্টি হবে বিকেল কি সন্ধ্যে নাগাত। কোথায় বৃষ্টি! অন্যদিন তবু এ-সময় একটু হাওয়া বয়ে যায়। আজ বাতাসও বন্ধ। অন্তত এই গলির মধ্যে।

গিরিজাপতির কপাল গলা ঘাড় বুক ভিজে উঠেছিল ঘামে। খালি গা; হাত-পাখার হাওয়া খাচ্ছেন অনবরত; তবু গা-মুখের ভিজে চটচটে ভাবটা যাচ্ছে না। বাইরের দিকের জানালা খোলা। ঘরের মাঝমধ্যিখানে কড়ি কাঠ থেকে ঝুলোনো বাতিটা কালো পুরু কাগজের চোঙা দিয়ে ঢাকা; সামান্য একটু আলো কোনোরকমে অন্ধকারটুকু ঘুচোচ্ছে। সেই ঝাপসা, অস্পষ্ট আলোর ছিটে-ফোঁটা এখানে, এই তক্তপোশের ওপর। গিরিজাপতির অসুবিধে হয় খুব। তবু এ-ভাবে বিছানায় বসেই তিনি লেখাটা সেরে রাখেন।

সামনে ছোট মতন এক ডেস্ক। বাহারী নয়, তবে মজবুত। ডেকসের ওপর বিঘতটাক মাপের লম্বা বাঁধানো পুরু খাতা। কুচকুচে কালো রঙের বেশ পুরুষ্টু মেণ্টমোর কলম। পাশে কাঁচের গ্লাসে আধখাওয়া জল। পকেট ঘড়িটা ডেস্কের এক কোণে না-শোনা শব্দে টিক টিক করে বেজে যায়।

গিরিজাপতি লেখেন খুব ধীর স্থির একাগ্র ভঙ্গিতে। মানুষটির বসার এবং মুখের দিকে তাকালেই এটা বোঝা যায়। পিঠ মাঝে মাঝে ডেস্কের দিকে হেলে পড়লেও, প্রায়শই তা সোজা হয়ে থাকে, কলম তখন বন্ধ, চোখ জানালার দিকে কিংবা অন্ধকারে স্থির হয়ে আছে; অন্যমনস্ক মনে হয়, আসলে মনের ভেতর কাজ চলছে তখন, দৃষ্টিটা তাই আপাত-অর্থহীন। দু-চার লাইন লেখার পরই থেমে যান। কলমের মুখটি কখনও খুলে রাখেন না, বন্ধ করে ফেলেন। সোজা পিঠ হয়ে বসে পরের কথাটা ভাবেন

হাত-পাখার হাওয়া খেতে খেতে। চশমাটা কখনও বা খুলে রাখেন, কখনও বা কাঁচটা অযথাই মোছেন।

ওঁর মুখে একটি সুস্থির শান্ত এবং সংযত ভাব আছে। মনে হয় লেখার মধ্যেও যেন এসবের স্পষ্ট ছাপ পড়ে যাচ্ছে। মনে যা এল, তরতর করে লিখে গেলেন, তা নয়। মনে অনেক কিছু আসে। আসুক। যা মনে আসে তাইই লেখার বিষয় নয়। অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত বিবেচনার একটা চালুনি আছে গিরিজাপতির মনে। তাতে সব কিছু তিনি ঝেড়ে নেন, ছেঁকে ফেলেন, ধুলো-বালি, খড়-কুটো আলাদা হয়ে যায়। তারপর বাদ-বিচার, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের নিজস্ব নীতি-নিরিখ। যেখানে ঔৎসুক্য যতটা ততটা চিন্তা ভাবনা, লেখাও সেই মত। কোনো কোনো বিষয়ে গিরিজাপতির আগ্রহ গভীর। এবং জিজ্ঞাসা তীব্র।

গিরিজাপতির জীবনে আত্মজিজ্ঞাসা কিছু আছে। তাঁর লেখার খাতাটি খুললে এ-সব জানা যায়; মুখে কদাচিত শোনা যায়। বা শোনা গেলেও এত আচমকা এবং স্বাভাবিক সরল ভাবে যে, সাধারণত মনে হয় না, উদ্দেশ্যহীন কথা ছাড়া এর তাৎপর্য আর কিছু আছে। দোষটা গিরিজাপতির নয়, শ্রোতাদের। তাঁর অবশ্য শ্রোতাই নেই। নিখিল আর উমা কখনো কখনো এমনি দুএকটি কথা কাকার মুখে শোনে, আর ভেবে নেয়, কাকার এই কথা তাদের জন্যে ঠিক নয়, হয়ত কারুর জন্যেই না। ওরা ভাল করে জবাবও দেয় না। দিতে পারে না।

গিরিজাপতিকে হয়ত তাই লিখতে হয়। নিজের কথা নিজেকেই গুছিয়ে খাতায় তুলে রাখতে হয় আঁচড় কেটে কেটে। উনি অবশ্য মুখ ফুটে কাউকে বলেন না, এই লেখা আমার আত্মচিন্তা বা আত্মকথা। বরং নিখিলরা ভাইবোনে জানে, তাদের কাকা ডায়েরী লেখে। কাকার বাঁধানো কালো খাতাগুলোকেও তারা ডায়েরী বলেই জানে।

গিরিজাপতিও মুখে তা-ই বলেন, কখনো যদি দরকার হয় উল্লেখ করবার। কিন্তু মনে মনে জানেন, ডায়েরী নয়, স্মৃতিকথা নয়, জীবনীও নয়—নিজের কথা। হ্যাঁ, খাতার গোড়ায়, প্রথম পাতাটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় পাতায় একটু

ঘোটা করে লেখা থাকে 'নিজের কথা'। তার তলায় ছোট অথচ শুরু করে বাঙলা সন, ব্র্যাকেটের মধ্যে ইংরিজী। বৈশাখের প্রথম দিনটি আরও একটু ছোট হরফে। বৎসরের শুরুতে একটি করে নতুন খাতা আসে—বৎসরের শেষে সেটি সযত্নে সুটকেসের মধ্যে রেখে দেন।

এ-রকম অনেকগুলি খাতা জমা হয়ে গেছে তাঁর সুটকেসে। তা দশ বারোটা ত হবেই। অথচ তার আগেও গিরিজাপতির কথা ছিল। এখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন। প্রায় শেষ হতে চলেছে। আশ্বিনে ছাপ্পান্নোয় পড়বেন। এই দীর্ঘ জীবনের মধ্যে মাত্র শেষের দশ কি বারো বছরের কথা থাকল; বাকি পঁয়তাল্লিশটা বছর তিনি কোথায় ফেলে এলেন।

গিরিজাপতি সে-কথা লেখেন নি। মুখেও বলেন না কিছু। এই দশ বারো বছরের কথার মধ্যে কোথাও সে-অতীতের উল্লেখ নেই। কিন্তু নিজের কথা না থাক অন্যের কথা আছে; নিরপেক্ষ প্রসঙ্গ। তার থেকে আর পাঁচটা পুরনো কথা জানা যায়। জানা যায় না শুধু গিরিজাপতির কথা। সেখানে তিনি আশ্চর্যভাবে নীরব। হয়ত গিরিজাপতির কাছে নিজের সে-অতীতের কোনও মূল্য নেই। কিংবা হতে পারে ব্যক্তিগত জীবনের এক দীর্ঘ পরিচ্ছেদ তিনি অশ্রুত রাখতে চান।

খাতায় কালি-কলমের আঁচড়ে উল্লেখ না থাক মনের অন্ধকার পাতায় কত বিচিত্র এবং বিক্ষিপ্তভাবে জীবনের সেই সুদীর্ঘ পর্বের স্মৃতি ধরা হয়ে আছে। চোখ বন্ধ করে ভাবতে বসলে, আকাশে ছড়ানো তারার মতন এলোমেলো স্পষ্ট অস্পষ্ট অজস্র ঘটনা আর স্মৃতি চিকচিক করে ওঠে। তারপর এক সময়ে মনে হয়, (যখন আবার এই বর্তমানের মধ্যে ফিরে আসেন, তখন মনে হয়) ওই আকাশ, ওই অজস্র তারা সব হারিয়ে গেছে; এখন সকাল—কালকের রাত আজকের আলোয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কখন, কে জানে।

আজকের কথা লিখতে বসেও খুব সহজে লিখতে পারেন না গিরিজাপতি। মনে হয়, ভিজি-ফেল মেল ট্রেনে করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে যাচ্ছেন। চোখের সামনে দিয়ে মাঠ ঘাট, একটু-আলো-আলো স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে হুস করে, যেটা বড়-সড় সেখানে গাড়ি থামতে না থামতে আবার বাঁশি

বেজে উঠছে ছাড়ার। এতটুকু স্থিতি; ভাল করে দেখবার জানবার অবকাশ নেই, ভিড় আর হৈ হট্টগোল, পুরনো মানুষ নামছে, নতুন মানুষ উঠছে, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে আবার। একটু ধীরে সুস্থে চোখ চেয়ে দেখবার ভাববার অবকাশ নেই। মেল গাড়ি ছুটে চলেছে।

নিজের কথা লিখতে বসে গিরিজাপতি নিজস্ব আগ্রহ এবং ঔৎসুক্যকে সব চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেন, ঠিকই— ; প্রয়োজন অপ্রয়োজনের বাদ বিচার করেন খুবই হিসেব করে, বিবেচনার ও ব্যক্তিগত জ্ঞান বুদ্ধির যথাসাধ্য শ্রম—তবু তিনি খুশী নন, সন্তুষ্ট নন মনে মনে। মনে একটা অসম্পূর্ণতা এবং সংশয় ভাব থেকেই যায়। ভীষণ এক অতৃপ্তি। এই সংশয় এবং অতৃপ্তি বড় গভীর, অন্তর্মুখী। গিরিজাপতির সংযত, শান্ত, নীরব ব্যক্তিত্বের বাইরের চেহারায় তার দাগ ফোটে না। শিকড়ের মতন তলায় তলায় ছড়িয়ে যায়।

এই স্থিতধী সংযত মানুষটিও কিছুদিন ধরে বড় বিচলিত হয়ে পড়েছেন। মাথার ওপর ঝড়ের মেঘ যে ক্রমশই ঘনিয়ে এসে আকাশ থমথমে করে তুলেছে গিরিজাপতি স্পষ্টই তা অনুভব করতে পারতেন। কিন্তু দুর্যোগের যে-মূর্তি এখন দেখছেন এ-মূর্তি তাঁর অনুমানের মধ্যে ছিল না।

গান্ধীজীর 'কুইট ইণ্ডিয়া'র কথা শুনে গিরিজাপতি আগেই তাঁর খাতায় লিখেছিলেন: "আমার বয়স পঞ্চান্ন পেরিয়েছে অনেক দিন। আমি বাঙালী। 'কুইট ইণ্ডিয়া' আমার কাছে খুব নতুন কথা নয়। আমরা তখন ছোট, তবু অরবিন্দর 'ইণ্ডিয়া ফর ইণ্ডিয়ানসে'র কথা স্কুল-টুলে পড়বার সময় শুনেছি। তারপর প্রথম যৌবনে পেয়েছি বিপিন পালের সেই 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার লেখা—'আওয়ার সিনকুল ডিজায়ার'—আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে পড়তাম। মুখস্থ করতাম। আজও মনে আছে। সে-কথা ভোলার নয়। ইংরেজ বর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতার সেই সব দাবীর পর 'কুইট ইণ্ডিয়া, আমার কাছে পুরনো সাধারণ কথা। তবে ও-শব্দটা নিখিলদের খুব মনে ধরেছে দেখছি। ওর বন্ধুরা এই নিয়ে খুব গলা ফাটাচ্ছে। এ-রকম হয়। কথাটা তারা নতুন শুনেছে। সমস্ত দেশটাই বোধ হয়।"

গানতয়া চটকদার ফাঁপা কথায় মন না দিয়ে গিরিজাপতি অন্য দিকে মন

দিয়েছিলেন। যে-সংকট দিনে দিনে ঘনিয়ে উঠছিল এবং ক্রমশই একটা নির্দিষ্ট গতির ইঙ্গিত হয়ে উঠছিল গিরিজাপতি তা ধরবার চেষ্টা করছিলেন।

কংগ্রেস যে তার দাবী থেকে আর এক পা-ও সরে দাঁড়াবে না—এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তেমনই বোঝা গিয়েছিল, বৃটিশ রাজনীতির শক্ত গিঁট আলগা হবে না। স্বদেশ বিদেশের কাগজে যে পালটা পালটি গালমন্দ; দোষ এবং ছুতো বের করার ঝড় উঠেছিল—তার দিকে চোখ রাখলে চিন্তিত না হবার কারণ ছিল না। গিরিজাপতি বেশ বুঝতে পারতেন, দু'দিকের অনমনীয়তা এক ভয়ঙ্কর পরিণতির পথে এগিয়ে চলছে, ভীষণ দ্রুত গতিতে। এ-আশঙ্কার কথা তিনি লিখেছেনও নিজের খাতায়।

"ওরা আমাদের বিশ্বাস করতে পারছে না। আমরাও ওদের বিশ্বাস করতে পারছি না।" গিরিজাপতি লিখেছেন কিছুদিন আগেই তাঁর মনোভাব সরল সহজ করে: "ওদের অবিশ্বাসের কারণ বুঝতে পারি। যুদ্ধ যখন এগুতে এগুতে ঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, তখন আমাদের দাবী যতই নৈতিক হোক, এ-দেশের শাসনভার ও তা রক্ষা করার দায়িত্ব ওরা আমাদের হাতে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। আর সম্পূর্ণ সামরিক দায়িত্ব ত স্বার্থের খাতিরেই সে তুলে দিতে পারে না। আমরা যতই বলি না কেন, জাপানকে রুখবো—সত্যিই যদি জাপান আসে রুখতে পারব না। কারণ যুদ্ধ করার শিক্ষাটা আমাদের জানা নেই। অস্ত্রশস্ত্রর বালাইও নেই। অসহযোগ, অহিংসাও জাপানকে ঠেকাবার তেমন একটা বড় অস্ত্র নয়। জাপানের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা নেই—এই শর্তে যদি একটা সন্ধি করে ফেলি স্বাধীনতা পেয়ে সেটাও কি খুব সুখের হবে, আমাদের পক্ষে অথবা বৃটেনের পক্ষে? না তার ফল ভাল হবে পৃথিবীর পক্ষে? চীনের কাছে জহরলালের কৈফিয়তই বা কি হবে? সামরিক দায়িত্বটা বৃটেন নিক—বাদ বাকি সব আমাদের থাক—এও হয় না। সে হবে পূর্ণ স্বাধীনতার এক গলা-কাটা-ধড়ের চেহারা। অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি হবে তা ঠিক করার ক্ষমতা না থাকার অর্থ হাফ-স্বাধীনতা; অর্থাৎ পরমুখাপেক্ষী থাকা।......ইংরেজেরা যেমন আমাদের বিশ্বাস করতে পারছে না, আমরাও তেমনি ওদের বিশ্বাস করতে

পারছি না। না পারাই স্বাভাবিক। ওরা আমাদের শত্রু, গান্ধী যতই বোঝাবার চেষ্টা করুন না কেন শত্রু নয়! দ্বিতীয় কারণ, ইংরেজ-রাজনীতি খুব প্যাঁচালো এবং তার প্রবঞ্চনার উদাহরণ আমরা বহু দেখাতে পারি। মুখে যদি বলেও তবুও যে যুদ্ধের পর বৃটেন আমাদের স্বাধীনতা দেবে—সে-কথা আমরা বিশ্বাস করব না, এমনই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।"

অনেক ভেবে দেখেছেন গিরিজাপতি এবং মোটামুটি এই বিশ্বাস তাঁর হয়েছে, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ এত তীব্র যে, এখন কোনও রকম বোঝাপড়ার ব্যবস্থা হতে পারে না। অথচ, রাজনীতির লেনদেনের কারবারেই শুধু নয়, সাধারণ ব্যাপারেও একটা আপস-রফায় আসতে হলে, খানিকটা বিশ্বাস আর আস্থা রাখতেই হয়। না রেখে উপায় নেই। তাঁবুর মধ্যে উটের মুখ গলানোর মতন একটু মাথা নাক ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে শরীরটাকে জুত করে গুছিয়ে নেওয়া, আর তারপর তাঁবুর মালিককে হটিয়ে দেওয়া—এই কি কংগ্রেসী রাজনীতির বাঁধা সড়ক ছিল না? এখন আর সে-পথে কংগ্রেস হাঁটছে না। ক্রীপস ফিরে যাবার পর থেকে চার পাশের ভীষণ চাপে বেশ খানিকটা অসহায় হয়ে উঠেছে। সেটা বোঝা যায়। এখন তাই মরিয়া।

বিশ্বাসের প্রসঙ্গে গিরিজাপতির মনে কিছুদিন ধরে একটি প্রশ্ন বার বার জেগেছে। তাঁর মনে হয়েছে, অমন যে গান্ধী, স্বাভাবিক বিশ্বাসে যিনি অটল ছিলেন তাঁর মনেও অবিশ্বাস জন্মেছে। ইংরেজ রাজনীতির ওপর। তিনি বেশ হতাশ হয়ে পড়েছেন।...অবিশ্বাস আর অহিংসা এই দুইয়ের গুণগত বিরোধী-ভাবটা ভাবতে বসে গিরিজাপতি কিছুকাল আগে লিখেছিলেন—"এরা পরস্পর বিরোধী। এদের উৎস এক বলে, এবং ধর্ম বিপরীত বলে, কখনোই একই গাছের দুটি ডালের মতন এরা বেড়ে উঠতে পারে না।

"আমি স্পষ্টই বলব অহিংসাকে যদি গান্ধীর একমাত্র ধর্ম ও জীবন-দর্শন বলে স্বীকার করে নিতে হয়—তা হলে, তাঁর মধ্যে কোথাও অবিশ্বাসের স্থান থাকতে পারে না। অহিংসা দিয়ে আমি কার সঙ্গে যুঝবো? হিংসার সঙ্গে নিশ্চয়। যদি ধরে নিই হিংসা একটা শাশ্বত অপরিবর্তনীয়

প্রবৃত্তি—তবে হিংসার কাছে অহিংসার কোন প্রার্থনাই থাকতে পারে না। যা অপরিবর্তনীয় তার কাছে পরিবর্তন কে আশা করে! কিন্তু একথা গোড়াতেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, মানুষ দানব নয়, যদিও তার দানবের মতন ব্যবহার হামেশাই আমরা প্রত্যক্ষ করছি। একটি বিবেক, সৎ-অসৎ জ্ঞান, কল্যাণজ্ঞানও তার আছে। হয়ত তা বিন্দু পরিমাণ। অহিংসা সমস্ত মানুষের এই বিবেকের দরজাটিকে নাড়া দেয়। এক সময় সে-দরজা খোলে। যদি না খুলত—হিংসার জয়জয়কার হত, অহিংসার নয়। মনুষ্যত্বের ওপর এই অবিচলিত বিশ্বাস আছে বলেই অহিংসা দৈত্যকুলের মুখোমুখি হবার শক্তি রাখে। নচেৎ তার আর মূল্য কি! ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোক যদি ইংরেজের ওপর বিশ্বাস হারায়—হারাক, তারা অহিংসার নামাবলী গায়ে চড়িয়ে গান্ধীবাদী সেজেছে। গান্ধীর গায় নামাবলী নেই, অহিংসা তাঁর মেদ মজ্জা জীবন। তিনি কেন অবিশ্বাস করবেন ইংরেজকে? ন্যায়ত তিনি পারেন না। অহিংসার নৈতিকতা এর ফলে অমান্যই করা হয়। কিন্তু আদর্শ এক জিনিস, উদ্দেশ্য অন্য জিনিস। রাজনীতি গান্ধীকে আদর্শ থেকে সরিয়ে উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যে ক্রীপসের ওপর আজ নেতাদের এত উষ্মা, সেই ক্রীপসই মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, কয়েক বছর আগে গান্ধী বলেছিলেন, বৃটেন কথা দিক, ভারতবর্ষকে সে স্বাধীনতা দেবে—সেই প্রতিশ্রুতির ওপর গান্ধী বছরেরর পর বছর অপেক্ষা করতে রাজি আছেন। কথাটা কথার কথা হতে পারে, কিন্তু তাঁর যোগ্য কথা। এ যেমন তাঁর মুখে মানায়, ঠিক তেমনি বেমানান লাগে যখন অধৈর্য হয়ে বলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্যে তিনি আর অপেক্ষা করতে পারেন না। ...যে দেশ দুশো বছর ধরে পরাধীন, আরও দশ বিশ বছর পরাধীন থাকলে তার কুষ্ঠির আকাশ পাতাল পার্থক্য হবে না। কিন্তু দেশের দুশো বছরের তপস্যায় যদি সত্যিই এক গান্ধীর আবির্ভাব হয়ে থাকে, তবে সে-দেশের দীর্ঘ তপস্যার ফলটিকে কীটমুক্ত থাকতেই হবে। না হলে একটি কীট থেকে শত কীট, সহস্র অন্যায় জন্ম নেবে। শনির পক্ষে সামান্য একটি ছিদ্রই যথেষ্ট, রোগ বীজাণুর মতন সে দ্রুত এবং দুরন্ত ভাবে বাড়ে।"

গিরিজাপতি অনেক ভেবে এ-সব কথা লিখেছিলেন। লেখার পরও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। মনে হত, হয়ত তিনি ভুল করলেন। বিচারের ভুল! খটকা লাগত। সবচেয়ে বড় খটকা লাগত তাঁর নিজের মনেই। গিরিজাপতি জানতেন, নিখিলদের মতন তিনি গান্ধীজী গান্ধীজী করতে পারেন না। কেন? কি কারণ? মন। তাঁর মন এই মানুষটিকে কিছুতেই নিখুঁত একটা কিছু বলে মেনে নিতে পারত না।

মানুষের স্বভাবই এই, গিরিজাপতি ভেবে ভেবে কোনো কূল কিনারা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছিলেন, আমরা সকলের পা নিজেদের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করি। না মিললেই মাথা খারাপ হয়ে যায়। হয় তাকে ঠাকুর দেবতা মহামানব গোছের একটা কিছু তৈরি করে ফেলি না হয় পশুটশু। গান্ধীকে এরা ঠাকুর দেবতা বানিয়ে ফেলেছে। তাঁর চেলার দল। বাঙালী অন্তত এরকমটা পারত না কিছুকাল আগে পর্যন্ত। রামমোহন-বিদ্যাসাগরকে মন্দিরের মধ্যে ঢুকোতে না পারার লজ্জায় সে মাথা খোঁড়েনি। এমন কি অরবিন্দকেও নয়। তার শোধ নিচ্ছে এখন। রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দ পর্যন্ত ঠাকুর ঘরের দেওয়ালে চালান হয়ে গেছে। কাউকে ভগবান বানাবার আগে এককালে আমাদের একটু তর সইত, ঝটপট রাতারাতি তৈরি করে ফেলতুম না। বড় জোর দয়ারসাগর কি দেশবন্ধু পর্যন্ত এগুতাম। এখন আর তর সয় না। বড় সহজে এবং সস্তায় আজকালকার দেবতারা গজিয়ে উঠছে। আমাদের চিন্তা বুদ্ধি দৃষ্টি যে কত ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে এই তার প্রমাণ। বাঙলা দেশে হিরো ওয়ারশিপ ছিল—কিন্তু হিরোরা গড হয় নি। বঙ্কিম আনন্দমঠে সত্যানন্দকে হিরো করেছিলেন, গড করেন নি। আনন্দ-মঠে অন্য এক মা ছিল—বঙ্কিম তাকেই দেবতার আসন দিয়েছিলেন। সে দেবতা এই ভারতবর্ষ। এখন দেশ আর দেবতা নয়, গান্ধীই দেবতা। অনেক আগেই একজন বলেছিলেন, ছদ্মবেশী বামনের মতন যে ত্রিপাদ ভূমি গান্ধী অধিকার করেছেন তা এই দেশ, দেশের মানুষের মন আর কংগ্রেস; আমরা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি।...কথাটা আমার প্রায়ই মনে পড়ে।

গিরিজাপতির কাছে সবচেয়ে অদ্ভুত লেগেছিল গান্ধীজীর আন্দোলন

শুরু করার সময় নির্বাচন ব্যাপারটা। কাগজে বেশ ফলাও করে 'হরিজন' থেকে লেখাটা হুবহু তুলে নিয়ে ছেপেছিল। বার দুয়েক বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে গিরিজাপতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে একসময় নিখিলকেই শুধোলেন, 'আজকের কাগজ দেখেছ?'

'দেখেছি।' মাথা নাড়ল নিখিল।

'গান্ধীর জবাবটা পড়লে—ওই যে 'অবিশ্বাসীদের প্রতি'।'

এবারও মাথা নাড়ল নিখিল। পড়েছে।

'ব্যাপারটা আমায় বুঝিয়ে দাও ত?' গিরিজাপতি ভাইপোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

নিখিল একটু ইতস্তত করে বলল, 'এ-কথা আগেও তিনি বলেছেন।'

'বেশ ত, বলুনই না। আমি বুঝতে পারি নি। তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও।' এমন ভাবে বললেন গিরিজাপতি, যেন মনে হল বলছেন নিখিলকে, এম-এ পড়তে এসেছ—বিশ পঁচিশ লাইনের একটা স্টেটমেণ্ট বুঝোতে পারবে না?

না বোঝানর মতন যে কিছু নেই নিখিলও তা জানে। কিন্তু কাকাকে কিছু বোঝান অন্য কথা। উনি বড় খুঁটিয়ে তর্ক করেন, এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন —যার জবাব দেওয়া নিখিলের অসাধ্য।

'আমরা এই জগতজোড়া যুদ্ধে যোগ দিতে পারছি না, এটা ভীষণ লজ্জার কথা।' নিখিল তার নরম স্বভাবের মতনই নরম স্বরে বলল, 'সমস্ত দেশের কাছে আমাদের মাথা নিচু হয়ে আছে। এদিকে যুদ্ধও ত শুরু হয়েছে বছর তিনেক হতে চলল প্রায়। এ-ভাবে আর কতদিন অপেক্ষা করা সম্ভব। তাই—।' নিখিল যুক্তির প্রথম ধাপটা শেষ করে দ্বিতীয় ধাপ ধরতে যাচ্ছিল। গিরিজাপতি বাধা দিলেন।

'এই যুদ্ধ ত ভারতবর্ষের যুদ্ধ নয়। ইংরেজ তোমাদের মত না নিয়ে নিজেদের খুশি মতন এ-দেশকে যুদ্ধে টেনেছে—এটাই ত তোমাদের আপত্তি ছিল। এ-অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তোমরা প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব ছেড়েছ, যুদ্ধের বিরোধিতা করে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছ এই সে-দিনও।

রাতারাতি সে মত পালটে গেল! আজ যুদ্ধে সাহায্য করতে না পারার লজ্জায় একেবারে মাথা কাটা যাচ্ছে?'

'সে-সময়কার অবস্থা আর এখনকার অবস্থা এক নয়। এখন মাথার ওপর শত্রু। জাপান দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।' খুব একটা জোরাল যুক্তি দিয়েছে এমন নিশ্চিন্ত এবং দ্বিধাহীন স্বরে নিখিল জবাব দিল, 'যুদ্ধের চেহারা এখন বদলে গেছে, আগের মতন নেই।'

গিরিজাপতি ঠিক এই জবাবটাই প্রত্যাশা করেছিলেন। কৌতুক বোধ করলেন তিনি। নিখিলের দিকে চেয়ে ধীর গলায় বললেন, 'যে-ভারতবর্ষ বৃটেনের, তার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধের সম্পর্ক, কিন্তু যে-ভারতবর্ষ তোমাদের তার সঙ্গে ত জাপানের কোনো শত্রুতা নেই। আজ বৃটেন এ দেশ ছেড়ে চলে গেলে তোমরা কি জাপানের সঙ্গে লড়তে যাবে?'

'না।'

'কেন নয়, এত বড় পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে লড়তে না পারার জন্যে যে তোমাদের মাথা কাটা যাচ্ছিল! ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে গেলেই বুঝি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধটা থেমে যাবে রাতারাতি!'

নিখিল চুপ। প্রশ্নটা বড় জটিল। বেশ বুঝতে পারছিল নিখিল, এর কোন জবাব নেই। হয় বলতে হবে, ভারতবর্ষ যুদ্ধে নিজেকে জড়াবে না, না হয় বলতে হবে, এই পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে আমরা ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়ব —গণতন্ত্রর মঙ্গলের জন্যে। তা যদি লড়বে, তবে আগে কেন যুদ্ধের বিরোধিতা করেছ, এখনই বা কেন লড়ছ না, বৃটেন যদি চলে যায় আজ, জাপানের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কেনই বা তুমি লড়তে যাবে না?

'প্রশ্নটা নীতির—'গিরিজাপতি সমস্যাপীড়িত ভাইপোর মুখের দিকে শান্ত চোখে চেয়ে বললেন, 'গান্ধীর নীতি-বিচার আমার মাথায় ঢোকে না। এই যুদ্ধকে তোমরা ঘৃণা করেছ, গান্ধী বার বার সমস্ত রকম যুদ্ধের বিপক্ষে তাঁর ঘোরতর প্রতিবাদ আর বিতৃষ্ণা জানিয়েছেন। কিন্তু আজকের ওই কাগজে তিনি কি বলছেন পড়ে দেখ। বিদেশী শাসনের কবল থেকে মুক্ত হলে তোমরা সগৌরবে এই যুদ্ধে যোগ দিতে পারবে। শেষ সমাধানটাও

থাকি তোমাদের হাতে। কি মানে এ-কথার? যুদ্ধ করার গৌরবও চাই আবার অহিংসার মুকুটও পরবে। এ সেই সোনার পাথরবাটি।'

নিখিল যার দুই কাকার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে আগে, এখন তক্তপোশের ওপর ভাঁজ করা কাগজটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল।

'আমাদের দেশের মানুষ ইংরেজদের ওপর বীতরাগ। জাপান একবার যদি ঢুকে পড়ে এ-দেশে—আমরা সবাই হুড়মুড় করে তাদের দলে ভিড়ে যাব।' গিরিজাপতি আবার বললেন, 'গান্ধীর এ-আকাঙ্ক্ষা ঠিকই। তবে কি জান নিখিল, মালা চন্দন দিয়ে ঘরের শত্রুকে ডেকে আনা যেমন আমাদের স্বভাব, তেমনি সেই শত্রুকে কিছুদিন কায়েম হয়ে বসতে দেওয়া, ধূপ ধুনো দিয়ে পুজো করাও আমাদের ধর্ম। ইতিহাসে কি তার প্রমাণ পাও নি? জাপানকে এনে বসালেও ইংরেজদের ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদের তাড়াতে পারব না—কিছুদিন খুব ঘটা-টটা করে বসিয়ে রাখব। তারপর—?'

নিখিল চুপ। জবাব নেই মুখে। মনে মনে সে বলল, অত ভবিষ্যৎ ভাবার দরকার কি। হাতি এখন পাঁকে পড়েছে—এ-সুযোগ আমরা ছাড়তে পারি না—যা করবার এখনই করতে হবে।

নিখিল চলে গেল—গিরিজাপতি চুপচাপ বসে ভাবতে লাগলেন।

তারপর আর থিতিয়ে-খতিয়ে ভাবার কিছু ছিল না। এক একটা দিন ত নয়, এক একটা ঝড়ের কালো মেঘ হু হু করে ভেসে আসছিল, আর আকাশে ঘনঘটা দেখে আসন্ন ভয়ঙ্কর ঝড়ের ভূমিকাটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল।

প্যাটেলের গুজরাট সফর শেষ, জহরলালের ইউ পি, কৃপালনীর বিহার। সবাই তৈরী। দেশ, দেশের মানুষ। গান্ধীজীর পিছু পিছু তারা এগিয়ে যাবে। গণ আন্দোলন, ব্যাপক সত্যাগ্রহ, ধর্মঘট, স্কুল কলেজ আদালত বয়কট—উনিশশো উনিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত যত রকম উপায় অবলম্বন করেছে কংগ্রেস—এবারের আন্দোলনে সব আছে, সমস্ত। কি নেই, না—কংগ্রেস

যা চিরকাল ঘৃণা করে এসেছে এবং বর্জন করেছে—সেই হিংসা। সর্বপ্রকার হিংসা।

অথচ মাত্র পরশু কি তার আগের দিন গিরিজাপতিকে তাঁর খাতায় লিখতে হল: "খবরের কাগজের একটি খবর বড় ভাল নয়। মাদ্রাজে রাজগোপালাচারী এক প্রতিবাদ করেছেন। ও অঞ্চলে নাকি খুব গুজব, সাতই আগস্ট ধর্মঘট আর হাঙ্গামা হবে। লোকে সেই ভয়ে খাবারদাবার যোগাড় করে রাখছে। রাজগোপালাচারী এই গুজবের খবরে অবাক হয়ে বলেছেন, কথাটা মিথ্যে; কিছু হবে না—। সাতই বলে নয় শুধু, ভবিষ্যতেও। সাতই কংগ্রেসের নেতারা বোম্বাইয়ে আসছেন মিটিং করতে, আলোচনা করতে, কংগ্রেস কি করবে তা ঠিক করতে।...খবরটা কলকাতার কাগজে বেশ বড় বড় হরফে ছেপেছে। উচিত হয় নি। এতে ভালর চেয়ে মন্দই বেশি হল। মাদ্রাজের না-শোনা জনরব বাঙলা দেশে ছড়াল। তেমনি অন্য প্রদেশেও কি না ছড়াবে? বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ের দিন হাঙ্গামা হবে—এ জনরব ছড়াল কে? কেন? কি উদ্দেশ্যে? আর কাগজে কাগজে তার খবরই বা কেন?"

হয়ত কিছু আছে, হয়ত কিছুই নেই। গিরিজাপতি অনেক ভেবেও স্থির করতে পারেন নি। শুধু এই মাত্র তাঁর মনে হয়েছিল, এ-কাজ উচিত হয় নি। কোনো মতেই না। সতর্কতা অনেক সময় প্ররোচনা হয়ে দাঁড়ায়। অস্পষ্ট কিন্তু বিশ্রী এক আশঙ্কা এবং দুশ্চিন্তায় পীড়িত হচ্ছিলেন তিনি। চিন্তা—চিন্তা—চিন্তা। মনে হত, তিনি যেন জীবন-মৃত্যুর সীমানা রেখায় অজ্ঞান, অথর্ব এক রুগীর দিকে তাকিয়ে আছেন। অসহ উদ্বেগ এবং ব্যাকুলতা নিয়ে। আর সময়ের ঘড়িটা কানের কাছে প্রতি মুহূর্তের উদ্বেগকে আরও গভীর এবং অস্থির করে বাজিয়ে যাচ্ছে।

পাঁচই আগস্ট, ছয়ই—; সমস্ত দেশ আরব সাগরের দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে। ওখানের আকাশে আস্তে আস্তে একটি নক্ষত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গিরিজাপতির মনে হয়, শান্ত স্থির কল্যাণের নক্ষত্র ওটি নয়। হয়ত নক্ষত্রই নয়, ধূমকেতু। আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ঠিক ধরা যাচ্ছে না।

সময়ের গতি অত্যন্ত দ্রুত। উত্তেজনা লাফ দিয়ে দিয়ে চড়ছে। যেন জটিল ব্যাধির তাপবৃদ্ধি। বেঁহুশ ঘোর। কাগজে কাগজে তার বিস্তৃত বিবরণ। বোম্বাই—বোম্বাই; বিড়লা ভবন, গান্ধী, জহরলাল, প্যাটেল, আজাদ। ঘরোয়া আলোচনা। এলাহাবাদ মিটিংয়ের খসড়া প্রস্তাব প্রকাশ। প্রতিবাদ।

সাতই আগস্টের সকাল। সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে হকার কোন সকালে কাগজ দিয়ে গিয়েছে। গিরিজাপতি মুখহাত ধুতে কলতলায় যাচ্ছিলেন, শুনলেন, নিখিল কাগজ পড়ছে বারান্দায় মোড়ায় বসে। জোরে জোরে, বোধ হয় উমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। হাত দুয়েক দূরে বসে উমা চা তৈরি করছে। নিখিল আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় পড়ছিল। "চরম মুহূর্ত।" 'সংকট মাত্রেরই এমন একটা অবস্থা আছে, যাহাকে উহার চরম মুহূর্ত বলা যায়—যে সময় ঘটনার গতি দিক পরিবর্তন করে—একটা অনিশ্চিত অবস্থা হইতে কোন একটা নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। ...সংকটের এইরূপ চরম সময়েই নেতৃত্বের পরীক্ষা ও প্রমাণ হইয়া থাকে। আসন্ন সংকটে গান্ধী নেতৃত্বের পুনরায় পরীক্ষা হইবে। যে লোকোত্তর শক্তির অপ্রত্যাশিত বিকাশ ভারতবর্ষ একাধিকবার দেখিয়াছে—সেই শক্তি দেশ ও জাতিকে কোনদিকে লইয়া যায়, তাহা দেখিবার জন্য সমগ্র জগৎ স্তব্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছে।... ওয়ার্কিং কমিটির সুদীর্ঘ প্রস্তাব নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়া দেখিতেছি উহার সমগ্র প্রবৃত্তি শান্তির দিকে, সংঘর্ষের দিকে নয়। মীমাংসাই উহার কাম্য, বিরোধ নয়।'

সমগ্র প্রবৃত্তি শান্তির দিকে, সংঘর্ষের দিকে নয়: গিরিজাপতি মুখ ধুতে ধুতে শুনছিলেন।

বিকেলে টাউন হল। রবি ঠাকুরের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। সভায় ভিড়ের মধ্যে অতুলের সঙ্গে দেখা। গিরিজাপতিকে দেখে অবাক। হেতমপুর ছেড়ে কলকাতায় হঠাৎ। কবে? আছেন কোথায়? বউবাজার। যাব একদিন শীঘ্রি। কথা আছে অনেক।

'আজকের দিনটা খুব সিগনিফিক্যাণ্ট—মনে রাখার মতন দিন, গিরিজাদা। গত বছর রবীন্দ্রনাথ এমন দিনে গেছেন—, আর এ-বছর এতক্ষণ বোম্বাইতে দেশের ভাগ্যনির্ণয় চলছে।' অতুল একবার মৃদুস্বরে বলল। গিরিজাপতি মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ—। সাঁইত্রিশ বছর আগের কথা মনে পড়ছিল। ঊনিশশো পাঁচ সাল ; সাতই আগস্ট। এই টাউন হলে আর এক বিরাট আর অপূর্ব সভা হয়েছিল। গিরিজাপতির মনে আছে সে-কথা। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে এতবড় সভা আর কখনো হয় নি। সেই সভায় নরেন সেনের প্রস্তাব—বৃটিশ পণ্য বর্জন। বাঙালীর হাতে বয়কটের জন্ম হল এই টাউন হলে সে-দিন। সাতই আগস্ট। সুরেন বাঁড়ুজ্যের কথাও মনে আছে, বলেছিলেন, শুধু বয়কট নয় স্বদেশীরও জন্ম হল সেই সাতই আগস্ট। একই সঙ্গে। হ্যাঁ, ঠিক কথা, সে-দিনই জন্মেছিল বাঙলা আর বাঙালীর যমজ সন্তান। লব কুশ।

সভায় বক্তারা বিশ্বকবি, আমাদের কবি, গুরুদেব গুরুদেব করে কবিতা আওড়ে, শ্লোক মিশিয়ে কত কথা বলে গেল। গিরিজাপতির ভাল লাগছিল না। 'স্বদেশী সমাজে'র সেই বিরল পুরুষটিকে বার বার আজ মনে পড়ছিল গিরিজাপতির। স্বদেশ সাধক এই ঋষির কথা আজকের মানুষ ভুলে গেছে। এখন রবি ঠাকুর শুধু কবি। এদের কাছে। শুধু যেন শান্তিনিকেতনের। তার বেশি কিছু নয়। গিরিজাপতিদের কাছে রবি ঠাকুর অন্য রকম ছিলেন। কবি নয় শুধু, কর্মময় পুরুষও। সে-কালের বাঙালী এই পুরুষটির চিন্তার, ব্যক্তিত্বের এবং উপদেশের সান্নিধ্য পেয়েছে যত ঘনিষ্ঠ ভাবে, এ কালের মানুষ তত পায় নি। সে-কাল তাঁকে পরমাত্মীয় ভেবেছে, আঘাতও করেছে। এ-কাল তাঁকে আত্মীয় নয় অতিথির সৌজন্য আর সুবিপুল শ্রদ্ধা দিয়েই নিশ্চিন্ত।

সভা ভাঙল। ভিড় ঠেলে রাস্তায় নামলেন গিরিজাপতি। অতুল তাঁর পাশে। পথ হাঁটতে হাঁটতে অতুল বললেন হঠাৎ, 'কিছু আঁচ করতে পারেন গিরিজাদা? কিছু হবে-টবে?'

'আঁচ?' গিরিজাপতি অতুলের মুখের দিকে একবার তাকালেন।

তারপর আবার সোজা চোখে তাকিয়ে পথ হাঁটতে লাগলেন। হাতের লাঠি বুঝি পাশের পোস্টে লেগে ঠুং করে এক শব্দ হল। আরও ক' পা এগিয়ে এসে গিরিজাপতি খুব মৃদু স্বরে বললেন, 'আগুন যদি জোর হয় আঁচ খানিকটা লাগবে বৈকি।'

আরও খানিকটা পথ এগিয়ে এসে অতুল বিদায় নিল। যাবার আগে জানিয়ে গেল, দু' চার দিনের মধ্যেই সে আসছে বউবাজারের বাড়িতে। তখন কথাবার্তা হবে।

কিসের কথাবার্তা কে জানে! গিরিজাপতি বুঝতে পারলেন না; অনুমান করবারও চেষ্টা করলেন না। অন্যমনস্ক মনে হেঁটে চললেন। সন্ধ্যে হয়ে এল। আকাশে বেশ মেঘ জমেছে। বৃষ্টি আসতে পারে। ঠুলি আঁটা বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে রাস্তার। এ-আলোয় পথ চোখে পড়ে না, ঠাওর হয় কোনমতে হাত কয়েক দূরের জিনিস। ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে। হয়ত কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি নেমে গেছে। ফুটপাতের এদিকটায় তেমন ভিড় নেই। সামনে দুটি ছোকরা গলা ধরাধরি করে ধীরে পায়ে হেঁটে চলেছে; একটা ট্রাম আসছে সামনে থেকে। ভুতুড়ে চেহারা। রিকশা চলেছে ঠুংঠুং। আকাশ যেন আরও কালো করে এল। রাস্তার ধুলো উড়িয়ে ট্যাক্সি চলে গেল একটা। গিরিজাপতি অন্যমনস্ক চোখে কিছু দেখছিলেন, কিছু বা চোখে পড়ছিল না।

বড় রাস্তা দিয়ে একটু জোর-পায়ে হাঁটতে লাগলেন গিরিজাপতি। বৃষ্টি এসে পড়লে ভিজতে হবে। কোথায় যেন রেডিয়ো খুলে দিয়েছে। উচ্চগ্রাম এক কণ্ঠ ভেসে আসছিল। থিয়েটার করছে বোধ হয়। কিংবা বক্তৃতা। খবর পড়ার গলা এ নয়। সময়ও হয়নি এখনও।

সুভাষবাবুদের কথা অনেকদিন শোনা হয়নি। কলকাতায় এসে পর্যন্ত। বাইরের রেডিয়োতে কি বলছে আজকাল কে জানে। বেশ বলে। খুব আবেগ দিয়ে। রক্ত গরম করে তুলতে পারে বটে। অতুল বোধ হয় এখনও শোনে। ভীষণ ধৈর্য তার। শুধু তারই বা কেন, অনেকের। বোধ হয় বেশির ভাগ বাঙালীরই।

গিরিজাপতি বড় রাস্তা ছেড়ে এবার সামনের চওড়া গলিতে ঢুকে পড়লেন। কুলপিমালাইওআলা হাঁক দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে। গিরিজাপতির চেনা স্বর। এই লোকটা এ-গলি ও-গলি ঘুরতে ঘুরতে ফটিক দে লেনেও পা বাড়াবে। গিরিজাপতি জানেন। প্রায়ই সন্ধ্যের ওর গলার স্বর শুনতে পান ঘরে বসে। গিরিজাপতি বুঝতে পারেন না, আধ ফাঁকা এই পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে লোকটার ব্যবসা চলে কি করে। নিশ্চয় চলে, নয়ত পড়ে থাকবে কেন?

বাড়িতে পা দিতেই কানে গেল, নিখিল রবি ঠাকুর আওড়ে উমাকে শোনাচ্ছে। 'ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা…।'

গিরিজাপতির পায়ের শব্দে চুপ করে গেল নিখিল। গিরিজাপতি মনে মনে হাসলেন। নিখিলের মাঝে মাঝে বেশ একটা উত্তেজনার ভাব আসে। এবং তার সবটুকু নির্বিকারে উমাকে সহ্য করতে হয়। আজকে কোথায় যে আগুন লেগেছে তা অবশ্য জানা যাচ্ছে না, তবে অনুমান করা যায়।

জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে হঠাৎ কি হল, একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন গিরিজাপতি। মনে হল, অনেকক্ষণ—সেই টাউন হল থেকে বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত যে কথাটা মনে এসেও আসছিল না, ভাবনার ঘোলাটে ভাব কাটিয়ে কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছিল না—এতক্ষণে সেটা নিখিলের আগুন লাগার তপ্ত হাওয়ায় হয়ত আপনা থেকেই বেরিয়ে এল; খুলে গেল জানলা। "বিরোধ উঠিবে গর্জি শতফণা ফণী, তুমি মৃদুস্বরে দিয়ো শান্তিমন্ত্র ধ্বনি—স্বার্থ মিথ্যা, সব মিথ্যা—বোলো কানে কানে—আমি শুধু নিত্য সত্য তোর মাঝখানে।'

গিরিজাপতি তাঁর খাতার পাতায় সে-দিন মাত্র এই কটি কথা লিখলেন। নিজের কথা নয়, রবিঠাকুরের কথা। তবু নিজের। এর চেয়ে বেশি কথা, মনের কথা, বলার কথা আর কিছু ছিল না।

শান্তিমন্ত্র! গিরিজাপতি উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকেন। ও-প্রান্তে যজ্ঞকাণ্ড শুরু হল। শেষ হল। শান্তিমন্ত্রের ধ্বনিও থাকল। আবার অশান্তিরও।

একদিকে অহিংসার শঙ্খনাদ, অন্যদিকে সংগ্রামের তূর্য ধ্বনি। অহিংস গণ-আন্দোলনের শঙ্খধ্বনির সঙ্গে মরণপণ সংগ্রামের আহ্বান। একই নদীর দুই স্রোত। অসম্ভব হলেও সত্য। গিরিজাপতি তাঁর খাতায় এই আপাত বিরোধী দুই স্রোতের কথা অল্প কথায় লিখে রাখলেন।

"গান্ধী বলেছেন, কংগ্রেস অহিংস গণ আন্দোলন করবে। অন্যায় অন্যায্য কিছু করবে না, কোন গোপন আন্দোলন নয়, 'ইট ইজ এ সিন।'..."গিরিজাপতি আরও লিখলেন: "কিন্তু অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখছি—কোনো আন্দোলনই বিঘ্নহীন হয় নি। অহিংসার পথ ধরে চলতে গিয়েও কিছু হিংসা এসে গেছে। এবারে দেশের মধ্যে আরও উত্তেজনা, আরও ইংরেজ বিদ্বেষ গান্ধীর এই শেষ সংগ্রাম—উত্তেজিত, বিদ্বেষপূর্ণ জনসমাজকে কোথায় কোন পথে নিয়ে যাবে কে জানে। গান্ধী বার বার বলেছেন, আন্দোলন করে শুধু জেলে গেলেই চলবে না। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। ডু অর ডাই। কথাটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে। ঘরে বসে আন্দোলন যখন হবার নয়—অন্তত তেমন আন্দোলনের ছক গান্ধীর কল্পনায় নেই—তখন আন্দোলন করতে নেমে জেলে যাওয়া ছাড়া পথ কি! বুলেট বেয়নেটের ঘায়ে মরলেই কি আন্দোলন সফল হবে! জানি না দেশের কোটি কোটি মানুষ কলাগাছের মতন মুখ বুজে মরতে শিখেছে কি না। মনে হয় না শিখেছে। মাস খানেক আগেও ঢাকায় হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা করেছে। মুখ বুজে কেউ মার খায় নি। রোগের মার মুখ বুজে মানুষকে সহ্য করতে হয়, লাঠি বুলেটের মার সহ্য করা সাধ্যাতীত। দু' একজন পারতে পারে—নিরানব্বই জন পারে না। না পারার ফল কি? আরও আক্রোশ, আরও ঘৃণা, আরও উত্তেজনা। তারপর শক্তিমানের বিরুদ্ধে দুর্বলের প্রতিহিংসা নেবার যে একটি মাত্র পথ থাকে—সেই গোপনচারী হিংসার আশ্রয় নেওয়া, খানিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। কংগ্রেস নেতারা সন্ত্রাস চান না, স্বাধীনতা চান, খবরের কাগজের ভাষায়, 'ইহার প্রবৃত্তি শান্তির দিকে, সংঘর্ষের দিকে নয়'।"

সেদিন ঘুম ভাঙতেই খবরটা দিল নিখিল। হাতে তার সকালের টাটকা

কাগজ। শান্ত ধীর স্থির লাজুক স্বভাব ছেড়ে—কেমন করে যেন বদলে গেছে। চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছিল প্রচণ্ড জ্বর আসার আগে সমস্ত শক্তি দিয়ে যুঝছে। রোগা লম্বা ফরসা মতন মুখখানা আগুনের আঁচ লেগে যেন টকটক করছে। চোখের দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর এক বিহ্বলতা। মুখের ওপর কেমন এক ভয়ের এবং উত্তেজনার ছায়া জড়ানো। কপালের ওপর এলোমেলো কিছু চুল। চশমাটা সামান্য এঁকে বেঁকে গেছে। ভেতরে ভেতরে যে নিখিল কাঁপছিল সেটা অনুমান করা যায়।

'মহাত্মা গান্ধীকে অ্যারেস্ট করেছে ওরা, জানেন—।' নিখিল কথাটা এমনভাবে বলল যেন এর চেয়ে বিস্ময়ের, ব্যাকুলতার দুঃসংবাদ এ-জগতে আর কিছু হতে পারে না।

গিরিজাপতিও চমকে উঠলেন। নিখিলের দিকে তাকালেন সরাসরি। বিশ্বাস করতে বাধছিল না—তবু যেন অবিশ্বাস করার মতন জোর খুঁজছিলেন। অকারণেই।

'জহরলাল, আজাদ, ওয়ার্কিং কমিটির সবাইকে।' নিখিল হাতের কাগজখানা এগিয়ে দিল। ওর হাত কাঁপছিল।

গিরিজাপতির মুখে একটিও কথা নেই। নিখিলের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। অসংখ্য নিখিলের জটিল অস্পষ্ট একটা ছবি তাঁর মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। আর তাদের কলরব, ক্ষিপ্ততা।

'খবরটা খারাপ।' গিরিজাপতি ভাইপোর দিকে একইভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কিন্তু এটাই স্বাভাবিক। তুই কি ভেবেছিলি ইংরেজ এর পরও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে?'

নিখিল সে-রকমই ভেবেছিল। এত বড় দুঃসাহস গভর্নমেণ্টের হবে এ-সময়, বিশ্বাস করে নি সে। বিড় বিড় করে বললে নিখিল, 'সিচ্যুয়েশন খুবই খারাপ হয়ে গেল। সমস্ত দেশ ক্ষেপে উঠবে।'

কথা বললেন না গিরিজাপতি। অবস্থা যে আরও জটিল এবং খারাপ হয়ে গেল তা ঠিকই। এ-রকম যে হবে গিরিজাপতি তা সন্দেহ করেছিলেন আগেই। নেতাদের কথা থেকেই তা প্রকাশ পেত। তাঁরা জানতেন এমন

দিন আসবে যখন জনসাধারণের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে না : এ-কথা তাঁরা বলেছেন, সাধারণকে সাবধান করে দিয়েছেন। তবে হয়ত বোম্বাইয়ের সভা শেষ হতে না হতেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হবে— এটা তাঁরাও অনুমান করেন নি। আর আন্দোলন ত এখনও বাস্তবিক শুরু হয়নি। বড়লাটকে চিঠি লিখে হপ্তা দু-তিন জবাবের জন্তে অপেক্ষা করার কথা ছিল গান্ধীর। সে চিঠি আর লেখা হল না। গিরিজাপতিরও ধারণা ছিল—আন্দোলন শুরু হলে গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়বে। একটু ভুল হল। হ্যাঁ, তা হল। অবশ্য গিরিজাপতির ভুল সাধারণ একটি মানুষের ব্যক্তিগত ভুল। তার সঙ্গে আর কারও সম্পর্ক নেই। কিন্তু নেতারা যে সাংঘাতিক ভুল করে বসলেন। আন্দোলন করতে বললেন—অথচ আন্দোলনের ধরনটা স্পষ্ট করে কিছু বলে গেলেন না। অনেকটা তেমনি—নির্দেশটাই বহাল থেকে গেল, কর্মসূচী থাকল না, কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নয়। দিশেহারা, বিহ্বল অবস্থার মধ্যে পড়ে থাকল দেশ। এখন কি হবে? কি করবে তারা? থেমে থাকবে না এগিয়ে যাবে?

দেখতে দেখতে এক ঝড় উঠল। দুঃসাহসী, দুরন্ত ঝড়। রূপটা তার ভয়ঙ্কর, হিংস্র, উন্মত্ত। গিরিজাপতি স্তব্ধ হয়ে এই ঝড় দেখতে লাগলেন। এ-রকম এক দুর্যোগের আশঙ্কা তাঁর না ছিল এমন নয়, কিন্তু এতটা যেন তিনি আশা করেন নি।

ক'দিন আর কিছু লিখতে পারলেন না গিরিজাপতি। কি লিখবেন? সকালে খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে একপাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে দেন। সব কটা শহর অবশ্য তাঁর দেখা নেই, কিছু কিছু আছে। তবু কল্পনায় সেই শহর আর রাস্তা, বিক্ষুব্ধ মানুষ, তাদের উত্তেজিত কোলাহল, চিৎকার, মিছিল— চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অজ্ঞ মানুষ, নির্বোধ ছাত্র আরো রুগীর মতন বিকারগ্রস্ত একদল নিরস্ত্র পথচারী এগিয়ে চলেছে। আচমকা পথ বন্ধ হয়ে যায়। টিয়ারগ্যাস ফাটে, লাঠি চলে। তারপর গুলি। গিরিজাপতির কাছে

এখানকার বৃক্ষ বহু পুরাতন। হয়ত আরও বীভৎস কিছু দৃশ্যও এরা দেখে আছে।

গিরিজাপতি ভাবেন, গান্ধী মরতে বলেছিলেন—এরা মরছে। কিন্তু এই মৃত্যুই কি তিনি চেয়েছিলেন? পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষ কি এই ভাবে মরতে পারছে। অসম্ভব। এক কোটি বা এক লক্ষ মানুষও যদি পুলিসের গুলির কাছে বুক পেতে দিতে পারত। পারলে জানতাম, এই নারকীয় হত্যালীলার হাত ধরে স্বাধীনতা আসবে। না এসে পারবে না। হিংসার পাথর-গড়া কপাটও ফাঁক হয়ে যাবে। কিন্তু তাও পারছে না। যারা মরেছে, যারা মরছে—তারাও কি সব অহিংস? না।

স্বাধীনতার জন্যে পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষ প্রাণ দিচ্ছে না, স্বাধীনতার জন্যে এক কোটি মানুষও অহিংস নয়। না আত্মিক না নৈতিক—কোনোদিক থেকেই আমরা এ-সংগ্রামে গান্ধী-পন্থী নই। তবে—?

পাঁচ

সেব দিচ্ছি করেও হাত দিতে পারছিল না সুধা। পুরনো ব্লাউজের মাপে মাপ মিলিয়ে নতুন ছিট কাটা হয়ে গিয়েছিল, সেলাইয়ের বেলায় আর হাত উঠছিল না। ঘরে মেশিন নেই যে ঝর ঝর করে কল চালিয়ে সেলাইটা শেষ করে ফেলবে। হাতে সেলাই তুলতে বড় সময় যায়, ধৈর্য থাকতে চায় না। তার ওপর চোখও আজকাল একটুতেই কর কর করে ওঠে, জল কাটে। একটানা বেশিক্ষণ চোখে লাগে এমন কিছু আর করতে পারে না সুধা। এটা সে লক্ষ্য করেছে। টানা কি একটু বেশি কাজ পড়লে অফিসেই মাথা ধরে যায়। ঘাড় আর কপালের শিরা যেন ছিঁড়ে পড়তে চায়। অমলাদি বলে, চশমা নিয়ে নে, তোর চোখ খারাপ হয়েছে সুধা।

হয়ত তাই ; চোখ খারাপই হয়েছে সুধার। কিন্তু নে বললেই কি নেওয়া যায়। চশমা নিতে অনেক খরচ, ডাক্তারকে দিয়ে চোখ দেখাও আগে, তার পর না চশমা। তার খরচও কিছু কম নয়। অমলাদি বলেছিল, পয়সা খরচ করে চোখ দেখাবি কেন, বাড়ির গোড়ায় মেডিকেল কলেজ, বিনি খরচায় চোখ দেখিয়ে আয়। চশমাতে তোর টাকা কুড়ি পড়বে ধরে নে।

কুড়ি টাকা! এ-সংসারে কুড়ি টাকা যে কত অমলাদি যে তা না জানে এমন নয়। তবু ত এমন কিছু হয় নি সুধার যে, চোখে মানুষ, পথ অফিসের খাতা পত্তর কিছু ঠাওর করতে পারছে না। তেমন অন্ধ হয়ে পড়লেও, কুড়িটা টাকা হট করে খরচ করতে পারত না সুধা। না, পারত না, সে ক্ষমতাই তাদের নেই।

চশমা ত শখের ব্যাপার, থাক না থাক, কেউ দেখতে আসছে না, নিজেরও এই মুহূর্তে সাংঘাতিক একটা অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু শাড়ি গায়ের জামা? গায়ের জামা বলতে একেবারেই আর কিছু নেই সুধার। ছেঁড়া

পেঁজা সেলাই খোলা, সব মিলিয়ে খান চারেক ঠেকেছিল। ভেতর-জামারও সেই অবস্থা। বর্ষার দিনে আর চলছিল না। রোজই একটু একটু ভিজতে হয়। তা ছাড়া গায়ের জামা, দিনান্তে একবার অন্তত জলকাচা না করলে নয়। অথচ একবার ভিজল ত যা ঘিনঘিনে বর্ষা সহজে শুকোবার নামটি নেই। স্যাঁতসেঁতে জামা-ই গায় দাও। শাড়ি খটখটে করে না শুকোলেও তবু চলে, সুধাদের অন্তত তেমন আর অসুবিধে হয় না, পাড় কি এখান ওখান একটু ভিজে ভিজে থাকলেও যায় আসে না কিছু। জামার বেলায় এতটা আর সয় না। সর্দির ধাত তার। সারা বর্ষা আর শীত হাঁচি, গলা খুসখুস, জ্বালা, সর্দি কাশি লেগেই আছে। এই বর্ষায় ভিজে-জামায় সর্দিটা সহজেই বসে, ছাড়তে আর চায় না। গলা বুক টাটিয়ে থাকে, চোখ জ্বালা, মাথা টিপ টিপ।

এমন অবস্থার মধ্যেও হুট করে গায়ের জামার জন্যে দু-পাঁচটা টাকা খরচ করতে পারে নি সুধা। একা নিজের জন্যে একটা ব্লাউজ করে নেওয়া হয়ত সম্ভব ছিল। কিন্তু মারও ত সেই অবস্থা, আরতিরও। রত্নময়ী অবশ্য বার বার বলেছেন, তোরটা তুই আগে করে নে!; আমরা ত অফিস আদালত করতে যাচ্ছি না। আর আমার বাপু জামার দরকারটাই বা কি! জামা আমি পরি কতটুকু।

এবার মাইনে পাবার পরও—কিনি না-কিনি করে ক'দিন গেছে। হয়ত শেষ পর্যন্ত ওই দোনামোনা ভাবেই কাটত, যদি না—অফিসের নতুন স্কেলের মাইনের হিসেব পত্রের আঁকজোঁক থেকে এগারো টাকা সাত আনা আচমকা সেদিন তার হাতে না এসে পড়ত। টাকাটা পেয়ে—এবার সুধা কেমন একটা ঝোঁকের বশেই প্রায় সাত টাকার সওদা করে বসল। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে, সে-দিনই। তিন গজ সাধারণ চলনসই ব্লাউজের ছিট, আর দু'গজ মার্কিন কাপড় ভেতর-জামার জন্যে। তার আর আরতির উপস্থিত এতেই হবে। ওর দুটো করে, আরতির একটা করে, মার জন্যে একগজ একটু পাতলা লংক্লথ ছিল।

ছিট, মার্কিন কাপড় এল। কাটছি, কাটি করে মাপ মতন কাটাও হল।

সেলাইয়ে হাত দিয়ে আর কাজ এগুচ্ছিল না। সন্ধ্যে বেলায় টিম টিমে আলোয় বসে বসে সেলাই করতে চোখে লাগত, কেমন এক ক্লান্তিও যেন সুধাকে চেপে ধরত। ইচ্ছে থাকলেও যেন ক্ষমতায় কুলোচ্ছিল না।

আরতি তারটা ইতিমধ্যে শেষ করে ফেলেছে। দিদিটারও সে করতে চেয়েছিল, সুধা রাজী হয় নি। হ্যাঁ, তোর যা হাতের সেলাই, আজ করবি, কাল খুলে যাবে। আমার পয়সাটাই নষ্ট। তবু, ভেতর-জামার দু'টোই একরকম আরতি সেলাই করে দিয়েছে।

রত্নময়ী সাহস করে মুখে বলেন নি; তাঁর হাতের সেলাই কে জানে মেয়ের পছন্দ হয় কি না—তবু দুপুরে বসে বসে, আরতিকে দিয়ে পরখ করিয়ে নিয়ে একটা ব্লাউজের অর্ধেকটা তিনি সেলাই সেরে রেখেছিলেন।

আজ সন্ধ্যের পর সুধা সেটা নিয়েই বসেছিল। কিছুটা প্রয়োজনে, কিছুটা বা হয়ত লজ্জায়। 'বেশ ত সেলাই করেছ, মা। আর একটু ঘন রাখলে পারতে—মোটা কাপড়, সুতো সরত না।' সুধা বলল, একটু খুশী—একটু হাসি মুখ করে।

রত্নময়ীর রান্নার পাট এখনও চোকে নি। কটা রুটি সেঁকার আছে। বড়ির তরকারি নামিয়ে, আঁচ-নেমে-যাওয়া উনুনে কিছু কয়লার গুঁড়ো ছড়িয়ে ঘরে এসেছিলেন এক কুচি পান সেজে নিতে। তক্তপোশটার ওপর পা মুড়ে বসে সুধা সেলাই করছিল।

পানের ছোট ডাবর টেনে পান সাজতে বসলেন রত্নময়ী। বললেন, 'তোমার, মা, যা আজকাল খুঁতখুঁতুনি, ভয়ে ভয়ে করেছি।' মুখ তুললেন রত্নময়ী, মেয়ের দিকে, বেশ সহজ ভাব মুখের, সন্তুষ্ট হয়েছেন যেন মেয়ের প্রশংসা শুনে, এবং হালকা, উদ্দেশ্যহীন একটা খোঁচাও দিলেন, পরিহাস ছাড়া আর যা কিছুই নয়: 'সেলাই ফোঁড় আমরাও একটু আধটু না জানি নয়।'

'আমি কি বলেছি তুমি জানো না!' সুধা দাঁতে সুতো চেপে ধরে মার দিকে চেয়ে হাসল, প্রায় ভুরুর কোলে চোখ ঠেকিয়ে। সুতো কেটে, ব্লাউজের ডান হাতটা পরখ করে দেখল প্রথমে, তারপর বুক থেকে শাড়ি

গলিয়ে আধ-তৈরি ব্লাউজের হাতায় হাত গলাল। খুঁটিয়ে দেখলে একটু ঢিলেই হয়েছে, কি বলো? জলে পড়লে আবার ত একটু টানবে।'

সাজা পান হাতে করে মেয়ের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকলেন রত্নময়ী। ছিটটা দেখতে বেশ; কালো কালো ফোঁটাগুলো খুব জ্বল জ্বলে। সুধার ফরসা রঙের সঙ্গে বেশ মানিয়েছে ব্লাউজটা।

গা থেকে জামা খুলে পাশে রাখল সুধা। অন্য হাতাটার মাঝখানটা আগে সেলাই করে নিতে হবে। তারপর জোড়। সুতো ফুরিয়েছিল ছুঁচের। নতুন করে সুতো পরাতে বসে আচমকা একটা দমকা কাশি এল সুধার। বেশ দীর্ঘস্থায়ী; থেমেও যেন থামতে চায় না।

'তোকে যা বলছি, তাই করত ক'দিন।' রত্নময়ী মেয়ের মুখের দিকে দুর্ভাবনার দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন, কাশির দমকে সুধার মুখ খুব পরিশ্রান্ত এবং ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। 'মিছরির সঙ্গে আদা গোলমরিচ ফুটিয়ে দি—ক'দিন খা; শ্লেষ্মা যাবে।'

'সর্দি কাশির ভাবটা আমার কেমন যেন বেড়েই চলেছে মা।' সুধা মনমরা গলায় বলল, 'বুকে আজকাল বেশ হাঁপ ধরে। তোমার মতন আমারও বোধ হয় হাঁপানি ধরে গেছে।'

'থাক, মা, অত শখ করে আর রোগ ডাকতে হবে না।' রত্নময়ী উঠে পড়লেন। পানটা মুখে দিয়েছিলেন আগেই, এবার একটু দোক্তা গালে দিলেন। 'এই বয়সে আবার হাঁপানি কিরে, আমার মতন বয়স হোক—তখন বলিস।'

'রোগের আবার বয়েস থাকে নাকি।' সুধা সেলাইটা আবার হাতে তুলে নিয়ে বলল, বিষণ্ণ অথচ হতাশ একটু হাসি মুখে, 'আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোক—একেবারেই ছেলেমানুষ—পেটের কি একটা বিদঘুটে রোগে হাসপাতালে পড়ে আছে। শুনি, অবস্থা নাকি খুবই খারাপ।'

অফিসের কথায় বুঝি হঠাৎ খেয়াল হল রত্নময়ীর। একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। 'তোর একটা চিঠি এসেছে।'

'চিঠি?' সুধা মার মুখের দিকে চাইল।

"আরতি হাতে করে দিয়েছিল। ও-ই কোথায় রেখেছে।" রত্নময়ী মেয়ের মুখের দিকে না তাকিয়ে জানলার ওপর চোখ রেখে বললেন। তারপর উঠে পড়লেন।

রত্নময়ী জানতেন চিঠিটা কার। কোথায় আছে তাও তাঁর একেবারে অজানা ছিল না। তবু সুচারুর চিঠি নিজে হাতে করে সুধাকে এগিয়ে দিতে, এমন কি মুখে বলতেও তাঁর বাধছিল। কি রকম যেন এক সংকোচ বোধ করছিলেন।

সুধারও এক মুহূর্ত দেরি হল না বুঝতে। কুড়ি বছরের জীবনে, তার নামে আজ পর্যন্ত একটি মাত্র চিঠি এসেছে। সে-চিঠি সুচারুর। যথাস্থানে পৌছে একটা চিঠি দিয়েছিল সুচারু—সে প্রায় মাসখানেকের বেশি হল। আর দ্বিতীয় চিঠি এল আজ।

হাতের সেলাই বন্ধ করে সুধা একবার দরজার দিকে তাকাল। অযথাই। রত্নময়ীর এতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। তবু, কি আশ্চর্য, একটু না চেয়ে সুধা পারল না।

তক্তপোশ ছেড়ে উঠল সুধা। খুব আলগা পায়ে। কোথায় রেখেছে আরতি চিঠিটা? দেওয়ালে ঝুলোনো থাকটার কাছেই এগিয়ে এসে দাঁড়াল সুধা। চিরুনি, ফিতে, কাঁটা, পকেট পঞ্জিকা, পাউডারের কৌটো, টুকিটাকি কত কি যে থাকে এখানে। সুধা মুখ বাড়িয়ে দেখছিল। চিঠিটা দেখতে পাচ্ছিল না। হাত দিয়ে এটা সেটা নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল এবার। তাকের ওপর ভাঁজ করে পাতা কাগজের তলাও হাতড়াল। কোথায় চিঠি?

আরতির ওপর রাগ হচ্ছিল সুধার। এবং অধৈর্য হয়ে উঠছিল ও ক্রমশই। মুখপুড়ি মেয়ের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। কে তোকে এমন করে চিঠি রাখতে বলেছিল, সারা ঘর হাতড়েও খুঁজে পাওয়া যায় না। ওর সমস্ত কাজকর্মই এমন বিদঘুটে।

সুধা এদিক ওদিক আরও ক'টা জিনিস হাতড়াল, মার কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আরতির তেল চিটচিটে এমএরশভারির খাতাটা পর্যন্ত। না, কোথাও নেই।

আর এই আরতি, সুধা লক্ষ্য করে দেখছে, আজকাল চব্বিশঘণ্টাই

নীচে। সন্ধ্যে বেলার ত ওর পাত্তাই পাওয়া যায় না। কোনো রকমে সন্ধ্যেটা দিয়ে, যার টুকটাক কিছু করবার থাকল ত করল—তাড়াতাড়ি সারল, তারপর সেই যে মেয়ে একতলায় নেমে গেল—হাঁকাহাঁকি না করলে আর ওপরে ওঠার নাম করে না। এদিকে আবার চালাকি আছে ষোলো আনা। যাবার সময় দু-একখানা পড়ার বই নিয়ে নীচে নেমে যায়। বলে, উমাদির সঙ্গে পড়তে যাচ্ছি। কথাটা মা বিশ্বাস করে। শুধু বিশ্বাস নয়, বরং আস্থাও রাখে খুব। উমা মেয়েটা ভাল, মার কেমন এক সহানুভূতি জন্মে গেছে এর মধ্যেই।

সুধা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, তোরা নিজেরা পড়িস না উমার দাদা পড়ায় তোদের? আরতি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, আমরা নিজেরা পড়ি, নিখিলদাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে দেয়। নিখিলদার অনেক বই আছে, দিদি।

নিখিল যে এম. এ. পড়তে এসেছে—সুধা সে-কথা শুনেছিল। কখনো সখনো নীচে নেমে উমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্যও করেছে—এ-পাশে নখিলের ঘরে তার নড়বড়ে টেবিল চেয়ার বইয়ের সস্তা র্যাকগুলো বই ঠাসা। (ঠেলায় চেপে হাওড়া স্টেশনের মাল-গুদাম থেকে যেদিন এই সব খাট, টেবিল এল—সুধা অবাক হয়েছিল। কোথায় ঢোকাবে এত মালপত্র। সব কিন্তু বেশ গুছিয়ে নিয়েছে উমা।) ছেলেটি যে ভাল, বইপত্র দেখেই সুধার ধারণা হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য, এই ছেলেটির ভীষণ নিরীহ, লাজুক, শান্ত এবং শিষ্ট ভাবটাও সুধার অপছন্দ ছিল না। নীচে দিয়ে যেতে আসতে অনেকবার নিখিলের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেছে; ও মুখ তুলে তাকিয়েছে হয়ত, কিন্তু নিখিল কখনও ঘাড় তুলে তাকাতে পারে নি। সসঙ্কোচে পাশ কিংবা বিব্রত ভঙ্গিতে সরে গিয়েছে সামনে থেকে।

তা সত্ত্বেও চিঠিটা এখন খুঁজে না পেয়ে আরতি এবং ওদের ওপর রাগই হচ্ছিল সুধার। পড়ার নাম করে নীচের তলায় একটা আড্ডা বসছে আজকাল। আরতির মা হলে অত মন লাগে পড়ায়!

এখন কি করা যায়—সুধা ভাবছিল। আরতিকে ডাকবে? মা কি ভাববে তা হলে! আহা, মা কি আর না বুঝেছে কার চিঠি? সুচারুর চিঠির

খামটাও আবার অন্য ধরণের। ভাঁজ করা পাতা। ইংরিজী লেখা পড়তে না জানলেও চেহারা থেকেই সব বোঝা যায়। প্রথম চিঠিটা আসার পরই সবাই ত বুঝতে পেরে গেছে। তাছাড়া, এ ত জানা কথাই, ওদের কাউকে চিঠি লেখার মতন এ-জগতে কেউ ছিল না; বাবা মারা যাবার পর থেকে কোনো চিঠি এ-বাড়িতে ওদের নামে আসে নি। ইদানীং, বাড়িঅলার এক আধটা পোস্টকার্ড আসে। সে চিঠি নয়। সুচারুই একমাত্র মানুষ যে অনেক কাল পরে আবার তাদের ঠিকানায় তাদের কারুর একজনের নামে একটা চিঠি দিয়েছে।

ঘরের দোর-গোড়ায় এসে বাইরে রান্নাঘরের দিকে তাকাল সুধা। উনুনের দিকে মুখ করে মা রুটি সেঁকছে। এক ফোঁটা আলোয় স্পষ্ট করে কিছু চোখে পড়ে না। গভীর এবং স্থূল ছায়ার মতন মনে হয়।

কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ সুধা অন্যমনস্ক ভাবে সে-দিকে তাকিয়ে থাকল। বারান্দা আর ফাঁকা উঠোনের অন্ধকার তার দৃষ্টি এবং মনকে একটু একটু করে আচ্ছন্ন করছিল। যেন গাঢ় এক অন্ধকার আস্তে আস্তে উঠে আসছে, এবং সুধার দৃষ্টিপাত থেকে রত্নময়ীকে একটু একটু করে আড়াল করে ফেলছে।

এখন আস্তে করে উঠোন দিয়ে সিঁড়ির কাছে চলে যাওয়া যায়। সিঁড়ি ভেঙে নীচে। আরতিকে শুধিয়ে আসতে পারে সুধা, চিঠিটা কোথায় রেখেছিস?

এটা না পারার মতন কিছু নয়। কিন্তু কে বলবে, সুধার নীচে নেমে যাওয়া এবং ফিরে আসবার মধ্যে মা এ-ঘরে এসে পড়বে না। আসতেও পারে মা।

এলেই বা কি! সুধা মার ওপর অকারণেই খানিকটা বিরক্ত হল। দরজার এ-পাশের কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। নীচে থেকে আজকের কাগজটা নিয়ে এলুম—সুধা নীচে থেকে ফিরে এসে যদি ঘরে মাকে দেখতে পায়—তবে কি বলবে,—এখনই ঠিক করে নিয়ে মনে মনে বলল। যদিও সুধা জানে, মা কিছু জানতে চাইবে না; ব্যাপারটা বুঝলেও হাবেভাবে কোথাও তা প্রকাশ করবে না।

পা বাড়াবার জন্যে তৈরি হয়েও সুধা পা বাড়াতে পারছিল না। [illegible]
এক দ্বিধা এবং সংকোচে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। [illegible], [illegible] অথচ অসংকোচ
আত্মহারা নয়।

তুমি এ-বাড়ির ঠিকানায় আমায় আর চিঠি দিয়ো না ; অফিসের ঠিকানায়
দিয়ো, সেই ভাল : সুধা ভাবল, সুচারুকে এবারে এ-কথাটা সে লিখে দেবে।
কেন যে বাড়ির ঠিকানায় সুচারুকে চিঠি দিতে বারণ করছে তার কোনো
কারণ দেখানোর কি দরকার হবে? কিছু না। সুচারু বুঝতে পারবে।
পারবে না? খুব পারবে, না বোঝার কি আছে?

সুধা দরজা ছেড়ে সরে যাবার আগে আর একবার মার দিকে তাকাল।
উঠোনের অন্ধকার, এবার, তার আর মার মাঝখানে অনেক যেন ঘন হয়ে
গেছে। দু'জনের মধ্যে বেশ খানিকটা দূর দূর ভাব। সুধার হঠাৎ মনে হল,
দূর নয় শুধু—মা যেন ভীষণ ভারি এবং বিরাট এক পাথরের মতন রাস্তার
মাঝখানে প্রায় সবটুকু পথ জুড়ে পড়ে আছে।

দোরগোড়া থেকে ফিরে আবার একবার দেওয়াল-থাকের কাছে গিয়ে
দাঁড়াল সুধা। কি রাখাই রেখেছে মেয়ে—! আরতির ওপর একটু-নিস্তেজ-
হওয়া রাগ আর বিরক্তি আবার গনগনে হয়ে উঠল। পড়ার নাম করে আড্ডা
মারতে যাওয়া তোমার আমি ঘুচোচ্ছি দাঁড়াও। নচ্ছার মেয়ে কোথাকার!

আরতির টিপ, ফিতে, ক্লিপ রাখা কাগজের চৌকো বাক্সটা খুলেছিল সুধা,
যদি তার মধ্যে চিঠিটা রেখে থাকে—দেখবার জন্যে, না পেয়ে এবার তাকের
একপাশে খোলা অবস্থাতেই ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর তক্তপোশে গিয়ে
বসে পড়ল।

ব্লাউজটা সেলাইয়ের আর কোনো আগ্রহ বোধ করছিল না সুধা। নিছক
সময় কাটানোর জন্যে হাতে তুলে নিল।

না, সুচারুকে বাস্তবিকই এবার লিখে দেবে, অফিসের ঠিকানায় চিঠি
দিতে। আর এও সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিতে হবে, ঠিকানাটা একটু অন্য রকম
করে লিখো, নয়ত অমলাদি ছাড়াও কতকগুলো অসভ্য মানুষ আছে এ-
অফিসে যারা জানতে পারলে মুখ টিপে টিপে হাসবে।

অমলাদির একটা কথা এখন আবার মনে পড়ে গেল সুধার। 'তোর বরাতটাই খারাপ সুধা! কিচ্ছু ঠিক নেই যার—তার ওপর ভবিষ্যতের ভরসা রেখে শেষপর্যন্ত হয়ত ডুববি।' কথাটা শুনতে শুনতে সুধার মুখ যে কত তাড়াতাড়ি ভীষণ এক আশঙ্কায় এবং অমলাদির ওপর বিরাগ আর তিক্ততায় কঠিন অথচ বিশ্রী হয়ে উঠতে পারে ও জানত না। অমলাদির অবশ্য তা লক্ষ্য করতে একটুও যেন সময় লাগল না। সস্নেহে হেসে বলল অমলাদি, 'রাগ করলি? তুই কষ্ট পাস আমি কি তাই চাইবো রে, বোকা! তা নয়, আমি বলছি সংসারেব কথা—; ভালবাসতে বসে হিসেব করা যায় না, জানি; কিন্তু সংসার করার সময় বেহিসেবীপনাও চলে না। যারা করে তারা যে সারা জীবন মাথা খোঁড়ে আর কাঁদে—এ আমি দেখেছি। প্রতিমার কথা তোকে বলেছি না। তেমনি।'

'কি হবে না হবে—সেটা তুমিও জানো না, আমিও জানি না। ভগবান জানেন। আর আমার ভাগ্য। এ-সব কথা তুমি আর বলো না, অমলাদি।' সুধা খুব চাপা থর থর গলায় জবাব দিয়েছিল। সে-স্বর নিজের কানেই কেমন বুক মন সমস্ত ডুবানো বিষণ্ণ অথচ সুন্দর লেগেছিল সুধার।

এ-সব কথা আজ, এখন, আবার একবার মনে পড়ার পর সুধা অনুভব করল, সুচারুর সঙ্গে তার মনের সম্পর্কটা সে খুব 'শুদ্ধ' আর গভীর বলেই মনে করে। শুদ্ধ? শব্দটা কি আশ্চর্য ভাবে আপনা থেকেই যুগিয়ে গেল হঠাৎ, এখন। আগে কত ভেবেও ঠিক এ-শব্দটা—মনে আসে নি—যদিও ঠিক এই রকম অনুভূতি এবং একাত্মতা সে বোধ করেছে, করে—যখন সুচারুর কথা ভাবে, ভালবাসার কথা।

সুধা সুন্দর এক হৃদয়াবেগ অনুভব করছিল, শান্ত শিষ্ট ও শোভন মানসিক তৃপ্তি। পবিত্রতার বোধ অন্তরসঞ্চারী হচ্ছিল, যেন এক ধরণের আর্দ্রতায় তার আত্মা সিক্ত ও কোমল হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে 'শুদ্ধ' শব্দটা পরিমার্জন করে নিল সুধা। কিছু বলল না, তবু মনে মনে জানল, ভালবাসা পবিত্র। তার কাছে এর চেয়ে পবিত্র আর কিছু নেই। আর, এর সবটুকু—সুখদুঃখ লাভ ক্ষতি—সবই সে নিজের মধ্যে আর সকলের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে

রাখতে চায়। কৃপণের মতন লুকিয়ে, সংসারের কৌতূহল কি ঔৎসুক্য থেকে এর মর্যাদাকে রক্ষা করে।

নিঃসঙ্গ অথচ অসাধারণ কোনো ঐশ্বর্যের আবিষ্কারে আত্মমগ্ন সুধা এখন, এই আধো অন্ধকার ঘরের রুক্ষতা, মালিন্য, পরিচিত পরিবেশ থেকে যোগসূত্র ছিন্ন করে অন্য কোথাও চলে আসতে পেরেছিল। যেখানে একাকীত্ব নক্ষত্রের মতন সুন্দর আর স্বয়ংপূর্ণ।

সুধা চমকে উঠল। উঠোনে কিসের একটা শব্দ হল। জোরে যেন কেউ পড়ে গেছে।

দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল ক'পলক সুধা; তারপর উঠে পড়ল। দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াবার আগেই কানে গেল আরতির গলা। অস্পষ্ট জুড়ানো উত্তেজিত গলায় কি যেন বলছে।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, রান্নাঘরের চৌকাটের ওপাশে আরতি বেঁকা, প্রায় পিঠ-কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে। একপাশে হেলে পড়ে, পায়ের ওপর কাপড় তুলে কি যেন দেখছে, আর হাত বুলোচ্ছে কোমরের তলায়। মাকে হাঁসফাঁস করে কি বলছে।

আরতিই পড়েছে তা হলে। সিঁড়ি দিয়ে ছুটে আসছিল, শেষ সিঁড়িতে ঠোক্কর খেয়ে ছিটকে পড়েছে উঠোনে। ঠিক তাই। ওর হাঁটা-ফেরার ঢঙই এই। হুড়মুড় করে না ছুটলে চলে না। অসভ্য কোথাকার।

বিরক্ত হল সুধা। একটুও শান্তিতে থাকার যো নেই এ-বাড়িতে। একটা না একটা কিছু লেগেই আছে সারাদিন। সব সময়।

আরতি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এবার এদিকেই এগিয়ে এল।

'হাত পা একটা কিছু ভেঙেছে, না আস্ত আছে—?' সুধা ধমকের গলায় বলল আরতি সামনে এলে।

মাথা নাড়ল আরতি। না, ভাঙে নি। ডান হাতের কনুইটা দেখতে দেখতে বলল, 'পাড়ের ছেঁড়াটার সঙ্গে আঙুল আটকে গিয়েছিল।'

'পায়ের দিকে ছেঁড়াটা দাও কেন, ওটা কোমরে দিতে পার না।'

'ওপরের দিকে আরও—' আরতি ডান পা ঝাড়া দিল আস্তে করে। পেছনটায় বেশ লেগেছে।

আরতি কি বলেছে বা বলল তাতে তার খেয়াল নেই। শেষ কথাটা কিন্তু সুধার কানে গেল। আর কথাটা তার খারাপই লাগল। বোনের দিকে চেয়ে থাকল সুধা একটু। 'বাড়িতে ছুঁচ সুতো নেই? সেলাই করে নিতে কি হাত ক্ষয়ে যায়? বাদশা বেগমের দল সব আমার।'

এই তিরস্কারেও আরতির কিছু এল গেল না। যেন কানেই যায় নি কথাটা। যে-খবরটা সে দিতে এসেছে সেটা বলল এবার, 'নিখিলদাকে খুন করে ছেড়েছে একেবারে। ইস্। সা-রা গা কাপড় জামা টক টক করছে রক্তে। রিকশায় করে এক্ষুনি একটা লোক দিয়ে গেল। উমাদি কাঁদছে।' আরতির মুখে ভয় এবং বিহ্বলতা।

সুধা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেন ছিটকে এসে পড়ল। বিস্মিত, প্রশ্নার্ত চোখে বোনের দিকে তাকিয়ে থাকল অপলকে। খুন করে ছেড়েছে? কে খুন করল, কেন? কি হয়েছে?

রত্নময়ী হাতের কাজটুকু সেরে ততক্ষণে চলে এসেছেন। ব্যস্ত, ত্রস্ত। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বললেন, 'উমার দাদাটা নাকি রক্তারক্তি হয়ে ফিরেছে। কি সর্বনেশে কাণ্ড বলতো। দেখে আসি!' রত্নময়ীকে শঙ্কিত দেখাচ্ছিল।

রত্নময়ী আগে, আরতি পিছু পিছু চলে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে। সুধা আচমকা ডাকল আরতিকে, 'এই শোন।'

ফিরে এল আরতি। রত্নময়ী ততক্ষণে অন্ধকারে সিঁড়ির মুখে। সুধা শুধোল, 'আমার চিঠিটা কোথায় রেখেছিস?'

'মার বিছানার তোশকের তলায়।' আরতি বলল।

'ঠিক আছে; যা—' সুধা দোর-গোড়া ছেড়ে সরে যাচ্ছিল।

'তুমি নীচে যাবে না দেখতে?' আরতি যেন বেশ অবাক হয়েই শুধোল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সুধা। বোনের দিকে চাইল। 'তোরা যা, আমি সেলাইটা তুলে রেখে আসছি।'

আরতি আর দাঁড়াল না।

একটু দেরি হল সুধার নীচে নেমে আসতে। শেষ সিঁড়িতে পা দিতেই দেখে পড়ল, গিরিজাপতি তাঁর ঘরের সামনে বেতের মোড়ায় চুপ করে বসে আছেন। খুবই যেন অন্যমনস্ক। কোন দিকে তাকিয়ে আছেন, কি ভাবছেন—কিছুই বোঝা যায় না। নিখিলের কথা নিশ্চয়। কিন্তু কই ছটফট ত করছেন না, ব্যগ্র দেখাচ্ছে না ত মোটেই, অস্থির বা চঞ্চল নয় একেবারেই।

তেমনকিছু একটা হয় নি তা হলে—উঠোনের পাশ কাটিয়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে সুধা ভাবল, আরতির ত কথা, তিলকে তাল করে।

নিখিলের ঘরে পা দিয়ে সুধা কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিখিলকে চেনাই যাচ্ছে না। কপাল জুড়ে ব্যণ্ডেজ। তুলো দিয়ে দিয়ে অনেক খানি ফোলানো। ভুরুও ঢাকাও পড়ে গেছে। এক পাশের গালেও তেমনি অবস্থা। তুলো আর প্লাস্টার। মুখ বলে ছেলেটার যেন কিছু আর নেই। যে-টুকু আছে তাও বিরাট এক ফোস্কার মতন ফুলে গেছে। টকটকে ভাব। বাঁ হাতের কব্জি আর তালুতেও মোটা ব্যাণ্ডেজ। একটু কাত হয়ে শুয়ে। আরও যে কোথায় কেটেছে কুটেছে কে জানে!

তবুও হয়ত এতটা শিউরে উঠত না সুধা যদি না চোখে পড়ত নিখিলের ছাড়া কাপড় জামার স্তূপটার দিকে। এতক্ষণ তক্তপোশের পায়ের দিকে স্তূপীকৃত সেই বীভৎসতা পড়ে ছিল—উমা হেঁট হয়ে এবার সেগুলো তুলে নিচ্ছে, কলতলায় রেখে আসার জন্যে। সে-দিকে চোখ পড়তেই সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্যে সুধার বিস্মিত এবং বিহ্বল চোখের পাতা আর পড়ল না। এক মুঠি তুলো টকটকে লাল রঙে ডুবিয়ে নিংড়ে রেখে দিলে যা হয়—এ অনেকটা তেমনি। কত বড় বড় রক্তদাগ আছে, ধুলো আছে রক্তেও কাদাটে ছোপ। উমার হাতের পাশ থেকে শার্টের একটা ছেঁড়া হাতা ঝুলছিল, কাপড়েরও খানিকটা ছ

শুকনো রক্তের দাগ যেন আরও বিশ্রী আরও বীভৎস। উমারও যে শরীর কেমন [illegible] বুঝতে পারল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি এই রক্তলাগা কাপড় চোপড়গুলো সে বাইরে বের করে দিতে পারলে বাঁচে।

সুধা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আগেই। না, তাকানো যায় না। সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে, ঝিম ঝিম করে মাথা। সরে দাঁড়াল সুধা দরজা ছেড়ে, উমা পাশ দিয়ে বাইরে চলে গেল।

একটু স্বস্তি পেল সুধা। বিশ্রী জিনিসটা চোখের সামনে থেকে সরে গেছে।

রত্নময়ী নিখিলের মাথার দিকটিতে বসে পাখার বাতাস করছিলেন। মাথায় একটু ঘোমটা তোলা। চোখ দুটিতে শঙ্কা এবং উদ্বেগ। আরতি একপাশে ভীত, বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডাগর চোখ আরও ডাগর করে।

এই ঘরের আবহাওয়াকে এবার স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারছিল সুধা। হলুদ নিষ্প্রভ খানিকটা আলো, দেওয়াল আর ছাদে জমা অন্ধকার—তক্তপোশের ওপর অসাড় শীর্ণ এক দেহ, ব্যাণ্ডেজে তুলোয় ভিজে ওঠা টাটকা রক্ত কিরকম যেন দেখাচ্ছে, তাকিয়ে থাকা যায় না। কোনোও এক উগ্র ওষুধের গন্ধও বাতাসে। না, আয়োডিন নয়, সে-গন্ধটা সুধার জানা। এ অন্যরকম।

নিখিলের বিছানার কাছে আরও একটু সরে এল সুধা। ঘরের অন্ধকার দেওয়াল থেকে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল। কানে শব্দটা বিশ্রী বাজে লাগল সুধার। কে যেন ফুঁপিয়ে উঠল। চমকে উঠে প্রথমে রত্নময়ী তারপর আরতির দিকে তাকাল সুধা। না, উমাই ফুঁপিয়ে উঠেছে। এই মাত্র, হয়ত কাঁদতে কাঁদতেই আবার ঘরে এসে ঢুকেছে মেয়েটা।

উমার কোঁপানোর শব্দটা তবু ভাল ছিল। কিন্তু নিজেকে সংযত করে ফেলেছে উমা। এখন এ-ঘরে আর কোন শব্দ নেই। নিশ্বাসের শব্দও বুঝি না!

পা টিপে টিপেই একরকম একটু সরে এল সুধা উমার কাছে। কি হয়েছে কি—? কিস ফিস গলা সুধার।

'ওরা মেরেছে—'গোল কোলা-কোলা মুখ উঁচু করে তুলে জল-চোখে বলল উমা, 'ওই যে ট্রাম বাসটাস পোড়াচ্ছে না সব লোকেরা—সেই ভিড়ের মধ্যে দাদা ছিল, দাদা কিছু করেনি—তবু দাদাকেই মেরে আধমরা করে ফেলেছে।' বলতে বলতে উমা কেঁদে ফেলল আবার।

কাঁদলে যে উমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না, সুধা এই প্রথম বুঝল। ওর অস্বাভাবিক ছোট্ট অথচ মোটা চেহারার সঙ্গে যে লালিত্যহীন নির্বোধ জন্তুর মতন মুখটা আছে, সেই মুখ যেন আরও কদর্য হয়ে পড়ে। চোখ দু'টো বুজে এসে হাড়-ওঠা-গালের ওপর একটা কুৎসিত কান্না বোবা জানোয়ারের মতন গোঙাতে থাকে। নীচের ঝুলে-পড়া পুরু ঠোঁট আরও ঝুলে যায়—মোটা মোটা দাঁতগুলোও যেন সরব হয়ে কাঁদতে থাকে। মনে হয়, সমস্ত কান্নাটা তাকে জড়িয়ে—তার ভয়ঙ্কর কোন বেদনার আর অসহায়ত্বের।

সুধার ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল, তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল। তার নিজেরই কেমন লাগছে। মনে হচ্ছে, হয়ত সে নিজেই কেঁদে ফেলবে।

রত্নময়ীর দিকে তাকাল সুধা। হাতের পাখা থামিয়ে নিখিলের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কি দেখছে মা! সুধার বুকের মধ্যে ধপ্ করে কেমন এক ভয় যেন লাফিয়ে পড়ল। টিকটিকিটা আবার অন্ধকার থেকে ডেকে উঠল।

নিখিল ভীষণ ছটফট শুরু করেছে। এই যে খানিকটা অসাড় হয়ে পড়েছিল, এটা হয়ত সামান্য একটু ঘোর। সে ঘোর ভেঙে গেছে।

'কষ্ট হচ্ছে—বাবা? কোথায়—কপালে, না—?' রত্নময়ী খুব মৃদু অথচ মধুর স্নেহের সুরে বললেন। আস্তে আস্তে গলায় বুকে আলগা করে হাত বুলোতে লাগলেন। ইশারায় আরতিকে বললেন, বাতাস করতে।

সুধা নিখিলের বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কখন। যারা এই নিরীহ, শান্ত, দুর্বল ছেলেটিকে অযথা অকারণে আধমরা করে মেরেছে—তাদের ধিক্কার দিচ্ছিল সুধা।

নিখিল যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। চোখ খুলতে পারছে না, এত ভীষণ ফুলে গেছে মুখটা। এপাশ ওপাশ ফিরতেও পারছে না, ছটফট করছে।

কি দরকার ছিল ওর—হুজুগে ভজা-গোছের ট্রামের-ছাদ-কাটা আগুন-ধরানো লোকগুলোর মধ্যে থাকবার—? নিখিলের অসহ্য কষ্ট দেখতে দেখতে ভাবল সুধা, বিরক্ত হয়েই ; নতুন এসেছে কলকাতায়, কিছু জানে না শোনে না, হুজুগ করতে গেছে।

বাসুর কথা মনে পড়ল সুধার। কে জানে এই হুজুগে সেও মেতেছে কি না। বাসুর জন্যে একটু চঞ্চল হল সুধা। রাত হয়েছে, বাসু এখনও বাড়ি ফেরে নি।

নিখিল বিকারের ঝোঁকে অস্ফুট স্বরে ভাঙা ভাঙা কি যেন বলল। মাঝে মাঝে চমকেও উঠছে।

'জরটা যেন খুবই!' রত্নময়ী সুধার দিকে তাকিয়ে বললেন। মনে হল, তিনি মেয়ের কাছে একটা উপদেশ চাইছেন, কি করা যায়, কি করলে ভাল হবে।

কি করা যায় এখন, সুধা কি বলবে! গিরিজাপতি জানেন, তিনিই বিবেচনা করবেন, কি করলে ভাল হয়। সত্যিই কি অনেক জর! মুখ দেখে কিছুই ঠাওর করতে পারছে না ও। মুখ কি আর আছে—ব্যাণ্ডেজ তুলোতেই ভর্তি। তবু তারই মধ্যে যতটা চোখে পড়ে তাতে মনে হচ্ছে, অসহ্য যন্ত্রণার সঙ্গে জরের তাপটাও বেড়েছে। টকটক করছে এ-পাশের গাল, ঠোঁটের ওপরটা খুবই শুকনো।

অন্যমনস্ক ভাবে সুধা হাত বাড়িয়ে নিখিলের জর অনুমান করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হল, খেয়াল হল, নিখিলের বুকের কাছাকাছি পর্যন্ত হাত এনে থমকে গেল। তারপর আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিল হাত।

'ওঁকে গিয়ে বলি।' সুধা বলল রত্নময়ীকে।

সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লেন রত্নময়ী। সুধা গিরিজাপতির ঘরে যাবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিল, দরজার কাছে এসে থামল, উমাকে শুধোল, 'তোমাদের থার্মোমিটার আছে, উমা?'

'না।' উমা মাথা নাড়ল।

'আমাদেরও—।' সুধা হতাশ গলায় বলল।

গিরিজাপতি মোড়ার ওপর ঠিক একই ভাবে বসেছিলেন। কাছে এসে দাঁড়াল সুধা। মুখ তুলে তাকালেন গিরিজাপতি। 'ওঁর জ্বর ত খুব বেড়েছে, ছটফট করছেন খুব।' মৃদু গলায় বলল সুধা। উদ্বেগের ছোঁয়া ছিল তার স্বরে।

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিলেন না গিরিজাপতি। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। মনে হচ্ছিল, কথাটা যেন তাঁর কানে যায়নি।

সুধা আবার কিছু বলবো বলবো ভাবছে—গিরিজাপতি কথা বললেন। 'জ্বর বেড়েছে?' তাঁর গলায় অসম্ভব কোনো ব্যাকুলতা ছটফট করে উঠল না, বরং মনে হল তিনি যেন জ্বর বাড়ার জন্যে তেমন কিছু উদ্বেগও বোধ করলেন না। 'জ্বর ত আজ বাড়বেই, টাটিয়ে উঠছে কি না।'

অল্প একটু চুপ-মুখে দাঁড়িয়ে থেকে সুধা বলল, 'রাত্রে যদি আরও বাড়ে? এই বেলা একজন ডাক্তার এনে দেখিয়ে নিলে হত না?'

'নিখিলকে যিনি রিক্শা করে এখানে দিয়ে গেছেন—তিনি নিজেই ডাক্তার।' গিরিজাপতি স্থির গলায় বললেন, 'যা করবার উনি নিজেই প্রথম থেকে করেছেন। আমাকে বলেছিলেন, জ্বরটর হবে হয়ত রাত্রে, একটা ওষুধ লিখে দিয়ে গেলাম, খাইয়ে দেবেন।' গিরিজাপতি মোড়া ছেড়ে উঠলেন। 'ওষুধটা আমি দোকান থেকে নিয়ে আসি।'

সুধা দোর-গোড়ায় অল্প একটু দাঁড়িয়ে থেকে এ-ঘরে ফিরে এল। রত্নময়ী জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। 'ওষুধ আনতে গেলেন।' সুধা ছোট্ট করে বলল।

সব চুপ। নিখিলের জ্বরের ঘোর যেন ওকে অচৈতন্য করে ফেলেছে। আর নড়ছে না নিখিল। রোগা হাড়-হাড় ফরসা শরীরটা অগুছোল কাপড়-জামায় হঠাৎ স্পন্দনহীন হয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস খুব দ্রুত হয়ে উঠেছে। মুখ দিয়ে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে—তার শব্দ।

সমস্ত ঘরটা কেমন যেন হয়ে গেছে। বাইরে বৃষ্টি নামল। জানলার ওপর একটা বেড়াল উঠেছিল লাফিয়ে; পালাল। আরতি এগিয়ে গেছে জানলা ভেজিয়ে দিতে। মেঝের ওপর হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে উমা। রত্নময়ী শুধু অপলক চোখে চেয়ে আছেন নিখিলের মুখের দিকে।

সুধা বলল আরতিকে, 'বৃষ্টি নেমেছে, তুই ওপরে যা ; জামা কাপড় সব বাইরে, জানলা টানলা খোলা।'

'তুমি আমার সঙ্গে এসো না, উমাদি।' আরতি যেতে যেতে দাঁড়িয়ে উমার গায়ে ঠেলা দিল। ওর কেমন যেন ভয় ভয় করছে। এত রক্তটক্ত দেখেই হোক কিংবা অস্বাভাবিক একটা পরিবেশের জন্যেই হোক।

হাঁটুর মাঝ থেকে মুখ তুলে তাকাল উমা।

'যাও না ; আমরা ত আছি এখানে।' রত্নময়ীও বললেন।

উমার ইচ্ছে ছিল না হয়ত, তবু আরতির সঙ্গে গেল।

শীত করছিল নিখিলের। কেঁপে কেঁপে উঠছিল। জ্বর বাড়ছে।

রত্নময়ী মোটা চাদরটা আরও ভাল করে টেনে দিলেন নিখিলের গায়ে বুকে পায়ে। 'একটা কাঁথা লেপটেপ হলে ভাল হত।' ঘরের এদিক ওদিক তাকালেন রত্নময়ী। 'ওটা দে—ওটাই এখন গায়ে দিয়ে দি।' আঙুল দিয়ে ঘরের একটা কোণ দেখালেন। বাক্সর ওপর গুছিয়ে বিছানা সাজানো। গায়ে দেওয়ার নয়, বিছানায় পাতার চাদর ঝুলছিল।

সুধা চাদরটা এনে নিখিলের বুক পর্যন্ত ঢেকে দিল।

একটু চুপ। রত্নময়ী হঠাৎ শুধোলেন সুধাকে, 'এই শান্ত গোবেচারী রোগা ছেলেটাকে ধরে এমন করে মারল কেন রে? কি করেছে ও?'

সুধা মার বিস্মিত অথচ সরল মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থাকল। কি যে জবাব দেবে বুঝতে পারল না। কেন মেরেছে সুধাই কি তা জানে?

বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই ঘরের দোর-গোড়া থেকে গিরিজাপতির গলা, 'এই ওষুধের এক দাগ তোর দাদাকে খাইয়ে দে, উমা।'

'উমা ওপরে গেছে।' সুধা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে ওষুধের শিশিটা নিল, 'আমায় দিন।'

'থার্মোমিটারও পাওয়া যায় না আজকাল। বড় বড় ওষুধের দোকানে গেলে হয়ত পাওয়া যাবে।' গিরিজাপতি পকেট থেকে খাপ সমেত থার্মোমিটার বের করলেন, 'তোমাদের পাড়ার ডাক্তারবাবুটির কাছ

থেকে রাজ্যের জল ভেঙে ফিরে আসলাম। জরটা এখন একবার দেখে রাখি, কি বলো?'

'আসুন না আপনি।' সুধা ডাকল।

গিরিজাপতি ঘরে এলেন। রত্নময়ী ততক্ষণে মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়েছেন।

জর দেখা হল। ওষুধ খাওয়ানো হল। জর প্রায় একশো চার। গিরিজাপতি তবু যেন বিচলিত নন। অন্তত তা বোঝা যায় না।

'তোমরা যাও, মা, রাত হয়েছে, আর কতক্ষণ বসে থাকবে।' গিরিজাপতি শান্ত গলায় বললেন সুধাকে।

রত্নময়ী হাতপাখা বিছানায় রেখে উঠে দাঁড়ালেন। ইশারায় সুধাকে বাইরে আসতে বলে ঘর থেকে চলে গেলেন। বারান্দায় এসে বললেন মেয়েকে নীচু গলায়, 'তুই একটু বোস মা, উনি বুড়ো মানুষ, খাওয়া দাওয়াটা অন্তত সেরে নিন, তারপর যাস। উনাকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সুধা ঘরে ফিরে এল। গিরিজাপতি নিখিলের বিছানার পাশে বসে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন। কি দেখছেন, কি ভাবছেন কে জানে। সেই শিষ্ট, সংযত, গম্ভীর মুখে আশ্চর্য এক কোমলতা নেমেছে। আকুল নন কিন্তু স্নেহতপ্ত; বিহ্বলতা নেই কিন্তু উৎকণ্ঠা জমে রয়েছে।

ওষুধ খাওয়াবার সময় নিখিলের ঘোর এবং আচ্ছন্নতাকে ভাঙতে হয়েছিল। তখন থেকেই ছটফট শুরু করেছিল নিখিল। এখন আবার বড় বেশি ছটফট করছে। মনে হচ্ছে, শরীরের যন্ত্রণা তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। কাতরতার গোঙানি উঠছে মুখ থেকে। বড্ড বেশি মাথা নাড়ছে। ডান হাতটা মুঠো করছে। পা ঘষছে বিছানায়। চোখ খোলবার চেষ্টা করছে। ভাল করে পারছে না।

'খুব কষ্ট হচ্ছে রে, নিখিল?', গিরিজাপতি ভাইপোর মুখের ওপর মুখ নামিয়ে আনলেন প্রায়।

কথাটা বোধ হয় নিখিলের কানে গিয়েছিল। কি বোঝাবার চেষ্টাও যেন করল; পারল না। ঠোঁট কাঁপতে থাকল একটু। তারপর নিঃশব্দ, করুণ কান্নার আবেগে নিখিল ফুঁপিয়ে উঠল।

গিরিজাপতি নিখিলের মাথার চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগলেন, কখনো বা বুকে।

'কাঁদছিস কেন—' খুব আস্তে করে আঙুল দিয়ে নিখিলের চোখের জল মুছে দিতে দিতে এক সময় বললেন গিরিজাপতি, 'তোর এত কাঁদার কি আছে রে, পাগল! একটা পবিত্র কাজের জন্যে দু ঘা লাঠি খেয়েছিস! কি হয়েছে তাতে! এ-কষ্ট দুদিনের—সব সেরে যাবে।'

সুধার বুকের কোথায় যেন কনকনে এক ব্যথা প্রথমে কেঁপে উঠল, তারপর ছুঁচের মুখের মতন হয়ে সারা বুকে ছড়িয়ে পড়ল। ব্যথাটা বাড়ল। মন ফাঁকা হয়ে গেল কেমন যেন। অন্ধকার দেওয়াল থেকে টিকটিকিটা ডেকে উঠল আবার।

বেদনা এক খাতে বইছিল, আচমকা একটি শব্দ কানের পর্দায় লেগে ক্রমশই মনের মধ্যে এক তরঙ্গ সৃষ্টি করল। পবিত্র!···পবিত্র!

ভালবাসা পবিত্র—সুধা আজ খানিক আগে জেনেছিল, সে-অনুভূতি তার উপলব্ধিতে এখনও রয়েছে—কিন্তু একের বেশিও পবিত্রতা আছে তা সে জানত না। খারাপই লাগছিল সুধার। মনে হচ্ছিল, এ কি করে হয়? কেমন করে?

সুধা গর্বহানির মতন এক হতাশা বোধ করছিল।

উমা এসে ডাকল। গিরিজাপতি মুখ তুলে তাকালেন। সুধাও। সুধা যে ঘরে আছে গিরিজাপতি জানতেন না।

'তোমায় খেতে দিয়েছি, কাকা—এসো।' উমা ডাকল।

গিরিজাপতি উঠলেন না। 'আমি খানিক পরে খাব। রেখে দে। তুই বরং খেয়ে নে।' উমাকে বললেন গিরিজাপতি, তারপর সুধার দিকে তাকিয়ে আবার, 'তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ? কি দরকার আর। আমি আছি। তুমি যাও, রাত হয়ে যাচ্ছে, দশটা বাজে বোধ হয়।'

সুধা আর কথা বলল না। ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সিঁড়ির মুখে আসতেই শিসের শব্দটা কানে গেল। বাসু ফিরল। সদর ভেজিয়ে দিয়ে আসছে—শিস দিতে দিতে।

প্রায় অন্ধকারেই ভাইবোনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কোথায় ছিলি এত রাত পর্যন্ত ?' সুধা শুধোল।

'মরা পোড়াতে গিয়েছিলাম।' বাসু বলল। ওকে কেমন দেখাচ্ছে! জামা কাপড় ভিজে ভিজে যেন। চুল এলোমেলো।

'মড়া পোড়াতে—?' সুধা অবাক। একটু সরে গেল বাসুর কাছ থেকে। 'কার মড়া—তুই কেন গিয়েছিলি ?

'পঞ্চার এক ফ্রেণ্ডের পিসে। হিদারাম ব্যানার্জী লেনে থাকত। বলল, চলে গেলাম। একটা পবিত্র কাজ ত!' বাসু সিঁড়ির মুখে পা বাড়াবার চেষ্টা করল।

সুধার কানে শেষ কথাটা যেন বিঁধে গেল। ভাইয়ের দিকে চাইল ও। ভাল করে দেখা যাচ্ছে না।

পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল বাসু, গন্ধটা পেয়ে গেল সুধা। বিশ্রী এক গন্ধ। ভক্ করে উঠল সেই গন্ধ নাকের কাছে।

না, শ্মশানের গন্ধ নয়, মড়ার গায়ের গন্ধ নয়—সুধার কেমন করে যেন মনে হল, এ গন্ধ মদের। বাসু মদ খেয়েছে।

বাসু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেছে ততক্ষণে।

ছয়

জ্বরের বাড়াবাড়ি ভাবটা পরের দিন সন্ধ্যের পর থেকে একটু একটু করে কমতে শুরু করেছিল নিখিলের ; পুরোপুরি জ্বর ছাড়ল আরও দিন দুই বাদে। চোখের তলা, নাকের পাশ, গাল আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল , টাটানো লালচে ফোলা ফোলা ভাব আর ছিল না। কপালে তখনও ব্যাণ্ডেজ, বাঁ হাতের তালু আর কব্জি জড়িয়ে প্লাস্টার।

ক'দিনেই নিখিলের রোগা চেহারা আরও ফ্যাকাশে, রুগ্ন হয়ে পড়েছে। তবু, অসুস্থতার সেই ঘন কালিমা তার মুখ চোখ থেকে আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে।

যে-কদিন জ্বর আর গায়ে-গতরের ব্যথায় বিছানা ছাড়ার উপায় ছিল না, শুয়েই কাটিয়েছে নিখিল। এখন চুপচাপ শুয়ে থাকতেও পারে না সব সময়। উঠে বসে—জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—খানিক বারান্দায় গিয়ে বসে। আর সর্বক্ষণই প্রায় উমাকে জ্বালিয়ে মারে, এটা দে ওটা দে—খুব খিদে পেয়েছে কিছু খেতে দে, কাকার ঘরে কাগজটা রেখে আয়, কটা বেজেছে দেখ ত! একটু চা খাওয়া দেখি।

উমা জ্বালাতন ; চটে মটে বলে, 'শাপে বেশ বর হয়েছে তোর। হাত পা ভেঙে এসে দিব্যি শুয়ে রয়েছিস বিছানায় আর ফরমাশ করছিস। যা, এই দিন দুপুরে আর আমি চা তৈরি করতে পারব না। মাথা মুখ হাত ধুয়ে ভাত খেয়ে নে।'

'দিন দুপুর কি রে, এই ত দশটা বাজল।'

'দশটা আবার কাল বাজবে।' এলোমেলো এ-দিক ও-দিক ছড়ানো গেঞ্জি, শার্ট, কাপড়, শাড়ি, তুলে এনে গুছিয়ে রাখছিল উমা। যে-গুলো কাচার সে-গুলো আলাদা করে পায়ের কাছে ফেলছিল। এখনও অনেক কাজ

বাকি। ঘরটা মোছা হয়নি। মুছতে হবে। কাচার জিনিসও ক'টা হল। তারপর স্নান।

'এইমাত্র যে দেখলাম তোদের সুধাদি অফিসে গেল।' দশটা যে বেশিক্ষণ বাজে নি তার জলজ্যান্ত একটা প্রমাণ দিল যেন নিখিল। বিছানার ওপর বসেছিল পা ঝুলিয়ে। এবার উঠে দাঁড়াল। উমার কাছে এসে তার গুছিয়ে রাখা কাপড় জামাগুলো উঁচুতে দেওয়াল-আলনার ওপর রাখতে লাগল। উমার অত উঁচুতে হাত যায় না; চেয়ার কি টুল টেনে এনে উঠে দাঁড়াতে হয়। 'তুই সর আমি রেখে দিচ্ছি সব ঠিক করে,' নিখিল বলল বোনকে বেশ নরম আদুরে গলায়, 'তুই যা, বেশ ফাইন করে খানিকটা চা তৈরি করে নিয়ে আয়। আমি কি একলা খাবো, তুইও খাবি।'

'খুব চালাকি শিখেছিস, না!' উমা ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে ভাইয়ের দিকে চাইল। কৃত্রিম কুপিত চোখে।

'তুই-ই বা কি কম! দশটা বাজল না একেবারে দিন দুপুর করে ছাড়ছিস।'

নিখিল হাসল। তারপর চট করে সুর পালটে মিনতিতে একেবারে নরম হয়ে বলল, 'অমন করিস না, ভাই; একটু চা খাওয়া।'

কাক যখন একবার ডেকেছে সহজে যে ছাড়বে না উমা জানত। যতক্ষণ না চা পাচ্ছে, নিখিল যে কত রকমে খোসামুদি আর মন গলাবার চেষ্টা করবে তা সে জানে। হাতের কাজটা সারতে সারতে উমা বলল, 'তুই বড় ফ্যাচাং করিস দাদা। উনুনে আগুন আছে কি না কে জানে, এখন আবার চা। চা খেয়ে খেয়ে মরবি না কি। তার চেয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে ফেল।' ঝেড়ে ঝুড়ে পাট করে ধুতিটা নিখিলের হাতে দিয়ে উমা হাসল। কিন্তু তারপর সত্যিই চলে গেল রান্নাঘরে।

উনুনে আগুন পড়ে এসেছিল। কাপড় সেদ্ধ হচ্ছিল কড়াইয়ে, সোডা সাবানের জলে। কড়া নামিয়ে কেটলি চাপিয়ে দিল উমা।

চা তৈরি করতে বসে উমার মনে হল, একটু বুঝেসুঝে সংসার চালাতে বলেছে কাকা। এটা হেতমপুর নয়, কলকাতা। পয়সা দিয়ে এখানে মাটি

পর্যন্ত কিনতে হয়। বাড়ি ভাড়া, সংসারের খাই দাই, জামা কাপড়ের খরচ। তার ওপর এখন দাদার পড়ার খরচ চেপেছে। সে বড় অল্প নয়। কাকা বলছিল, এবার থেকে বেশ গুছিয়ে বুঝেসুঝে চালাবি উমা। উমা আর বুঝবে কি—তার মাথায় ছাই কিছুই ঢুকছে না এখানে। আজ বলে ত নয়, আজ কতদিন ধরে এই সংসার নিয়ে আছে উমা, মাথার চুল ছেঁড়ার মতন কিছু হয়নি—হেতমপুরে থাকতে। সংসারে যা নেই, অভাব ঘটেছে যার—আনিয়ে নিয়েছে মধুবাবুর দোকান থেকে। এখানে মধুবাবুর দোকান নেই। তেল নেই, ডাল নেই, নুন নেই—হুট করে আনিয়ে নেওয়া যায় না। নগদ পয়সা দিয়ে আনা। কাকার কাছে গিয়ে চাইতে হয়, বলতে হয়। দিনে দশবার করে কি এটা আনতে হবে ওটা আনতে হবে বলা যায় মানুষকে। বিশ্রী লাগে না। কাকাই বা ভাবে কি ?

এই ত চা চিনি—এখন এরই বা খরচ কত বেড়েছে। বিকেলেই চায়ের পাতা আনতে পয়সা দিতে হবে। চিনিও ফুরিয়েছে। এক পো আধসের চিনি জোটাতেও প্রাণ যায়। তেমনি তার দর। ওপরের মাসিমাদের দেখাদেখি উমাও আজকাল চিনির বদলে অনেক সময় বাতাসা বা ছোট ছোট কদমা ব্যবহার করতে শুরু করেছে। ওপরের মাসিমারা আবার বেশির ভাগ গুড় দিয়ে কাজ সারে।

উমা চায়ের কেটলি নামিয়ে চায়ের পাতা ঢেলে দিল। উনুনটা খুঁচিয়ে যেটুকু আগুন ছিল তাও নিবিয়ে ফেলতে লাগল। আধপোড়া দু'চারটে কয়লা যা বাঁচে এ-ভাবে সে-গুলোও কাজে লাগে। কয়লার বড় দাম এখানে। পাওয়াই মুশকিল। হেতমপুরে এত অসুবিধে ছিল না। কয়লা বেশ মাগ্যি হয়েছিল আজকাল। তা হলেও পাওয়া যেত। অভাবে কাঠ। এখানেও কাঠ পাওয়া যায়। কিন্তু সে-কাঠ চেরা কি তাতে রান্না করা এই এতটুকুন রান্নাঘরে, উমার সাধ্য নয়। ধোঁয়ার চোটে দম বন্ধ হয়ে আসে।

কলকাতায় এসে পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সে। চাল চিনি আটা কয়লা তেল—কোনোটার হিসেবই আর তার মাথায় ঢুকছে না। এখানে কি ছাই সবই নেই নেই। যতটুকু বা আছে, পাওয়া যায়, তার গলা কাটা

দর। মানুষে বাঁচে কি করে এখানে? খায় কি? লাথোপতি না কি সবাই?

কাপে চা ঢেলে উমা উঠে দাঁড়াল। এক হাতে নিখিলের জন্তে কাপ, অন্ত হাতে নিজের।

'হেতমপুরেই আমরা ভাল ছিলাম—বুঝলি দাদা।' ঘরে এসে নিখিলের হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিয়ে উমা বলল, 'কলকাতায় আমাদের পোষায় না বাপু।'

চায়ের কাপে পরিতৃপ্তির এক চুমুক দিয়ে নিখিল বলল, 'কেন, তোর না-পোষাবার মতন কি হল?'

'আমি কি আমার কথা শুধু বলছি, সকলের কথা বলছি।' উমা জানলার ধার ঘেঁষে আধ-বসা হয়ে বসল।

'আমার কিন্তু ভালই লাগছে।'

'তোর ত লাগবেই। আরামে আছিস! না সংসারের ভাবনা ভাবতে হয়, না হাঁড়িকুঁড়ি সামলাতে হয়।' উমা ভ্রূকুটি করে বলল। 'কি রকম খরচটা বেড়েছে জানিস এখানে এসে? ডবল ত হবেই।' উমা ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করল, কথার গুরুত্বটা ওর বোধগম্য হয়েছে কি না। তারপর আচমকা বললে, 'এখন থেকে আর অত চা চা করবি না, বুঝলি।'

নিখিল হেসে ফেলল। 'তোর আদত কথা তাহ'লে ওটা।'

উমাও হাসল। চায়ের কাপে শেষবারের মতন চুমুক দিয়ে পায়ের তলায় নামিয়ে রাখল। 'না রে ছোড়দা, সত্যিই খুব খরচ বেড়েছে। কাকা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত একটা কাজকর্মই খুঁজছে।'

কথাটার কোনো স্পষ্ট জবাব দিল না নিখিল। এ-রকম একটা অনুমান সে নিজেও করছে। 'কোথায় গেছে রে কাকা সকালেই?' নিখিল শুধোল।

'কি জানি—!' উমা তার অজ্ঞতার মৌখিক ভঙ্গি করে জবাব দিল।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকল নিখিল। কি ভাবছিল। বলল, 'গণ্ডগোলের জন্তে ইউনিভারসিটি কিছুদিন বন্ধ করে দিয়েছে। খুলুক আবার। দেখিস না দু-একটা টিউশনির ব্যবস্থা করে নেব।' একটু থেমে হতাশ গলায় বলল

আবার, 'এখন পর্যন্ত একদিন ক্লাসে গিয়ে বসতে পারলাম না। বড্ড দেরি করছে এবার ক্লাস শুরু করতে।'

'ভর্তি ত তুই হয়ে গেছিস?' উমা বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা।

'তা হয়েছি। ক্লাস শুরু হচ্ছে না এই যা। দুর্—এ আর ভাল লাগে না।'

কি ভেবে উমা হেসে উঠল। 'যা না আর একবার ধোলাই খেয়ে আয়, ভাল লাগবে।'

'ধোলাই—!' নিখিল অবাক হয়ে বোনের মুখের দিকে চাইল।

'ধোলাই কাকে বলে জানিস না?' উমা ভাবল নিখিল বোধ হয় কথাটার মানে ধরতে পারছে না। হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'মার রে, মার, পিট্টি খাওয়া।'

বোনের হাসি দেখতে দেখতে নিখিলের মুখ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। 'এ-সব অসভ্যের মতন কথা তুই কোথ থেকে শিখছিস?'

দাদার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উমার হাসি ক্রমেই যেন নিবে এল। একটু অপ্রতিভ। 'অসভ্যের মতন কথা কেন? আরতি ত বলে।'

'যে বলে বলুক, তুই বলবি না।' নিখিল বলল, 'কলকাতার ফক্কড় ছেলেদের এ-সব বিশ্রী কথা কোনো ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে মেয়ের মুখে আনা উচিত নয়। আর এ-পাড়াটাও হয়েছে তেমনি। ধাড়ি ধাড়ি আড্ডাবাজ ছেলেগুলো সারাদিন রকে বসে আড্ডা মারছে। ননসেন্স!—আমায় রাস্তায় দেখলে এমন সব ঠাট্টা ইয়ার্কি করে। যেন আমি একটা কী—হনুমান বাঁদর টাঁদর হব। আরতির দাদাটা, ওটা ত এক নম্বরের গুণ্ডা।'

উমা চুপচাপ কথাগুলো প্রথমটায় শুনে গেল। একটু বিরতি দিয়ে বলল হঠাৎ, 'তোর আবার বেশি বেশি। সবাই অভদ্র ছোটলোক, তুই একলাই কেবল ভদ্র। বাবা, এম এ পড়তে ঢুকেছিস—এখনই তোর এত হ্যা হ্যা। কেন, হেতমপুরে তোর বন্ধুরা কি এমন সব পীর পয়গম্বর ছিল রে। তারা মারপিট করত না, আড্ডা ইয়ার্কি মারত না। কানুদা ত লেখাপড়া ছেড়ে শুধু গান গেয়ে বেড়াত।'

নিখিল বোনের তর্কের প্রস্তাবনাতেই বিরক্ত আর ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'তোর মাথায় এ-সব ঢুকবে না।' উঠে পড়ল ও। বইয়ের তাকটায় ধুলো জমেছে। আস্তে আস্তে ঝেড়ে পুঁছে ফেললে হয় এখন। মনের বিরক্ত ভাবটা তখনও কেনা কাটছে। শেষ কথাটা তাই বলেই ফেলল নিখিল, 'তোর এই ফটিক দে লেনের ছেলেগুলোর মধ্যে কালচারের ছিটে ফোঁটাও নেই। বুঝলি।'

উমা আর বাজে কথা কাটাকাটির মধ্যে না গিয়ে ঘরের কাজ সারতে লাগল। আসলে এ-ব্যাপারে তার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। এ-পাড়ার ছেলেরা কি করে, তারা ভাল না মন্দ—তার কোনো খোঁজই রাখে না উমা। এসে পর্যন্ত বাড়ির বাইরেও বেরোয় নি কোনোদিন। সদরে দাঁড়িয়ে কিংবা জানলায় বসে যেটুকু দেখা যায় গলির সেটুকু দেখেছে। আর আরতির মুখ থেকে যা শুনেছে—তাই।

তবে বাসুকে দেখেছে উমা; দেখছেও রোজ। সত্যিই একটা হতচ্ছাড়া ছেলে। লেখাপড়া চাকরি বাকরি কোনোটাই করে না, বাড়িতে দু'বেলা দুটো খায় আর সারাদিন বাইরে আড্ডা মেরে বেড়ায়। রাত্রে ফিরে এসে ঘুমোয়। এ-পাড়ার সব ছেলেই যদি অমন হয় তবে অবশ্য দাদা এমন কিছু খারাপ বলে নি। কিন্তু···উমা ঘরের মেঝে ঝাঁট দিতে দিতে নিখিলের দিকে একবার তাকাল, তার দাদাকে নিয়ে ওরা ঠাট্টা করে কেন? দাদা নিরীহ ভালমানুষ বলে! কি ঠাট্টা করে দাদাকে? দাদা কিছু বলতে পারে না?

উমার হঠাৎ খুব একটা রাগ হতে শুরু করল। ছেলেগুলোর ওপর। এবং শেষ পর্যন্ত নিখিলের ওপর গিয়ে পড়ল রাগটা। ও-রকম মিনমিনে স্বভাব, রোগা, ঝাঁটার কাঠি চেহারা যাদের তাদের এই রকমই হয়, অপমান গালমন্দ ঠাট্টা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। কেন, তোকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করলে তুই ওদের কিছু বলতে পারিস না! ভয় পাস বুঝি! তুই কি মেয়েমানুষ?

বাইরে কে ডাকল। নিখিলের নাম ধরে। বই হাতে বসে আসতে একটা বইয়ের পাতা খুলে কি চোখে পড়তে—একটানা পড়ে যাচ্ছিল নিখিল।

গলার স্বর শুনে উমা বুঝতে পারল দেবুদা এসেছেন। নিখিলও বই রেখে উঠে দাঁড়াল।

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেবুদার পাশে মৃণালকে চোখে পড়ল। নিখিল অবাক, খানিকটা খুশীও।

'এই যে নিখিল, তোমার বন্ধুকে নিয়ে এলাম।' হেসে বলল দেবব্রত, 'উনি আমার ডিসপেনসারিতে খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন। তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আমি আবার বাড়িটা চিনি, ঠিকানা জানি না। অনেকক্ষণ ভদ্রলোককে বসিয়ে রাখতে হল। রুগীটুগী কিছু ছিল, তাদের হাঙ্গামা না মিটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। তারপর কেমন আছ?'

'ভালই। হাতের এই ব্যাণ্ডেজ আর রাখা যাচ্ছে না, দেবুদা। এমন চুলকোয় সারাদিন।' নিখিল মুখে চোখে অস্বস্তির ভাব ফুটিয়ে বলল।

'কই দেখি একবার।'

'চলুন, বসবেন না নাকি? রুগীর হাঙ্গামা ত সেরেই এসেছেন।' দেবব্রত আর মৃণালকে নিয়ে গিরিজাপতির ঘরে ঢুকল নিখিল।

'কাকা কোথায়?' ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করল দেবব্রত।

'বেরিয়েছেন।' জবাব দিল নিখিল। তারপর মৃণালের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'আপনার খবর কি?'

'খবর বেশ ভাল।' হাসল একটু মৃণাল, 'ক'দিন সরকারী ভাত খেয়ে এলাম। কাল ছাড়া পেয়েছি। ভগবানের অসীম কৃপা কোর্টে আর হাজির হতে হবে না।' অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমে মৃণাল অন্য কথা পাড়ল। 'সেদিন যে শেষপর্যন্ত কি হল আমি বুঝতেই পারলাম না।' ইশারা করে দেবব্রতকে দেখিয়ে দিয়ে বলল আবার, 'উনি আপনাকে রাস্তা থেকে ডিসপেনসারিতে নিয়ে গেলেন দেখেছি। আমায় ততক্ষণে গুঁতো দিয়ে দিয়ে পুলিসের গাড়িতে তুলে দিয়েছে।'

মৃণালকে পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল নিখিল জানত না। কথাটা শুনে অভিভূত বিস্মিত দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ অপলক চেয়ে থাকল নিখিল। মৃণালকে

ঠিক আর স্বল্প-আলাপী বন্ধু মনে হচ্ছিল না। তার চেয়ে কিছু বেশি, কিছু উঁচু দরের মানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

দেবব্রত বেতের মোড়া টেনে বসে পড়েছে। লম্বা লোক, নীচু মোড়ায় বেশ আরাম করে বসতে পারে না, একটু অসুবিধেই হয়। হাঁটু ভেঙে না বসে দেবব্রত টান টান করে পা ছড়িয়ে দিয়েছে। আরামের সঙ্গে বেশ একটা অনাড়ষ্ট, সহজ ভাব ফুটে উঠছে। এই পরিবারের সঙ্গে দেবব্রতর মেলামেশা যে মাত্র কয়েকদিনের তা যেন মনে হয় না। ওর স্বভাবই এই। খুব সহজে এবং শিষ্টতার সঙ্গে অপরের অন্তরঙ্গ হতে পারে। সপ্রতিভ, সহাস্য ; ব্যবহারের আন্তরিকতায় মানুষটি অকৃত্রিম। সহানুভূতি এবং কোমলতার একটি সুন্দর ভাব মাখানো আছে মুখে। একটু গোল অথচ গভীর ধরনের চোখ। বুদ্ধির সঙ্গে নিবিড়তা, মাধুর্যের সঙ্গে মমতা। সামান্য চাপা নাক। ওপর-ঠোঁটের আগা খুব সূক্ষ্ম, নীচের ঠোঁট অতটা নয়। ঝকঝকে দাঁতের সারি। চিবুকের সুগঠনে দেবব্রতর প্রায়-চৌকো মুখটির ছোটখাটো অনেক খুঁত যেন ঢাকা পড়ে গেছে। হয়ত এই চিবুক আর চোখের জন্যেই একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, যা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। দেবব্রতর বয়স বেশি নয়। হয়ত চল্লিশের কাছাকাছি এসেছে। কথাবার্তার ধরনে কিন্তু কখনও মনে হয় চল্লিশকে সে ফেলে এসেছে, আবার কখনও সন্দেহ হয় তিরিশ বুঝি এখনও পেরোয় নি।

শাদা হাফ হাতা শার্ট ; সাদা ট্রাউজার। বুকের ডান বাঁ দু'দিকেই পকেট, বোতাম দেওয়া। বাঁ দিকের পকেটে ফাউনটেনপেন উঁকি দিচ্ছে, ছোট নোট বুক। ডান দিকের পকেটে মনিব্যাগ সম্ভবত। গায়ের রঙটা তামাটে মতন।

মৃণাল বসেছিল জলচৌকির মতন চৌকোনো অল্প উঁচু এক টুলের ওপর।

মৃণাল আর নিখিলের মধ্যে বয়সের তফাতটা খুব বেশি নয়। বড় জোর বছর দুয়েকের। দুজনের মধ্যে সাধারণ একটা মিল আছে যেমন, তেমনি অমিলও। মৃণালও রোগাটে গোছের, তবে নিখিলের মতন অতটা নয়। রঙ ফরসাই। ওপর ওপর মৃণালকেও ধীর শান্ত বলেই মনে হয়। তবে

নিখিলের মতন অতটা লাজুক নম্র নয়। দু-পাঁচটা কথা শুনলেই বোঝা যায় মৃণালের মধ্যে আবেগের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। ছেলেমানুষীর ভাবুলতার সঙ্গে খানিকটা আত্মকেন্দ্রিকতা। মুখের গড়ন ছোট, ত্রিভুজ ধরনের। কপাল ছোট, ভুরুর ঘনতা নেই, চোখ যেন কটা—আঁট করে বসানো। নাকের হাড় বড় প্রকট বলে চোখ যেন বড় তলানো দেখায়। সরু থুতনি। বাঁকা সুসমঞ্জস ঠোঁট।

মৃণাল পাঞ্জাবি পরে এসেছিল। ডান দিকের ঘাড়টা যে তার একটু নামানো—সেটা বোঝা যাচ্ছিল ওর দিকে তাকালে। এক মাথা চুল, ছোট কোঁকড়ানো কিন্তু প্রচুর।

মৃণালই কথা বলল প্রথমে। 'আপনার ওপর দিয়ে খানিকটা হাতের সুখ করে নিয়েছে তা হলে।' নিখিলের দিকে তাকিয়ে লঘু অথচ সহানুভূতির সুরে বলল মৃণাল।

'হাতের সুখই——' বিষণ্ণ ক্ষুব্ধ একটু হাসি ফুটল নিখিলের মুখে, 'করুক—। দেখি না কতদিন আর এ-রকম সুখ করতে পারে। যা অবস্থা বেশি দিন আর পারবে বলে মনে হয় না।' নিখিল কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থেমে গেল। অল্প একটু পরে বলল, 'সে-দিন ওই গণ্ডগোলের মধ্যে আপনি যে কোথায় আলাদা হয়ে গেলেন আমি কিছুই জানি না। আপনাকে পুলিসে ধরল কি করে?'

'আর বলবেন না।' মৃণাল নিজের মূর্খতাকে যেন কিঞ্চিৎ ধিক্কার দিয়ে বলল, 'তাড়ার চোটে একটা ব্লাইণ্ড লেনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। তারপর দেখি রাস্তা নেই। সাহস করে তাই ফিরতে শুরু করলাম। ওখানে যারা ছিল তারা বারণ করলে। আমি ভাবলাম, বুক ফুলিয়ে গটগট করে হেঁটে সামনে দিয়ে চলে যাই—কিছু হবে না। 'কারেজ' দেখাতে গিয়ে একেবারে মুখোমুখি। ধরল। ব্যাটাকে যত বলি, তুমি আমায় ধরছ কেন, আমি কিছু করি নি—সে তত মাথা নাড়ে। এই যে কিছু সোলজার ছেড়ে দিয়েছে ট্রাকে চাপিয়ে—এরা একেবারে থার্ডরেট, রাস্কেল কতকগুলো। বীস্ট। যা খুশি করছে।' একটানা এতগুলো কথা বলার পর মৃণাল যেন দম নিতে থামল।

দেবব্রত চুপচাপ, সকৌতুকে মৃণালের কথা শুনছিল। মৃদু হেসে বলল, 'আপনার একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেল আর কি। জেল ঘুরে এলেন।'

'অভিজ্ঞতাই!' মৃণালের চোখ মুখ ঘৃণায় বিশ্রী হয়ে উঠল, 'ছি ছি, কী কদর্য ব্যাপার। লালবাজারে যখন নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দিল—সে কী অবস্থা! যত চোর বাটপাড় বদমাশের সঙ্গে থাকা। দুর্গন্ধ, থুতু, কম্বলগুলোতে রক্তপুঁজ। ওটা একটা নরক। এক রাত্রেই আমার আয়ু বোধ হয় অর্ধেক হয়ে গেছে। ভাগ্যিস তার পরের দিন কোর্ট থেকে আর লালবাজারে না ফেরত পাঠিয়ে সেণ্ট্রাল জেলে পাঠিয়েছিল—নয়ত মরে যেতুম।'

অল্পক্ষণ চুপচাপ। দেবব্রত ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরিয়ে নিল। নিখিল তখনও মৃণালের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। কি দেখছে কে জানে। 'একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করলুম।' মৃণাল বলল, 'পরশু যখন আবার কোর্টে নিয়ে গিয়ে হাজির করল, ভেবেছিলুম হয়ে গেল—শুনলাম, সাঙ্ঘাতিক চার্জ আমাদের বিরুদ্ধে। কয়েক বছরের মতন আর বাড়ির ভাত খেতে হবে না। অথচ মজা হল, ম্যাজিস্ট্রেট সব কটাকেই ছেড়ে দিল। একজনকে শুধু ফাইন করেছে শুনলাম। মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেট খুব সিমপ্যাথাটিক।'

দেবব্রত খুব মনোযোগ দিয়ে মৃণালের কথা এবং হাবভাবের মধ্যে কি যেন লক্ষ্য করছিল। বলল, 'মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেটের আনসিমপ্যাথাটিক হবার কি ছিল?'

প্রশ্নটা আচমকা বলে নয়, মর্মটা হয়ত অপ্রত্যাশিত বলে মৃণাল একটু ঘাবড়ে গেল। বলল, 'না—তা নয়; মানে মুসলমান বলেই যে বলছি তা না, তবে একে ম্যাজিস্ট্রেট—ও-সব ত ধামাধরা লোক, তার-ওপর মুসলমান—এই মুভমেণ্টের সঙ্গে যাদের সংস্রব্ নেই বললেই চলে। সহানুভূতি না থাকাই স্বাভাবিক।'

'সব মুসলমানই মুস্লিম লীগ নয়—!' নিখিল বলল।

'লীগ কংগ্রেস আমি বুঝি না।' মৃণাল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল, 'এই গোলমালেও আমার সমর্থন নেই। যা হচ্ছে—দেখছি ত, এ একটা গুণ্ডামি।'

সিগারেটটা মুখে উঠোতে গিয়ে মাঝপথে হাত থেমে গেল দেবব্রতর। মৃণালের দিকে তাকিয়ে খানিক কি দেখল যেন। বলল, 'গুণ্ডামি কেন ?'

'নয়ত কি, এই তার কাটা, ট্রাম পোড়ানো, পোস্টাফিস জ্বালানো—এ-সবের মানেটা কি ?'

'মানেটা সহজ। বিক্ষোভ জানানো।'

'ও-রকম ছেলেমানুষী বিক্ষোভ অনেক জানানো হয়েছে। ওতে কিছু হয় না। কতকগুলো রাস্তার লোক মার খায়, মরে—না হয় জেলে গিয়ে পড়ে থাকে।' মৃণালের যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে সেটা ওর কথার ধরনেই বোঝা যাচ্ছিল।

'কি ক্ষতিটা হয়েছে তাতে! মরুক না কিছু নিরীহ লোকই। সব দেশেই মরেছে।' দেবব্রত বলল, আবেগহীন শান্ত গলায়। 'নিরীহ লোকেরা চিরকাল বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে এমন কোনো শর্ত নিয়ে আসেনি। কত লোক কত ভাবে মরে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যদি কিছু মরেই—ক্ষতি কি।'

'ও-সব বাজে স্বাধীনতা আমি বিশ্বাস করি না।' মৃণালের মুখ উত্তেজনায় ঈষৎ লাল হয়ে এসেছিল। চোখ চকচক করছিল। যেন আঁচ লেগেছে কিসের এক।

'কাজের স্বাধীনতা কোনটা ?' দেবব্রতর মুখে হাসি হাসি ভাব একটুও ম্লান হয়নি।

'যা সকলের ; গরীব মুটে মজুরের ; চাষীর ; নিঃস্ব মানুষের।'

'ও! আর এ-স্বাধীনতা কাদের যাদের জন্যে মহাত্মা গান্ধীর এই আপ্রাণ চেষ্টা ?' দেবব্রত সিগারেটের শেষ টুকরোটুকু নিভিয়ে উঠে দাঁড়াল। জানালার কাছে গিয়ে ফেলে দিল।

মনে হল মৃণাল যেন দ্বিধায় পড়েছে। স্পষ্ট করে যা বলতে চায়, বলতে পারছে না ; কিসে আটকে যাচ্ছে। সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে মৃণাল বলল, 'মহাত্মাজীকে বাদ দিন। ওঁর কথা আলাদা। তবে কংগ্রেস যে স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে, সেটা কোটিপতিদের স্বাধীনতা। সাধারণ মানুষের নয়।' অল্পের জন্যে থামল মৃণাল। তারপর এই গণ্ডগোল সম্পর্কে তার শেষ সিদ্ধান্ত

জানিয়ে দিল, 'এই যুদ্ধ পিপলস ওয়ার। কোন রকমের তাবিটেজই আমি সমর্থন করি না।'

দেবব্রত এবার উঠে পড়ল। হাত ঘড়িতে এগারোটা বাজে প্রায়। নিখিলকে সামনে ডাকল, কপাল দেখবে বলে।

ব্যাণ্ডেজ খুলে কপাল ভাল করে দেখল দেবব্রত। আবার বেঁধে দিল। বলল, 'ঘা শুকিয়ে আসছে। দিন কয়েক লাগবে। ব্যাণ্ডেজটা এখন থাক। দু'একদিন পরে এসে আমি অন্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।' মৃণালের দিকে চাইল দেবব্রত, 'আপনি তাহলে বসুন। আমাকে একবার মদন দত্ত লেনে যেতে হবে—দিদির বাড়ি।' দেবব্রত হাসি মুখে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল, নিখিলও। মৃণাল ঘরেই বসে আছে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলা থেকে নেমে আসছিল উমা। শেষ ধাপে এসে দাঁড়াল। দেবব্রতর দিকে মুখ তুলে চেয়ে একটু হাসল।

'কি ব্যাপার উমা, তোমার সাড়া শব্দ পেলুম না কেন আজ। ছিলে কোথায় ?'

'কাজ করছিলাম।' উমা জবাব দিল।

'রান্না ?'

'উহুঁ।'

'সেরে ফেলেছ ! তবে ত আর ভাগ বসানো যায় না। দাও এক গ্লাস জলই দাও, খেয়ে যাই।' দেবব্রত হাসতে হাসতে বলল।

জল আনতে গেল উমা। দেবব্রত খুব চমৎকার এক সরল এবং সরস ভঙ্গি করে মৃদু গলায় বলল, 'তোমার বন্ধুটি কি কমিউনিস্ট, নিখিল ?'

'কমিউনিস্ট !' নিখিল খানিকটা অবাক, খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'কই না। আমায় কিছু বলেনি ত। কি জানি !'

দেবব্রত আর কোনো রকম কৌতূহল প্রকাশ করল না। গিরিজাপতি সম্পর্কে দু একটা কথা শুধোল।

জল নিয়ে এল উমা। দেবব্রত এক চুমুকে সবটাই নিঃশেষ করল। তারপর হাসিমুখে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

'আর কতক্ষণ আড্ডা চালাবি?' উমা নিখিলকে শুধোল। 'কত বেলা হয়েছে হুঁস আছে ত!'

'আছে। তোর তাড়াতাড়ি থাকে স্নান করে খেয়ে দেয়ে ঘুম দিগে যা।'

'বেশ। তোর ভাত আমি হাঁড়ির মধ্যে রেখে দেব। নিজে বেড়ে নিয়ে খাস।'

কথাটা কানে না তুলে গিরিজাপতির ঘরের দিকে আবার পা বাড়াল নিখিল।

- ঘরে ঢুকতেই মৃণাল কথা বলে উঠল। অন্যমনস্ক ছিল বলে নিখিল পুরো কথাটা শুনতে পেল না।

'আপনার ওই ডাক্তারবাবু বুঝি কংগ্রেসাইট?' মৃণাল আবার শুধোল।

'হ্যাঁ। উনি খুব গোঁড়া গান্ধীভক্ত।'

'বোঝা-ই যায়।' মৃণাল মাথা দুলিয়ে একটু হাসল। 'ডাক্তারখানায় দেখলুম বেশ বড় এক ছবি ঝুলছে গান্ধীর।'

'দেবুদা খুব ভাল লোক। সহজে এমন মানুষ দেখা যায় না।' নিখিল যেন মৃণালের কথার ত্রুটি শুধরে দিচ্ছিল, 'আমার জন্যে ত যথেষ্টই করেছেন। একটা পয়সা নেন নি। প্রায়ই খোঁজ খবর নিয়ে যান।'

'ভাল লোক আর বিবেচক লোক এক জিনিস নয়, নিখিলবাবু।' মৃণাল বলল।

এসব আলোচনা নিখিলের আর ভাল লাগছিল না। নিজে সে দেবুদার মতনই এই আন্দোলনের বিরোধী নয়, তার ওপর দেবুদার প্রতি তার কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা জেগেছে। উভয় অনুভূতির কোনোটাকেই সে আহত হতে দিতে চায় না।

কথার মোড় ঘুরিয়ে নিল নিখিল। "আগামী সপ্তাহে কি ইউনিভারসিটি খুলবে!'

'খুব সম্ভব। যদি না আবার কোনো সাম্প্রদায়িক গোলমাল শুরু হয়।'

'গোলমাল কি আর থামবে! ও এখন চলল। যত দিন যাবে তত

বাড়বে। দেখছেন না অবস্থা। এসপ্লানেড মার্কেট স্কোয়ার, নিমতলার রাস্তায় কি কাণ্ডটা হল! ডেসপারেট হয়ে গেছে মানুষ। কালও ত প্রায় সব সেকশানের ট্রামই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

'তাতে কিছু আটকাবে না। এখন বাড়াবাড়ি যা হচ্ছে সে-সব বাইরে। মাদ্রাজ, নাগপুর, এলাহাবাদ। কলকাতায় খুব একটা মারাত্মক কাণ্ড কি আর হচ্ছে এখন? কই—তেমন কিছু নয়। দু একটা কলেজ রেগুলার ক্লাস শুরু করেছে।'

একটু চুপচাপ। নিখিলই আবার কথা বলল, 'বইপত্রও কিছু যোগাড় করতে পারলাম না। কোর্স কি তাও মশাই জানি না। এদিকে আগস্ট মাস শেষ হয়ে এল।'

মৃণাল হাসল। 'এত তাড়াতাড়ির কি আছে। সবে আগস্ট। পরীক্ষা দিতে দু-বছর। অঢেল সময়। দু-বছরে কত কি হয়ে যেতে পারে।'

দু-পাঁচটা এলোমেলো কথা। অনেকক্ষণ থেকে, হয়ত প্রথম থেকেই মৃণাল তার নিজের একটা কথা বলবার সুযোগ খুঁজছিল, পাচ্ছিল না। শেষে মৃণাল বললে, 'আপনার এই অবস্থার জন্যে আমি দায়ী নিখিলবাবু। কথাটা আমার সে-দিন থেকে বার বার মনে হয়েছে। আমি যদি আপনাকে টেনে না নিয়ে যেতুম—ও-রকম অমানুষিক মার খেতে হত না।' মৃণাল আক্ষেপ জানাল। যেন ক্ষমাও চাইছিল।

'না—না, এতে দায়ী হবার কি আছে—।' মৃণাল আড়ষ্ট অগোছাল ভাবে কথাটা চাপা দিতে চাইল।

মৃণাল বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। অনুশোচনা এবং কুণ্ঠায় বিব্রত ব্যথিত। আপন খেয়ালে বলল, 'একেই বলে কপাল। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর কলেজে আমার তেমন কিছু কাজ ছিল না। অফিস থেকে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে আসা। পরে গেলেও চলত। কি যে খেয়াল হল, আপনাকে টেনে নিয়ে গেলাম। আর হাঙ্গামার মধ্যে জড়িয়ে পড়লুম।'

কথাটা ঠিকই। সে-দিন ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিল নিখিল একটু খোঁজ খবর নিয়ে আসতে। লাইব্রেরি কার্ড-কার্ড যদি পাওয়া যায় একটা।

মৃণালের সঙ্গে দেখা। সেও একটা চক্কর দিতে এসেছে। মুখচেনা আগেই হয়েছে ওদের। এমনি আরও দু' একজন। খানিক গল্পটল্প হল বসে বসে। তারপর মৃণাল ওকে বলল, চলুন একটু ঘুরে আসি। আমার পুরনো কলেজ বিদ্যাসাগর : থেকে। কাছেই।

আপত্তির কোনো কারণ ছিল না। নিখিল সঙ্গে চলল।

বিদ্যাসাগর কলেজের হোস্টেলের কাছে ভীষণ এক গোলমাল শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল আশেপাশে। নিখিলরা অতটা বুঝতে পারে নি। কলেজের গলিতে না ঢুকে হোস্টেলের মধ্যে দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করতে গিয়েই বিপদ ঘটল। ওদিকে ট্রামের তার কাটা ; সামনে ক'টা ট্রাম পর পর দাঁড়িয়ে গেছে। ফাঁকা। মাথার ওপরকার ট্রলিগুলো তার ডিঙিয়ে খাড়া হয়ে রয়েছে। এদিকে একটা দু নম্বর বাস ফুটপাতের গায়ের ওপর লাইটপোস্টের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে শিং-ভাঙা মোষের মতন রুখে আছে। সামনেটা ভাঙা কাঁচে ভর্তি। রাস্তাময় ইঁট পাটকেল ছড়ানো। পুলিসের গাড়ি। মিলিটারী টহল। পোড়া পোড়া একটা গন্ধ আসছিল যেন কোথা থেকে। রাস্তাটা ফাঁকা। দু'এক জন পথচারী সন্ত্রস্ত চকিত ভাবে পথ চলছে। ফুটপাতের ওপর দোকানগুলোর কোনোটা বন্ধ, কোনোটা অর্ধেক খোলা। কলেজের কাছাকাছি পৌঁছতে পেছনে কালীতলার কাছে আচমকা একটা শব্দ হল। গুলির। বাতাস যেন কেঁপে উঠল। মিলিটারী-টহল-গাড়ি থেমে গেছে। রাস্তার ওপর টপাটপ্ লাফিয়ে পড়েছে ক'টা সোলজার। ছুটে আসছিল এ-দিকেই। কলেজের সামনের শঙ্কর ঘোষ লেনের মুখে ক'টা ছেলে ছিল— তারা পিছু ছুট দিল। মৃণাল নিখিলকে ডাক দিয়ে ছুটতে লাগল হোস্টেলের দিকে। সামনেও যে পুলিস কে জানত। পেছনে মিলিটারী। নিখিল ছুটেছিল —সেটুকু তার মনে আছে,—মনে আছে লুকোনো একটা গলির মুখ থেকে একদল মানুষ পুলিসের দলকেও তাড়া করে এসেছিল। তারপর যে কি হল নিখিলের স্পষ্ট মনে নেই। মৃণাল হারিয়ে গেল। যে দিক পানে চোখ গেল রাস্তার লোকগুলো ছুট দিল। নিখিলও যেন কার পিছু ধরেছিল। কোন বাড়ির লোহার গেটের মধ্যে ঢুকেও পড়েছিল। কিন্তু তার আগেই মুখের

ওপর বন্ধ হয়ে গেল সদর। বাড়ির মানুষ মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর পুলিসের দল তেড়ে এসে গরু ছাগলের মতন ক'টা মানুষকে টেনে হিঁচড়ে বের করে মার শুরু করলে। কিছু কি বাদ রেখেছিল ওরা ? না। লাঠি, রুল, ঘুঁষি, বুটের ঠোকর। নিখিলের আর কিছু মনে পড়ে না। রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। বোধহীন অর্ধ-অচেতন একটা শরীরকে তারপর কে যেন আস্তে রাস্তা থেকে তুলে নিল।

গোটা দৃশ্যটা বিচ্ছিন্ন অথচ দ্রুত দুঃস্বপ্নের মতন মনের ওপর ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল নিখিলের।

মৃণালের দিকে চোখ তুলে তাকাল নিখিল। মৃণালও চেয়ে আছে। সহৃদয় বেদনায়।

অল্প একটু চুপচাপ। মৃণাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'অনেক বেলা হল—আজ চলি। আবার একদিন আসব।'

নিখিলও উঠে পড়ল। ম্লান হেসে বলল, 'আসবেন, আমার হয়ত বাড়ি ছেড়ে বেরুতে এখনও দু-চার দিন লাগবে।'

মৃণালের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়াল নিখিল।

সাত

কলকাতার আকাশ থেকে শেষবর্ষার মেঘ উধাও হয়ে গেছে। এখন আশ্বিন। মেঘলা ছাই-ছাই-রঙ সকাল, হঠাৎ-কালো-দুপুর, স্যাঁতসেঁতে ভিজে বিকেল, ক্লান্ত সন্ধ্যে-রাত কোথায় যেন তলিয়ে গেছে। কচিৎ কদাচিত দু-এক পশলা এলোমেলো বৃষ্টি এসে পিছু-ফেলা দিনগুলোকে মনে পড়িয়ে দিতে চায়। চায় হয়ত, কিন্তু মন তাতে প্রসন্ন হয় না। বরং চোখ চেয়ে না দেখলেও—আশ্বিনের সকালের এই কাঁচের মতন ঝকঝকে রোদ, ঈষৎ-নীল আকাশ, লঘু জলহারা মেঘই ভাল লাগে। ভাল লাগে তখন—যখন সারা দিনমানের কোলাহল আর ব্যস্ততা অদেখা গোধূলির আলোয় ডুবে গিয়ে এই কলকাতার গাঢ় কালিজল আকাশে তারা ফুটে ওঠে।

বাইরের আবহাওয়া বদল হয়েছে। বদল হয় নি ভেতরের। কিছুদিন আগে যে উন্মত্ত অস্থির বেপরোয়া ক্ষিপ্ততা এই শহর কলকাতার পথ ঘাট বাড়ি অফিস আদালতের কোণে কোণে ভীতিকর ভাবে ফুঁসে উঠেছিল—এখন তার চেহারা অল্প একটু বদল হয়েছে হয়ত। ভূমিকম্পের প্রথম জোর ঝাঁকুনি যেন অনেকখানি ফাটল আর চিড় ধরিয়ে এবার আস্তে আস্তে মাথা দুলোচ্ছে। কিংবা বলা যায়, ঝড়ের প্রথম ধাক্কাটা যত এলোমেলো আথালি-পাথালি ভয়াবহ চেহারা নিয়ে এসেছিল—এখন তার ভয়ঙ্করতা অতটা প্রত্যক্ষ নয়। রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা ভাঙছে, ভেঙেছে; সতর্কচক্ষু পুলিস আর সৈন্য টহল এড়িয়ে—সরকারী বিধিবাধাকে অমান্য করে ফাঁকি দিয়ে দলে দলে মানুষ আর বিক্ষোভ জানাতে পারছে না। যত্রতত্র ট্রাম থামিয়ে আগুন ধরানো—তার কাটা এখন বুঝি অতটা সহজ নয়। রাস্তার আলো আর ডাক বাক্স নতুন করে ভাঙার মতন আর যেন বেশি বাকি নেই। দমকল চালাক হয়ে গেছে। ফায়ার-এলার্ম ভেঙে হন্তদন্ত সুরে ডাক দিলে

তারা আর সহজে আসে না। চালাকিটা জেনে ফেলেছে ভাল করেই। তাছাড়া এখন ও-পক্ষ তাড়া খেয়ে ঘা খেয়ে বড় বেশি সতর্ক সাবধানী কঠিন আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। সরকারী বিধিনিষেধ ছাড়াও, পথে ঘাটে মাঠে এই খালিহাত আবেগপ্রবণ ক্ষতিকর মানুষগুলোকে দমিয়ে রাখার জন্যে রাশ রাশ পুলিস ছাড়া রয়েছে রাস্তায়; দরকারে সৈন্য আসে। কাঁদুনে গ্যাস, বন্দুক, গুলি, লাঠির আয়োজন অনেক বেড়ে গেছে। হিংস্র প্রয়োজনের নীতিটা শিথিল করে ফেলা হয়েছে। এ-পক্ষ তাই অতটা, আগের মতন অত অবিবেচক হতে ভরসা পায় না। তবু সুযোগ পেলেই ট্রাম পোড়ায়, তার কাটে, ডাকঘরে আগুন ধরায়, হরতাল করে। এই ত কাল-পরশুও আহিরীটোলা পোস্ট অফিস পোড়াতে গিয়েছিল। পারে নি। ট্রাম হলে এখনও গ্রে স্ট্রীটে, চিতপুরে, বেহালায়—ফাঁকায় টাঁকায় ধরা যায়—পোড়ানোও যায়, সেকশানের ট্রাম চলাচল বন্ধ করে ফেলা যায়। বাসগুলোকে ঠিক এ-ভাবে বাগে ফেলা যায় না। তাছাড়া—আজকাল ট্রামে-বাসের মানুষরাও অন্য রকম সুরে কথা বলছে। কেন মশাই গরীবদের ওপর এ-অত্যাচার করছেন? টাই-হ্যাট পরলে টেনেটুনে ছিঁড়ে ফেলতেন গালিগালাজ করতেন—সে-সব সাহেবীপনা লোকে ছেড়ে দিয়েছে, এখন আর আমাদের দোষ কি? পেটের জন্যে চাকরি করতে যাচ্ছি, কিংবা অফিস থেকে ফিরছি—রাস্তা বন্ধ করে দিলে আমাদেরই অসুবিধে। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে আবার হাঁটতে হাঁটতে ফেরো। চাকরি রাখতে দেবেন না? বাড়ি ফিরতে দেবেন না? ছেলেমেয়েকে পড়তে যেতে দেবেন না?

যারা অগ্নিকাণ্ডের হোতা তারা যুক্তি তর্ক অনুরোধ আগে অতটা বুঝত না। এখন যেন একটু আধটু বোঝে। হয়ত তারা ক্লান্ত হতাশ হয়ে পড়েছে। হয়ত তাদের পিছনের মানুষরা সরে গেছে।

এই টাল-মাটালের বাজারে প্রায় দিন আট দশ কলকাতার সমস্ত কাগজ ছাপা বন্ধ হয়ে গেল। চৌরঙ্গী পাড়ার ইংরিজীটা বেরুত। কাগজ বন্ধ হলে অনেক কিছু বন্ধ হয়। বাইরের খবর আর আসছে না। ঘরেরও না। এমন কি শ্যামবাজারের লোকও জানছে না ভবানীপুরে কি হল। কি হচ্ছে।

গুজব তাতে কিছু ছড়াচ্ছে, আবার অনেক ঘটনাও অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে। ওষ্ঠাগত, খাসবদ্ধ অবস্থা কারুর কারুর ; অন্তদেরও কেমন মন খুঁত খুঁত। তবে এ কথাও ঠিক, কাগজঅলারাও লড়ছে। লড়ছে পয়সার ক্ষতি করে। সরকারী যা-ইচ্ছে-তাই নীতির বিরুদ্ধে।

এ কি অবস্থা শহর কলকাতার ? আগুন আছে, ধোঁয়া আছে, লুঠপাঠ আছে, সংসারের কৃচ্ছ্রতা দিন দিন অসহ হয়ে উঠছে, নিয়মিত ছোটবড় গণ্ডগোল আছে, আছে হরতাল ; স্কুল কলেজ বন্ধ : যদি বা খোলে আবার বন্ধ হয়ে যায়, হাসপাতাল ভরে উঠছে দিনে দিনে, জেলখানাও।

শান্তি ত নেইই কারুর—গরীব আর মধ্যবিত্তেরই বেশি—যেটুকু স্বস্তি বা ছিল—তাও ঘুচেছে।

মানুষ ক্লান্ত, মানুষ অনিশ্চিত। সামনে কোথাও এতটুকু আশা ত দেখছে না। দশ এগারো টাকা মণ চালের ভাবনা, আট ন আনা সের চিনির ভাবনাই শুধু নয়—তার সঙ্গে এই দুঃসহ ভাবনাও যে চেপেছে—আজ আফিস যাচ্ছি সকালে, বিকেলে কি বাড়ি ফিরতে পারব ? ঈশ্বর জানেন। তিনিই জানেন, মাথার ওপর জাপানী বোমার ভয় আর পায়ের তলায় এই হরতাল, টিয়ার-গ্যাস, পুলিসের গুলির আতঙ্ক নিয়ে আমাদের আয়ু ক্ষণস্থায়ী না দীর্ঘস্থায়ী।

তবু—এই বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল স্নায়ুভ্রান্ত আবহাওয়াতেও মানুষ আশ্বিনের রোদ গায়ে নিয়ে আফিসে দোকানে যায়। স্ত্রীকে সোহাগ করে, ছেলে-মেয়েকে আগামী পুজোর স্বপ্ন আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত না-করার প্রতিশ্রুতি দেয় (পড়াশোনার তাগিদ দিতেও ভোলে না) এবং মাঝে মাঝে পাড়ার কাছাকাছি কোথাও সিনেমা দেখে আসে।

আর শহরের যখন এই রকম অবস্থা—তখনও বোমার ভয়ে ঘর বাড়ি রুজি-পুঁজি ছেড়ে পালানো কলকাতার মানুষ—বাইরে কয়েক মাস কেউ কেউ বা বছর পুরো করে—আবার দলে দলে ফিরে আসতে থাকে কলকাতায়। না এসে উপায় কি ! ভরসাই বা কোথায় ! মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছিল বলেই না পালিয়েছিল সব—কিন্তু বাইরেই বা খাঁড়ার কোপ কম কিসে ? সেখানেও জীবন দুঃসহ। চালের দাম আগুন, চিনি নেই, নুন প্রায়ই ফুরোয়,

কোরোসিন তেল জোটাতে গলদঘর্ম, অসুখে-বিসুখে ওষুধ জোটে না, সাপের কামড়ে ছেলে বউ মরে, ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, তার ওপর এই নতুন বিপদ—ট্রেনের লাইন ওঠাওঠি, স্টেশন পোড়ানো, ডাকঘর লুঠ। কোন ভরসা আর বাইরে? ট্রামের লাইন উপড়ে ফেললে, ডাকঘর পোড়ালে, কলকাতায় যে থাকল আর মধুপুর দেওঘর সাঁইথিয়া কিংবা আর কোথাও সংসারের আর যারা থাকল তাদের মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান। স্বামীর চিন্তায় স্ত্রী পাগল হয়ে যায়, বুড়ো বাপের ভাবনায় ছেলে, আর পুরুষরা পরিবারের দুর্ভাবনায় রাত জাগে। তার ওপর গুজব। কলকাতায় বসে পুরুষকর্তা শুনছে—বাইরে আর স্টেশন বলে কিছু নেই; ধানক্ষেত আর মাঠের মধ্যে রেল লাইন স্লিপার টাল হয়ে পড়ে আছে, টেলিগ্রাফের তার কুটি কুটি। অমুক ট্রেন বর্ধমান কি গোমো পর্যন্ত যাচ্ছে, ওদিকে বুঝি শান্তাহার তারপর আর পথ নেই; অমুক গাড়ি চৌদ্দ ঘণ্টা পরে হাওড়ায় এসেছে কিংবা শিয়ালদায়। মফঃস্বলে থাকা ইভ্যাকুয়ি পরিবারের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। কারও বাবা—কারুর বা স্বামী-পুত্র কলকাতায়, পেটের রুজি রোজগার করছে—তাদের কি অবস্থা কে জানে? কলকাতায় রাস্তায় নাকি মেশিনগান চলছে—এরোপ্লেনে করে ঝাঁক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ছে মিলিটারীতে, ট্রামবাস বন্ধ, বাড়ি-ঘর পুড়ছে। গুজবে আরও শত কথা রটে। কেউ শোনে, হাওড়ার পুল ভাসিয়ে দিয়েছে, শহরে ঢোকার পথ বন্ধ; আসারও। এতেও শেষ নেই। ডাকঘর লুঠ আর কাগজপত্র পোড়ানোর ঠেলায় এখন কি অবস্থা দেখ। কে কেমন আছে তার চিঠি পর্যন্ত উভয় তরফ থেকে দেওয়া-নেওয়া প্রায় বন্ধ; সংসার খরচের টাকাও যে কত পরিবারের এল না, আসছে না—তার হিসেবই বা কে রাখবে। এখন এই বিদেশে খাব কি?...নেহাতই একগুঁয়ে, মহাধনী, ভয়ঙ্কর সাহসী না হলে—এরপর কার আর ইচ্ছে হয় বাইরে থাকতে সংসারের বেচারী পুরুষ মানুষদের কলকাতায় ফেলে? খাওয়া-পরা আধিব্যাধির দুশ্চিন্তার ওপর আবার এ নতুন-উদ্বেগ সহ্য করা যায় কি করে? তার চেয়ে দরকার নেই আর বাইরে থেকে, কলকাতাতেই ফিরে চল, মরতে হয় সবাই একসঙ্গে মরব। এও ত মৃত্যু। যদি কপালে থাকে জাপানী বোমাতেও

মরব। যদি না থাকে কপালে—মরব না। মরার কথা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। হ্যাঁ, এখনও সময় আছে ফিরে যাবার। পরে কি হবে কে বলতে পারে? হয়ত রেল লাইন বলে আর কিছু থাকবে না, ডাকঘরগুলো ছাই হয়ে যাবে। তখন—?

এত অনিশ্চিত, অন্ধকার ভবিষ্যত সামনে রেখে কোন মানুষই স্বস্তিতে থাকতে পারে না। কলকাতা-ছাড়া বোমার ভয়ে পালানো অনেক পরিবার আবার তাই ফিরতে শুরু করল।

কাগজ বন্ধ হয়েছিল দিন আটদশ—তারপর আবার যখন বেরুল তখন দেখা গেল—শহর কলকাতায় হয়ত ট্রাম পোড়ান কমেছে, গুলি চালানো থেমেছে অনেকটা—কিন্তু সারাটা বাংলা দেশে এই গণ্ডগোল ভয়ঙ্করভাবে ছড়িয়ে গেছে। ওদিকে ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি থেকে শুরু করে এদিকে কালনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া কোথাও যে বাকি নেই। বোলপুরের মতন জায়গা, সেখানেও—হিন্দু, মুসলমান আর সাঁওতালের একটা বিরাট দল হাজার পাঁচেক মানুষ মিলে রেল স্টেশনে হানা দিয়ে তছনছ করে গেছে সব। কালনাতেও ত তাই। রেল স্টেশন, শহরের ডাকঘর ডাকবাংলো আগুনে পুড়েছে। মাদারীপুর মহকুমার খবর দেখ, প্রায় গোটা অঞ্চলটাতেই টেলিগ্রাফ টেলিফোনের তার কেটে ফেলেছে। রাজসাহীর থানা আর সেন্ট্রাল জেলে সাঙ্ঘাতিক হামলা করছে মানুষে। বালুরঘাটেই বা কম কি? কয়েক হাজার মানুষের বিরাট এক মিছিল সমস্ত বালুরঘাট শহরটাকে যেন ভয় পাইয়ে স্তব্ধ করে দিয়েছে—দেওয়ানী আদালত, সাবরেজিস্ট্রি অফিস, ডাকঘর আবগারি দারোগার অফিস, রেলের অফিস—আরও কত না দপ্তরে যে হানা দিয়েছে, আগুন জালিয়েছে, তার কেটেছে টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের—তার হিসেব পাওয়া ভার। ঢাকায় গুলি চলছে প্রায় নিত্য। মানুষ মরছে, মারছে; জেলে যাচ্ছে। এ যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে। ট্রেন পোড়ানো কি লাইন থেকে বেলাইনে ফেলে ট্রেন উলটে দেওয়া এ-যাবৎ শোনা যায় নি বাংলা দেশে। তাও শোনা যাচ্ছে এবার। বগুড়ার তেলুপাড়ার স্টেশনে

শাস্তাহার-বোনারপাড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনটায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল কারা —এই ত সেদিন।

বাংলা দেশের অবস্থা যা বিহারে তার পাঁচগুণ। ও-অঞ্চলের খবর যতটুকু কাগজে ছাপা হয়—তাতেই স্তম্ভিত হয়ে যায় মানুষ। ধারণা করা যায় না—কি হচ্ছে ওখানে। এক বিহারেই নাকি মাত্র এই ক'মাসে বাট পঁয়ষট্টিটা রেল স্টেশনে মানুষ হামলা করেছে মরীয়া হয়ে; তার মধ্যে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। ভাগলপুরের অবস্থা ভয়ঙ্কর। সেন্ট্রাল জেলে দাঙ্গা মারামারি। জেলের কর্মচারী আর বন্দীদের মধ্যে। জেলের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে আরও দুজনকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে এরা; অন্য পক্ষ বুলেটে বুক ছেঁদা করে দিয়েছে আটাশ ত্রিশ জনের; শ'খানেকের হাত পা মাথা জখম। পূর্ণিয়াতেও তাই। থানায় হামা দিয়েছিল দশ হাজার লোক। দারোগা কনেস্টবলকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে। বেহার সরিফের, সাহাবাদের কোথাও কোথাও এমনই ভয়ঙ্কর অবস্থা। ওরা পুলিস, সৈন্য, ট্রলি, গুলি বন্দুক, মেশিনগান মানছে না। থানা ঘেরাও করে পুলিসদের ইউনিফর্ম পর্যন্ত পোড়াচ্ছে। লুঠ করছে, নষ্ট করছে যা পায় তাই।

আমেদাবাদ, বম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, এলাহাবাদ—কোথায় না হচ্ছে হাঙ্গামা! আসাম থেকে আরব সাগর—হিমালয়ের পদতল থেকে ভারত মহাসাগরের উর্মিতট পর্যন্ত অদ্ভুত আশ্চর্য এক কম্পন অনুভব করা যায়। হয়ত ভূমিকম্পের মতনই এটা আকস্মিক, কোথাও কোথাও ভয়ঙ্কর এবং তীব্র ভাবে মাটি কেঁপে উঠলেও সর্বত্র নয়, সিন্ধু বা সীমান্ত প্রদেশ যেমন; হয়ত বেশির ভাগ মাটিতে শুধু কাঁপনের মৃদু একটা ধাক্কাই লেগেছে—তবু অস্বীকার করা যায় না, ভারতবর্ষ শান্ত স্থির ঘুমন্ত অথবা মৃত প্রাণীর মতন অনড় অচল হয়ে নেই, তা জেগেছে।

উত্তেজনা কি শুধু থানা পোড়াবার, টেলিগ্রাফ তার কাটবার, লাইন উপড়ে ফেলবার? প্রথমে তাই ছিল—এখন তার চেহারাও পালটে আসছে। মানুষ যখন একবার বেপরোয়া হয়, তার কাছে থানা পোড়ানো আর চালকল লুঠ করতে আলাদা সাহসের দরকার হয় না। থানা কেন পোড়াচ্ছে, রেল

মাইন কেন উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—সে-কথা বোঝার চেয়ে—চালকল লুঠ করবে কেন তা অনেক সহজে বুঝতে পারে। পেটে যখন ভাত নেই, চাল চাল রব তুলে অস্থির, মুমূর্ষু উদরান্ন—তখন চালকল লুঠ করার মধ্যে উদ্দেশ্যটা যত স্পষ্ট, বোধগম্য—অতটা ডাকঘর পোড়ানোতে নয়। কাজেই তমলুকের কাছাকাছি এক চালকল লুঠের খবর আছে, আর সেই সঙ্গে পুলিসের পঁচিশ রাউণ্ড গুলিকে অগ্রাহ্য করার দুঃসাহসের কাহিনী ঢেউ ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়তে লাগল বাংলা দেশে। আর তারপর দেখতে দেখতে এও বুঝি রীতি অভ্যাস হয়ে দাঁড়াল। অন্ন নেই পেটে, লুঠ কর। লুঠ কর চালকল আর টাকা। ছুটকো ছাটকা নয়, বড় রকম লুঠ হয়ে গেল উলুবেড়িয়ায়। চালকল লুঠ; পঞ্চাশ হাজার টাকা সমেতই।

কলকাতা শহরে আশ্বিনের রোদ আরও উজ্জ্বল আরও স্বচ্ছ আর পরিষ্কার হয়। মানুষ ফিরে আসতে শুরু করে। শহরে ভিড় বাড়তে থাকে ক্রমশই। মাথার ওপর এরোপ্লেনের শব্দ যেন বড় বেশি শোনা যায় আজকাল। মাঝে মধ্যে সাইরেনের মহড়া।

দেখতে দেখতে আশ্বিনও শেষ হল। শেষ-আশ্বিনে পুজো। পুজো মণ্ডপের মুখরতা আগের তুলনায় অতটা স্বতঃস্ফূর্ত আর স্পষ্ট নয়। ভিড় কিছু বাড়ল; আনন্দ কমল। অত বাতি অত আলো অত হাসিখুশির মেলা আর এলোমেলো উচ্ছ্বাসের রূপটা যেন অসুখে-পড়া মানুষের হাসির মতন বিষণ্ণ, হৃদয়-বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকল। মনের সঙ্গে তার যোগ অল্প। নিছক যেন সংস্কারের অনুষ্ঠান। শ্মশান যাত্রায় ভাড়া করা সংকীর্তনের মতন।

একদিন কলকাতা শহরের পার্ক আর চওড়া রাস্তা, উঁচুতলা বাড়ির খোলা জানালায় হেমন্তের ঠাণ্ডা বাতাস ঝাপটা দিয়ে যায়। ধীরে ধীরে কখন যেন সরু গলি, চাপা বাড়ির দেওয়ালেও কনকনে একটা স্পর্শ ছড়িয়ে যায়। শীত আসছে। হিম ঝরছে। আকাশের তারার তলায় জমছে কুয়াশা। দীর্ঘতর সন্ধ্যা। কার্তিক মাসের শেষ ক'টা দিন কেমন যেন মন্থরতা এনেছে।

আর এনেছে পোকা। আলো কোথায় শহরে কিংবা বাড়ি-ঘরে, তবু ঝাঁক ঝাঁক দেওয়ালী পোকা। কোথা থেকে আসে কে জানে? কিন্তু আসে, ফাঁক-ফোকর দিয়ে আলোর চক্রে এসে ঘুরপাক খায়। আর মরে।

সেদিন বুঝি অনেক পোকা মরে জড়ো হয়েছিল গিরিজাপতির ঘরে। সকালে ঘর ঝাঁট দিতে দিতে উমা দরজার কাছে একমুঠো পোকা জড় করেছিল, আর ধুলো। গিরিজাপতি কাগজ পড়ছিলেন। আচমকা উমার কথায় কাগজ থেকে মুখ সরালেন।

চৌকাটের সামনে ঝাঁটা ফেলে রেখে উমা তখন একটা ময়লা ফেলার কাগজ খুঁজছে।

'আমায় কিছু বললি?' গিরিজাপতি শুধোলেন।

কাকার বই কাগজ পত্রের স্তূপ থেকে উমা একটা পুরনো পোস্ট্ কার্ড যোগাড় করে নিয়েছে। চিঠিটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল উমা। হেতমপুর থেকে পূর্ণকাকা লিখেছিল। পুজোর পর বিজয়ার চিঠি।

'কী ভীষণ পোকা মরেছে দেখেছ?' চৌকাঠের সামনে এসে বসল উমা।

গিরিজাপতি তাকালেন। পোকাগুলোকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মেঝেয় ছড়ানো সেই মৃত পতঙ্গের অস্তিত্বটা ঠাওর করা যাচ্ছে। গিরিজাপতি নিজের অজান্তেই হাতের কাগজ আরও খানিক সরিয়ে একটু গলা ঝুঁকিয়ে দেখলেন।

মুঠোয় করে মরা-পোকার রাশ আর ধুলো তুলে নিল উমা। সবটুকু জঞ্জাল পরিষ্কার করে চলে গেল।

গিরিজাপতি সহজে আর কাগজে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলেন না। এ-রকম হয় মানুষের। মনের মধ্যে কি যেন থাকে, অস্পষ্ট চিন্তায়, অনুভবের গভীর কোনো তলায়—হঠাৎ বাইরে থেকে আশ্চর্য যোগাযোগটা ঘটে যায়—সমস্ত চিন্তাটাই ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আজকের কাগজের কোথাও কিছু একটা হয়ত ছিল—সম্ভবত মনের তলার স্রোতে তার

টান বয়ে যাচ্ছিল- আচমকা বাইরের মরা পোকার স্তূপ তাকে ওপর তলায় টেনে আনল।

গিরিজাপতি অন্যমনস্ক হয়ে হঠাৎ যেন সৃষ্টি রহস্যের একটা [illegible] অবাক মনে অস্পষ্ট ভাবে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন। [illegible] তাঁর, এই শোভন-দৃশ্য পৃথিবীর কোনও অন্ধকার যবনিকার আড়ালে যেন এক অসীম শক্তিমান, অপ্রত্যক্ষ স্বৈরাচারী একটা ক্ষমতা রয়েছে। প্রাণকে যে শুধু ক্ষয় আর নিঃশেষ করছে। আয়ুকে লুঠ করছে।

তাই ত দেখছেন গিরিজাপতি। দেখছেন মানুষের পরমায়ু লুঠের এই অপ্রতিরোধ্য শতভুজ শক্তির কত অদ্ভুত ষড়যন্ত্র। মৃত্যুর লুকোচুরি খেলায় জাল ফেলে ফেলেও সে ক্লান্ত নয়!

মানুষ বোধ হয় একেই বলেছে, ঈশ্বর; ভাগ্য। গিরিজাপতি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। ভাগ্যতেও নয়। তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েন। মনে হয়, ভাগ্য না থাক, দুর্জ্ঞের দুর্বোধ্য কোনও একটা অনিয়মের নীতি আছে—এই বিশ্বরহস্যের কোথাও। নয়ত কেন এমন হয়, কি করে হয়। কেনই বা সেই বিশ্রী কুৎসিত অদৃশ্য লুকনো জাল ছিটকে এসে পড়ছে এখানেও—এই বাংলা দেশে—আর কেনই বা জালে আটকে অসহায়ের মতো এত রকম ভাবে মরছে মানুষ। মৃত্যুর ত ভূগোল নেই স্বতন্ত্র। তবু আজ যেন আরও একটা ভৌগলিক অকারণ নির্মমতা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে।

খবরের কাগজের খোলা পাতা আবার কখন চোখের সামনে টেনে নিয়েছেন গিরিজাপতি। না-চাইলেও কাগজের একই পাতার দু-পাশে দুটো বড় বড় ছবি চোখে না পড়ে যায় না। অনেকটা যেন চুম্বকের মতনই ছবি দুটি তাঁর চোখ আবার জোর করে টেনে নিল। একপাশে একটি ঘরবাড়ি ভেঙে পড়া বিধ্বস্ত গ্রামের ছবি; ভূমি-লুন্ঠিত বৃক্ষ—কংকালসার একটি কি দুটি মানুষ অসহায়ের মতন তাকিয়ে আছে—পায়ের কাছে মানুষ আর পশুর শব। [illegible] ছবিটা চোখে আরও দুঃসহ। মর্গে পাঠানো ঠেলা গাড়ির মতনই প্রায় [illegible] খা গাড়ি—এক গাদা শব এক-ফেরতা কাপড়ে মুড়ে কায়ক্লেশে

কোনোরকমে একটি গাড়িতে চাপিয়ে দেওয়া। কলকাতা শহরের রাস্তা দিয়ে শববাহী ঠেলা গাড়ি চলেছে শ্মশানে। প্রথম ছবিটি ঝটিকা বিধ্বস্ত মেদিনীপুরের কোন গ্রামের ; দ্বিতীয়টি হালসীবাগানের অগ্নিকাণ্ডের পরিণাম : নিমতলা শ্মশানে সৎকার করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃত দগ্ধ নরনারী।

কী মর্মান্তিক ! মানুষের জীবন আর আয়ু নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এমন দিন আর বুঝি আসেনি। তফাত কোথায় ওই মৃত পতঙ্গ আর এই মানুষে। মৃত্যুর চক্র তাদের আকর্ষণ করেছে। ওরা মরবে ; হয় সর্বনাশা ঝড়ে না-হয় উৎসব-মুখর আসরে দায়িত্বহীনদের জন্যে আগুনে পুড়ে। কিংবা বোমা বারুদে।

তারপর—?

তারপর আর কি ? গিরিজাপতি না তাকিয়েও দেখতে পেলেন মনে মনে চৌকাটের সামনে থেকে উমা যেমন ভাবে সব ক'টি মৃত দেওয়ালী পোকা তুলে নিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে রেখে গেছে—তেমনি মেদিনীপুর আর হালসীবাগানের সমস্ত শব একদিন পরিষ্কার হয়ে যাবে, জল মাটি আগুন এই নরমেধের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে দেবে।

ভেতরে ভেতরে অদ্ভুত এক জ্বালা বেদনা আর উত্তেজনা অনুভব করছিলেন গিরিজাপতি। যেন নিজের অসহায়তার ওপর গ্লানি আর ঘৃণা জন্মছিল। কিছু কি করার নেই ? কিছুই কি না ?

না, কিছুই না। নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকা আর অহেতুক গ্লানি বোধ ছাড়া তিনি আর কি করতে পারেন !

কী অদ্ভুত প্রজাশাসন ! ষোলোই অক্টোবর—সপ্তমী পুজোর রাত্রে চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, মেদিনীপুরের দক্ষিণ ঘেঁষে যে প্রচণ্ড সাইক্লোন বয়ে গেল তার খবরটুকু পর্যন্ত দেশের মানুষকে পনেরো দিনের আগে জানতে দেওয়া হল না ; রাতারাতি অর্ডিনান্স করে সমস্ত কাগজে এই ঝড়ের খবর ছাপা বন্ধ করে দেওয়া হল। কেন ?

এ কেন-র জবাব নেই। জবাব নেই—এই গোপনতার যথার্থ কারণ কোথায় ? হিসেব নেই কত মানুষ মরেছে, কত পশু, কত গ্রাম ধুয়ে গেছে, কত গৃহস্থ গৃহহারা হয়েছে ! বৃষ্টি আর ঝড় আর সমুদ্রের জলে ধুয়ে যাওয়া

আশ্রয়হীন অন্নহীন মানুষকে কতটুকু সাহায্য বিলোন হচ্ছে তার পর্যন্ত নিশ্চিত কোন খবর নেই। ইদানীংকার সরকারী খবর থেকে অনুমান করা যাচ্ছে, দশ পনেরো হাজার মানুষ মরেছে শুধু মেদিনীপুরেই, বেসরকারী হিসেবে তিনগুণ প্রায়! চব্বিশ পরগণায় হাজার দুই। আট দশ লক্ষ বাড়ি ঘর নিশ্চিহ্ন, পনেরো বিশ লক্ষ লোক গৃহহান। ঘাটাল, তমলুক কাঁথিতেই শুধু দেড় লক্ষ গরু মোষ মরেছে।...এ-সবই মোটামুটি অনুমান; পরে আস্তে আস্তে আরও কিছু প্রকাশ পাবে। রিলিফের লোকজনের কাছে। তারা সবেই যাওয়া শুরু করেছে।

গিরিজাপতির ইচ্ছে হয়েছিল, রিলিফের সঙ্গে একবার ঘুরে আসেন। হল না যাওয়া। এখন পরের দায়িত্ব ঘাড়ে চেপেছে। চাকরি করছেন। স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে পড়তে হয়। আমহার্স্ট স্ট্রীটে মিহিরের প্রেস। মাঝারি ছাপাখানা। এখন কাজকর্ম বাড়ছে। গভর্নমেণ্টের কিছু কাজ পেয়েছে মিহির। তার কারবারে দু' পয়সা আসছে। গিরিজা-পতি মাস দেড়েক হল সেখানে চাকরি করছেন। অনেকটা ম্যানেজারী আর কি! মিহির আজও তেমনি শ্রদ্ধা আর প্রীতির সম্পর্ক রেখেছে।

বহুকালের পুরনো বন্ধুদে দু' একজন এই কলকাতায় আজও গিরিজাপতিকে মনে রেখেছিল। সতীশের সঙ্গে দেখা করলেন গিরিজাপতি। তারপর একদিন সতীশ গিরিজাপতিকে নিয়ে মিহিরের কাছে হাজির। প্রথমটায় চিনতে পারে নি মিহির। সতীশ বলে দেওয়া সত্ত্বেও। সে-ঘরে আর কেউ ছিল না।

মিহিরের যেন বিশ্বাস করতে বাধছিল। অসীম বিস্ময়ে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে মিহির তাকিয়ে থাকল গিরিজাপতির দিকে। অনেকক্ষণ। তারপর বলল, 'একেবারেই চেনা যায় না।'

দু-পাঁচটা সাধারণ কথার পর সতীশ বলল, তোমার প্রেসের দেখাশোনার জন্যে লোক দরকার বলেছিলে একবার, 'গিরিজাকে নিয়ে এলুম। ওরও একটা রোজগারের উপায় দরকার। তোমারও ত বিশ্বাসী লোক চাই।'

বেচারী মিহির লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি বললে, 'আরে, তুমি কি যে

বলো সতীশদা—তোমার সুপারিশ ছাড়াও যদি গিরিজাদা—' মিহিরের মুখে নামটা আটকে গেল, আড়ষ্ট হয়ে একটু থেমে গেল যেন, তারপর সহজ করে নিল আবার মিহির, বললে, 'গিরিজাদা যদি নিজেই আসতেন—আমি কি কিছু তাঁর জন্যে করতাম না ?'

এরপরও সতীশ ক'টা কথা বলল মিহিরকে। তেমনি নিচু গলায় অকৃত্রিম বন্ধুত্বের গভীর বিশ্বাস আর দাবীতে। মিহির স্থির শান্ত মুখে সব শুনল। মনে হল, আর তাকে বোঝাবার কিছু নেই। কিছুই না।

চা আনাল মিহির, খাবার। সতীশ আজও তেমনি খেতে পারে। তেমনি পেটুক। তবু তার অনুশোচনা, বয়স হয়ে গেছে, ডায়বেটিসের রুগী, অনেক সংযম অভ্যাস করতে হয়েছে খাওয়ার ব্যাপারে—সেই খেদ করল বার বার।

বিবেকানন্দ রোডের কাছাকাছি কর্নওআলিস স্ট্রীটের ডানহাতি এক চাপা গলির মধ্যে সতীশের আস্তানা। মাথার ওপর ছাদ পড়-পড় একটি ঘরে তার কাগজের অফিস 'দেশবাণী'। চটি মতন মাসিক পত্রিকা। পুরনো ভাঙা আলমারি, চেয়ার বেঞ্চি, টেবিল—ধুলো আর চুরুট বিড়ির ধোঁয়া, পুরণো উঁই-কাটা কাগজের ডাঁই, বদ্ধ বাতাস, ভ্যাপসা গন্ধ। একহাতের একটা জানালা। সারাদিন বাতি জ্বলে ঘরে। সতীশ থাক না থাক—ঘরে লোক থাকে, হয় বিরাজবাবু না হয় বংশী। ঘরের আর এক পাশে এক টেবিলে 'সূচীশিল্প' আর 'উলের কাজ' নিয়ে বসে থাকে এক বৃদ্ধ। 'দেশবাণী'র ঘরের শরিক। সতীশের ভাষায়, নারী বিভাগ। 'দেশবাণী' কাগজটা কিন্তু ভাল। চটক নেই, চরিত্র আছে। মোটামুটি বিক্রি হয়। ধরা বাঁধা কিছু গ্রাহক, কিছু পাঠক। সতীশের আপ্রাণ চেষ্টায় চলছে।

সে-দিনও গিয়েছিলেন গিরিজাপতি সতীশের সঙ্গে দেখা করতে। দেখা হয়নি। কলকাতায় নেই সতীশ। খড়গপুর গেছে। শীঘ্রি ফিরবে।

সতীশ ফিরে এলে কাঁথি তমলুকের খবর আরও কিছু জানা যাবে।

উমা এসে আর এক পেয়ালা চা রেখে গেল। বাজার সেরে ফিরে এসে নিখিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। তার গলাও এক সময় থেমে গেল

আরতির কথাবার্তা মাঝে মাঝে কানে আসছিল। কখনও নিচে এসে কিছু বলছে, কখনও ওপর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। উমার জবাব। কাক ডাকছে কোথায়। গলির মধ্যে একটা ভিখিরি গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে।

মেদিনীপুরের সাইক্লোন, হালসী বাগান, কৃষ্ণনগর আর বিহারে এরোপ্লেন থেকে মেশিনগানের গুলি চালানো, দেশময় পাইকারী জরিমানা··· গিরিজাপতির মনের এলোমেলো অন্যমনস্ক ভাবটা আস্তে আস্তে আবার গুছিয়ে উঠল। চিন্তার শৃঙ্খলা ফিরে এল স্বাভাবিক হয়ে। কাগজে মন দিলেন।

কখন এক সময় সুধা এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। গিরিজাপতির খেয়াল হতেই চোখ তুললেন। 'কি, কাগজ চাই নাকি?'

সুধা মাথা নাড়ল। না।

আজকাল সুধারও কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গেছে কাগজের ওপর চোখ বোলানো। অবশ্য এর জন্যে তার তাড়াহুড়ো কখনও থাকে না; সকাল হোক, সন্ধ্যেতে হোক—একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। সব খবর পড়ে না; আগ্রহ অনুভব করে না। তেমন তেমন কিছু চোখে পড়লে পড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সুধাও বুঝতে পারে না—আসাম-টাসামের দিকে জাপানীরা এগিয়ে এল কি না-এল, তার খবর সে সযত্নে কেন খোঁজে। সুচারু কোথায়, সুধা জানে না। শেষ চিঠি এসেছে তাও পুজোর পর। ওর চিঠিগুলো কেমন ধরনের। অদ্ভুত রকমের এক ঠিকানা, নাম থাকলেও ধাম-টাম থাকে না। সাঙ্কেতিক অক্ষর। ···তবু সুধার কেন যে ধারণা, সুচারু আসাম-টাসামের দিকে কোথাও আছে।

কাগজের জন্যে সুধা আসেনি। অন্য প্রয়োজন আছে।

অল্পক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে সুধা কেমন সঙ্কোচের সঙ্গে মৃদু গলায় বলল, 'আমাকে একটা অ্যাপলিকেশন লিখে দিতে হবে, কাকাবাবু।'

'অ্যাপলিকেশন? কিসের—? ছুটির?' গিরিজাপতি স্নেহমধুর চোখে তাকালেন।

'না, ছুটির নয়।' সুধা ইতস্তত করল, 'চাকরির।'

'এ-চাকরি কি হল? ছেড়ে দিচ্ছ?' গিরিজাপতি বিস্মিত হলেন।

'ছাড়িনি, ছাড়ছি না।' সুধা ঘাড় উঁচু করল সামান্য, 'ফুড্‌সাপ্লায়ের একটা অফিস হয়েছে। ওই যে চিনির ক'টা দোকান হল গভর্নমেণ্টের—সে ওদের ব্যবস্থায়। অফিসটা শুনলাম অনেক বাড়বে। অফিসে অমলাদি বলছিল। ঠিকানা দিয়ে দিয়েছে আমায়।' একটু থেমে আবার বলল সুধা, 'একটা অ্যাপলিকেশন পাঠিয়ে দি। যদি হয়—।'

কথা বললেন না গিরিজাপতি। আস্তে করে মাথা নাড়লেন। যার অর্থ, তা ঠিক। বললেন, 'এই ব্যাপার। তা তুমি নিখিলকে বললেই পারতে, এতক্ষণ লিখে ফেলত। আমি প্রেস থেকে আসার সময় টাইপ করিয়ে আনতাম।'

সুধা মুশকিলে পড়ল। অ্যাপলিকেশনের ব্যাপারটা জরুরী হলেও এত জরুরী নয় যে, আজই এখুনি সেটা লিখিয়ে নিতে হবে নিখিলের কাছ থেকে। আর নিখিলের কাছে যাবে না (কেন যাবে না তার কোনো কারণ নেই। নিখিলের কথা সুধারও মনে না হয়েছিল এমন নয় তবু ও গিরিজাপতির কাছেই এসেছে) বলেই এখানে আসা। 'আজ থাক্। আটটা বেজে গেছে। আমায় একটু তাড়াতাড়ি অফিস যেতে হবে।' সুধা যতদূর সম্ভব গলার স্বরে ব্যস্ততা ফুটোতে চাইল।

ঘর ছেড়ে চলে গেল সুধা।

গিরিজাপতি কাগজের পাতা উলটে নিলেন। জানলার ওপর দিয়ে এক ঝলক রোদ এতক্ষণে ঘরে এসে ঢুকেছে।

আট

শীতের সকাল। কনকনে হাড় কাঁপানো না হলেও, বেশ শীত। সারা রাতের হিমে ঘরবাড়ি ছাদ পাঁচিল খোলা উঠোন ভিজেছে। বাতাসে এখনও আর্দ্রতা। সকালের কুয়াশা আর ধোঁয়া ভাল করে কাটে নি। সূর্য উঠেছে। রোদটুকু গায়ে লাগার মতন নয়।

এত সকালেই গৌরাঙ্গ এ-বাড়িতে হাজির; বাসু তখনও ঘুমোচ্ছে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে তার ঘুম ভাঙাতে হল।

হাই তুলতে তুলতে দোর খুলে দিল বাসু। সামনে গৌরাঙ্গকে দেখবে এই সকালে, ভাবেনি। অবাক হয়ে বলল, 'কি রে?'

ঘরে ঢুকে পড়েছে গৌরাঙ্গ। বলল, 'লে, তাড়াতাড়ি দু'সের চিনি ছাড় ত।' কথাটা শেষ করে গৌরাঙ্গ ঘরের এদিক ওদিক তাকাল। জানলার একটা পাট খোলা। বাসুর বিছানার ত্যাতা ময়লা চাদর আর সালু ছেঁড়া পেঁজা পেঁজা লেপটার দিকেও চোখ পড়ল তার। ঝুল-কালো দেওয়াল; ছেঁড়াপাতা ক্যালেণ্ডার। তেমন ভাল লাগল না। যে-কথা ক'মুহূর্ত্ত আগে শেষ করেছে, আবার তার খেই ধরে বলল, 'বাড়িতে আজ কিসের পুজো-টুজো আছে। মামা মামি দিদির নেমন্তন্ন। পায়েস-টায়েস করবে বোধ হয়। কাল রাত থেকেই মা চিনি চিনি করছে।' আবার একটু থেমে বাসুর দিকে চেয়ে কেমন এক ধরনের হাসি হাসল গৌরাঙ্গ, 'ফার্স্ট তোর কাছে চলে এলুম বাবা। কে জানে শালা, বেলা হলে সব হাবিশ হয়ে যায়। লে, তাড়াতাড়ি দে।'

বাসুর শীত শীত করছিল। একটা ছেঁড়া চিট থান দু-পাট করে পরে শোয়। খুঁট নেই; থাকলে গায়ে দেওয়া চলত। এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু না পেয়ে সোয়েটারটাই গায়ে গলিয়ে দিল বাসু।

'দু' সের চিনি আমার কাছে নেই এখন।' বাসু বিরাট হাই তুলে

আড়মোড়া ভাঙল। গৌরাঙ্গর দিকে চেয়ে বলল আবার, 'সের খানেক এখন নিয়ে যা ; ওবেলা বাকিটা ব্যবস্থা করে দেবো'খন।'

'এই সকালে বাসিমুখে পট্টী দিচ্ছিস? তোর কাছে শালা ছ'সের চিনি নেই?' গৌরাঙ্গ বাসুর দিকে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে থাকল।

'মাইরি না। তোরে তোর সঙ্গে মিথ্যে বলছি?'

'কত আছে?'

'সের দেড়েক। কাল চার সেরটাক নিয়েছিলাম। দেড় সের হাতে হাতেই ফিনিশ হয়ে গেল।'

'তবে দেড় সেরই দে। বিকেলে আরও আধসের দিয়ে দিস।'

গৌরাঙ্গ ঘরের এককোণে রাখা ভাঙা মরচে ধরা টিনের সুটকেস থেকে একটা ঠোঙা বের করে নিয়ে এল। বলল, 'একসের আছে। খাঁটি ওজন। নিয়ে যা।'

'কেন, দেড় সের দে।' গৌরাঙ্গ পকেট থেকে পয়সা বের করে গুণছিল, গোণা বন্ধ রেখে বাসুর দিকে তাকাল।

'না ; বাকি আধসের অন্য একজনকে দিতে হবে।'

'যা বে যা ; অন্য একজনকে—।' কথাটা কানেই তুলল না গৌরাঙ্গ। 'তুই শালা আজ কাল বড্ড এথি চিনেছিস। ছ' আনার চিনি দশ আনায় ঝাড়ছিস, তার ওপরও আবার একে নয়, তাকে ; নীলাম হাঁকছিস নাকি?' গৌরাঙ্গ পয়সাটা এবার গুণে ফেলল। 'নে, ন' আনা করে দেড় সের তের আনা।'

বাসু হাত বাড়িয়ে পয়সা নিল না ; চিনির ঠোঙাও দিল না। বলল, 'ন' আনা কি বে? তোর টুনুমামার সুগার ফ্যাক্টরি থেকে চিনি বেরয় নাকি?'

গৌরাঙ্গ একটু যেন অপ্রতিভ' হল। ঠিক যে কি বলবে বুঝতে পারল না। 'ত' কত করে!'

'দু-পয়সা করে ছাড়ছি। সাড়ে এগারো আনা করে দে।' বাসু বন্ধুর জন্যে দু-পয়সা করে লোকসান দিচ্ছে—এটা যে সামান্য কিছু নয়—গলার সুরে এবং মুখের ভাবে তা যথা সম্ভব স্পষ্ট করতে চাইছিল।

'ন' আনা করেই দিতিস আগে।'

'সে কবে—! কালী পুজোরও আগে। গত হপ্তায় দশ আনা করে নিয়েছিস।'

সকালে আর কথা বাড়াতে ভাল লাগছিল না গৌরাঙ্গর। এখনও চা খাওয়া হয় নি। ঘুম থেকে উঠেই ছুটে আসছে। বললে, 'বেশ, দশ আনা করেই দে। নে পনেরো আনা।'

বাসু গৌরাঙ্গর হাত থেকে সাড়ে দশ আনা তুলে নিল। ঠোঙাটা এগিয়ে দিল। বলল, 'দুপুরে আর একসের তোর বাড়িতে দিয়ে আসব। বিকেলে শালা বাকি চিনির দাম কিন্তু দিয়ে দিবি।'

'সাড়ে দশ আনাই নিলি ?'

'আমার বাবা ত গবরমেণ্টের চিনি বিক্রি করছে না।'

'তুই এক নম্বরের হারামি হয়ে গেছিস বাসু। একেবারে মাড়োয়ারী।'

'ও, তুই বুঝি রমেকেষ্ট হয়েছিস। দিস না—আজই যাব তোর জি পি ও-তে। এক আনার স্ট্যাম্প দু'পয়সায় দিস আমায়।'

'স্ট্যাম্প আমার বাবার সম্পত্তি নয় !'

'চিনিও আমার বাবার আড়তের নয়।' বাসু প্রায় ধমকে উঠল, 'জানিস, আমার নিজের বাড়িতে পর্যন্ত আমি চিনি দিই না। কখনো সখনো দু'চার চামচে ছাড়া। কেউ জানেই না আমি চিনি বিক্রি করি।'

'জেঠিমা জানে না ?'

'না।'

'তোর দিদি ?'

'নো। আরতি শুধু জানে।'

'তবে—?' গৌরাঙ্গ এতক্ষণে সুটকেসে চিনির ঠোঙা লুকিয়ে রাখার তাৎপর্যটা যেন বুঝতে পারল। কিন্তু ভাবল, বাসু যে দু'চার চামচে চিনি বাড়িতে দেয় বলল, তা কি করে দেয়। 'তবে—ওই দু'চার চামচে চিনি যে দিস কখনো সখনো। কি বলে দিস ?'

'সে কাগজে মুড়ে পুরিয়া করে। বলি, কিনে এনেছি।' গৌরাঙ্গ তার

নিজের কায়দায় একটু হাসল। 'বিজনেস্ ইজ বিজনেস্; নো ফ্রেণ্ড, নাথিং। বুঝলি রে!'

গৌরাঙ্গ-র যেন আর বোঝার কিছু বাকি ছিল না। চনির ঠোঙার মাথার কাগজের কোণা তুমড়ে ঢাকা দিতে দিতে বলল, 'বাকি আধসের কাকে ঝাড়বি রে? বারো আনা তেরো আনা করে নাকি?'

বাসু আঙুল দিয়ে পায়ের তলায় নীচের দিকে ইশারা করলে। হঠাৎ একটু হেসে বলল, 'আরতিকে দিয়ে বলেছে মেয়েটা। ওআর্ড দিয়েছি। দেখ্ না একটু পরেই এল বলে।'

গৌরাঙ্গ অল্পক্ষণ পরম বিস্ময়ে এবং ক্ষোভে বন্ধুর দিকে চেয়ে থাকল। তারপর ভীষণ অভিমানে বলল, 'ও শালা—আমি তোমার ফ্রেণ্ড, আমায় হাঁকিয়ে দিয়ে নীচের মেয়েকে চিনি দিচ্ছ। আচ্ছা, জানা থাকল। আমিও—' গৌরাঙ্গ আর কথা খুঁজে পেল না।

রাগ করে চলেই যাচ্ছিল গৌরাঙ্গ। বাসু তার গায়ের র‍্যাপারটা ধরে ফেলল। 'মেয়েমানুষের মতন কোমর ঘুরিয়ে চললি যে। ওআর্ড দিয়েছি মেয়েটাকে বললাম না। মরদ কা বাত। তোকে ত দুপুরেই এনে দেব বলেছি।'

বেশ চটেছে গৌরাঙ্গ। চোখ দুটো কুঁচকে উঠেছে। কেমন এক ধরনের হিংস্র গলায় বলল, 'যা যা—তোর ওআর্ড আমার জানা আছে। বললে ত শালা এখন ফ্রেণ্ডশিপ ব্রেক্ হয়ে যাবে। কে তোকে এই চিনি কেনার পয়সা দিয়েছিল প্রথমে, এই গৌরে না তোর নীচের তলার উমা?'

বাসু প্রায় জোর করে গৌরাঙ্গর মুখ চেপে ধরল। 'কি চেল্লাচ্ছিস, মা দিদি সব বাইরে। শুনতে পেলে—' বাসু কেমন যেন বিব্রত, বিচলিত বোধ করছিল।

গৌরাঙ্গ থামল। বাসুর দিকে এক পলক চেয়ে র‍্যাপারেই মুখ মুছে নিল।

সামান্য একটু চুপচাপ। বাসুই বলল শেষে, 'তুই বাড়িতে চিনিটা রেখে বড়ুয়ার চায়ের দোকানে যা। আমি মুখটুখ ধুয়ে যাচ্ছি।'

'চায়ের পয়সা কে দেবে?' গৌরাঙ্গ অপ্রসন্ন তখনও।

'তুই। তুই চাকরি করছিস আজকাল। চায়ের দাম তুই দিবি।

'ও, আর তুমি যে বিজনেস করছ, গলাকাটা জোচ্চোর শালা।'

'আমি তোকে টোস্ট খাওয়াব।' বাসু হেসে ফেলল। তারপর গৌরাঙ্গর গলা জড়িয়ে একটু কাছে টেনে নিল। মৃদু গলায় বলল, 'তোর রোজগার বেশি, তুই বেশি দিবি। আমার কম, আমি কম দেব। সোজা কথা।' গৌরাঙ্গর গলায় বোধ হয় লাগছিল। ছাড়িয়ে নিতে চাইল। বাসু ছাড়ল না। আগের মতনই খাটো সুরে বলল আবার, 'কাল রাত্রে একটা ফাস্ট্ কেলাস্ স্বপ্ন দেখলুম রে। মীনুদি সাঁতার কাটছে কলেজ স্কোয়ারে। আমি আবার উমাকে সাঁতার শেখাচ্ছি,—সেখানেই। অনেক আছে—বুঝলি—সে অনেক। বলবো তোকে।' চোখে মুখে কেমন এক লোভের হাসি ফুটে টলমল করতে লাগল বাসুর।

গৌরাঙ্গর গলা ছেড়ে দিল বাসু।

গৌরাঙ্গ র‍্যাপারের তলায় চিনির ঠোঙা আড়াল করে চলে গেল। যাবার আগে বলল, 'তাড়াতাড়ি আসবি দোকানে। আমি বসে থাকতে পারব না বেশিক্ষণ।' গলার স্বরটা গৌরাঙ্গর তবু খুব প্রসন্ন মনে হল না।

গৌরাঙ্গ চলে যাবার পর অল্পক্ষণের মধ্যে বাসু হাত মুখ ধুয়ে এসে তৈরি। গায়ে শার্ট চাপাল। ছেঁড়া কুটি কুটি দু'পাট্টা থানটা একপাশে দড়ির ওপর ছুঁড়ে রেখে দিয়েছে; এখন একটা নীল রঙের লুঙ্গি পরনে।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বাসু ডাকল আরতিকে।

আরতি যখন এল, বাসুর তখন বাইরে বেরুনোর অপেক্ষা শুধু। মাঝে মাঝে শিস দিচ্ছে আর ওলটানো চুলের তলায় তার লম্বা কপালটা দেওয়ালে ঝুলোনো আয়নায় পরখ করছে।

কলাই করা মগে চা নিয়ে আরতি এল। মুখখানা গম্ভীর। কেমন যেন বিরস বিরূপ। বাসুর সামনে ভাঙা টেবিলটার ওপর চা রেখে দিয়ে বলল, 'ডাকছিলে কেন?'

'কি রে, তোর উমাদি চিনি নেবে না?' বাসু টেবিলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চায়ের পাত্রটা হাতে তুলে নিল।

'নেবে না কেন? দাও, দিয়ে আসি।'

'পয়সা দিয়েছে?'

'না। কত পয়সা বল—এনে দিচ্ছি।' একটু হেসে দাঁড়াল আরতি। অন্য পাশে ঘাড় ফিরিয়ে।

'কত পয়সা, তোর উমাদি জানে না?'

মাথা নাড়ল আরতি। না, জানে না।

'ন্যাকা!' বাসু চায়ে চুমুক দিতে দিতে মুখের একটা বিস্বাদ ভঙ্গি করল, 'ওরা কত করে কেনে?'

'কি জানি।'

'ছ' আনা সাড়ে ছ' আনা করে গবরমেণ্টের দামে পেতে হচ্ছে না। ওদের বাড়িতে কার তেমন ক্ষমতা আছে সরকারী দোকান থেকে চিনি কিনে আনবে ছ' আনা করে। আমরাই বলে শালা টিলে হয়ে যাই।'

'নিখিলদা এনেছিল।'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ—জানি। একবার গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দোকানে। ঠায় দেড় ঘণ্টা। আমিই শেষে দয়া করে ঠেলেঠুলে পাইয়ে দিলাম।' বাসু চাটুকু পাচন গেলার মতন করে গিলে ফেলল। বিতিকিচ্ছি মুখভঙ্গি করে বলল, 'তোরা যা চা করিস না, ঘোড়ার পেচ্ছাপ। জিবে ঠেকালে বমি আসে।'

আরতি চুপ মুখে দাদার মুখ মেজাজ কথাবার্তার ভঙ্গি দেখছিল। বলল, 'কত পয়সা লাগবে বল, এনে দিচ্ছি। না হয় বল উমাদিকে ডাকছি। তুমিই দরদস্তুর কর।'

'কেন? আমি কি সেধে তাকে চিনি বিক্রি করতে যাচ্ছি।' বাসু ধমকে উঠল বোনকে। 'তুই বুঝি খুব চাউর করছিস এ-সব কথা। খবরদার, আরতি, মা দিদি যদি জানতে পারে—এ-বাড়ির অন্য কেউ, তোমার আমি ইয়ারকি বের করে দেব।'

দাদার মেজাজকে সব সময় অত্যন্ত বিনীত এবং ভীত ভাবে মান্য করে চলে আরতি। রাগ হোক, দুঃখ হোক কখনও মুখ ফুটে বলে না। অন্তত এতদিন বলে নি। সে-সাহস যেন তার ছিল না। আজকাল একটু একটু

হচ্ছে। হয়ত তেমন সাহসেই ভর দিয়ে বলল, 'আমার বয়ে গেছে বলতে। তা বলে কেউ যে জানেনা ভাবছ তাও নয়। মা জানে।'

বাসু বোনের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকাল। কিছুটা রুক্ষ ভাবেই। 'কি করে জানল মা?'

'তা আমি কি করে বলব?'

'তুই জানিস না? গাঁজা মারবার জায়গা পাস নি?'

'বলছি আমি জানি না, তবু চোটপাট করবে।' আরতির মুখ আরও কালো আর চোখ দু'টো ছলছলে হয়ে এল। 'তোমার কথা কে কি জানবে, কে কি বলবে সব ব্যাপারেই আরতি দায়ী। ঘর মোছা ন্যাতা ত আমি, যার যা হচ্ছে অমনি মুছে ছুঁড়ে দিচ্ছে। ঘেন্না জন্মে গেল জীবনে।'

আরতির বিরক্তি বিতৃষ্ণা এবং অভিমানের ভাবটা এত অকৃত্রিম আর স্পষ্ট যে বাসু বোনের মুখের দিকে খানিকটা বিমূঢ় খানিকটা বা কৌতূহলে চেয়ে থাকল। ঠিক এ-ভাবে আরতিকে কথা বলতে আগে খুব বেশি শুনেছে বলে মনে হল না। যতটা রুখে উঠেছিল বাসু একটু আগেই, কে জানে কেন —হঠাৎ ততটাই প্রায় মিইয়ে গেল।

'কি হয়েছে রে?' বাসু শুধোল।

আরতি কোন জবাব দিল না। মুখের কালিমা বা অসন্তোষ ভাবটাও কাটল না। জানলার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

'দিদি বুঝি কিছু বলেছে?' বাসু তার অনুমান মতন আবার বলল।

এবারও প্রথমটায় ঠোঁট বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল আরতি। তারপর যেন নীরব থাকতে না পেরেই বলল, 'বলতে কেই বা ছাড়ে। কিসে যে দোষ না হয় দিদির কাছে মা মঙ্গলচণ্ডীই জানে। আমার পা উনুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই ত উনুন ধরবে না; না আছে কয়লা, না কাঠ, ঘুঁটে কেরাসিন তেল। আমি কি করব? আঁচ ধরে নি। আবার করে আঁচ দিয়ে তবে ধরালাম। তাও উমাদির কাছ থেকে ঘুঁটে চেয়ে এনে। এতেই সকালে দিদির কাছে দশ কথা শুনলাম, মার কাছেও।' একটু থামল আরতি। চোখের পাতায় জল এসে পড়েছিল। মুছল। বলল, 'যেমন কপাল করে

এসেছি, অখাদ্যে ত, যমের অরুচি; বেঁটা পাখি ছাড়া আর কিছু জুটবেও না।’

আরতির ওপর সহানুভূতি না সুধার প্রতি আক্রোশ কি কারণে কে জানে, বাসু বলল, ‘দিদির খুব ফুটুনি বেড়ে গেছে, একটা চাকরি করে বলে ভাবছে সকলের মাথায় পা দিয়ে হাঁটবে। ও-সব বাবা আমার কাছে চলবে না। মেয়েছেলে মেয়েছেলের মতন থাকবে। অত রোয়াব কিসের?’ কথা বলতে বলতে বাসু ঘরের কোণ থেকে ভাঙা সুটকেস খুলে চিনির আরও একটা ঠোঙা বের করে আনল। ‘মা আস্কারা দিয়ে দিয়ে বড় মেয়েকে মাথায় তুলেছে। অত ভয় কিসের তোমার? খাওয়াচ্ছে বলে? অমন ফ্যানফ্যানে ভাত আর ডাল পুঁই চচ্চরি খাওয়াতে আমিও পারি।’

এরপর অল্প একটু চুপচাপ। শেষে বাসু চিনির ঠোঙাটা আরতির দিকে এগিয়ে দিল। ‘এটা তোর উমাদিকে দিয়ে আয়। পয়সাও এনে রাখবি। আমি একটু পরে আসছি। নেব।’

‘কতটা আছে কত দাম—তা বল?’

‘আধ সের। বাজারে এগারো আনার কম পাবে না।’ বাসু বোনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। কি ভাবল একটু, বলল, ‘এগারো আনা করে না দেয়, দশ আনা। বড়জোর ন’ আনা। সে তোর উমাদি বলেই। আর এই বারটাই শুধু। ন’ আনার কম দিতে চাইলে চিনি দিবি না, ফিরিয়ে আনবি। অত খাতির আমার নেই।’ শেষের দিকের কথাগুলো অনেকটা আরতিকে শাসানোর মতন শোনাল।

বাসু চলে যাচ্ছিল। আরতি বলল, ‘বাজার টাজার কিছু নেই, দাদা। যা হোক্ কিছু এনে না দিলে আবার কিন্তু কুরুক্ষেত্র বাধবে অফিসের ভাত নিয়ে।’

বাসু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে তাকাল। পকেট হাতড়ে পয়সাকড়ি মুঠোয় তুলে কি যেন দেখল, হিসেব করল। তারপর বললে, ‘থলিটা এনে দে চট্ করে।’

বড়ুয়ার চায়ের দোকানে বসে বসে গৌরাঙ্গ ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

একটা ডবল হাফ্ নিয়েছিল। তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিচ্ছিল। কাপও শেষ হয়ে গেল। সিগারেট কিনে আনল দু'টো। একটা সিগারেট কখন পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সকালের কাগজের একটা পাতা এ-টেবিল থেকে তুলে এনে, খানিক পরে অন্য একটা পাতা আর একজনের সঙ্গে বিনিময় করে স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধটা প্রায় পুরোই পড়ে ফেলল। আ, কী লড়াইটাই হচ্ছে ওখানে। একবার এ এগিয়ে আসে ত ও পিছু হঠে; আবার ও ঠেলে এগিয়ে আসে ত জার্মানরা হঠে যায়। আফ্রিকায় খালি দেখ মিত্রপক্ষ সৈন্যদলের তিউনিসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কবে থেকেই অগ্রসর হচ্ছে। রোজই বলে বারো মাইল, দশ মাইল। সে দশ বারো মাইল আর ফুরোচ্ছে না। জাপানীরা যেন ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

এ-দেশের খবরগুলোর ওপরেও একবার চোখ বুলিয়ে নিল গৌরাঙ্গ। শিলংয়ের দিকে কোথায় গাড়ি উলটে দিয়েছে, মেদিনীপুর জেলায় কেশপুর আর গোদাপিয়াশালে পোস্ট অফিস ডাকবাংলো লুঠ। চম্পারণে গুলী, পুলিসের সঙ্গে লড়াই। ঢাকায় ট্রেন ডাকাতি।

এলোমেলো ওপর ওপর খবরগুলো পড়ে কাগজটা অন্য টেবিলে ফেলে দিল গৌরাঙ্গ। বাসুর ওপর ভয়ঙ্কর চটেছে। আসছি বলে তাকে ঠেলে দিয়ে শালা এখনও হয়ত পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। পয়লা নম্বরের সেলফিশ। বাসু আজকাল বাস্তবিকই ভীষণ স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। এমন হলে গৌরাঙ্গর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ভেঙে যাবে। হ্যাঁ, যাবে। কেউ রুখতে পারবে না।

বলতে কি, আজকে বাসুর ব্যবহারে সত্যিই বড় লেগেছে গৌরাঙ্গর। নীচের তলার ওই বামন কদাকার মেয়েটা বড় হল, গৌরাঙ্গর চেয়েও! কেন, আধ সের চিনি উমাকে বিকেলে দেওয়া চলত না। ভুল হয়ে গেল শালা, তখন তখনই, সবটুকু চিনি ফেরত দিয়ে দিলে হত বাসুকে। গৌরাঙ্গর কি অন্য পথ ছিল না চিনি যোগাড়ের। বেশ হত, ফেরত দিয়ে দিলে, মুখের মতন জুতো হত।

গৌরাঙ্গ সামনে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকল। ট্রাম-রাস্তার এদিকে রোদ, ও-পাশটায় ছায়া। বাজারে যাচ্ছে আসছে মানুষ জন; ঝাঁকা মুটে। ট্রাম

চলে গেল, বাস। বাসগুলোর পেছনে আজকাল কি যে এক যন্তর লাগিয়েছে। পেট্রোল পায় না বলে, চারকোল গ্যাসে চালাচ্ছে। ক'টা কাক বাজারে ঢোকার সামনে রাস্তার ডাস্টবীনের কাছে ঝটাপটি করছে।

গৌরাঙ্গ উঠব উঠব করছে—এমন সময় বাসু এল।

'কি রে, তোর কোন রাজা বাদশার মুখ, যে ধুতে দেড় ঘণ্টা লেগে গেল।' বিরক্ত আর চটা গলায় গৌরাঙ্গ খেঁকিয়ে উঠল। 'দেড় ঘণ্টা ধরে এঁটে আছি। আমি আর বসতে পারব না, তুই বস—'

রাগ করে গৌরাঙ্গ উঠেই যাচ্ছিল, অন্তত সে-রকম এক ভাব করলে। বাধা দিল বাসু। বলল, 'তোর ত আজকাল চল্লিশ মিনিটে ঘণ্টা হয়। নে বোস, চা দিতে বল।' হাতের থলিটা খালি চেয়ারের ওপর ফেলে দিয়ে বাসু বসে পড়ল। 'কটা বেজেছে আর—আটটাও পুরো নয়।'

'হ্যাঁ, তোর জন্যে বসে আছে?' গৌরাঙ্গ রাস্তার দিকে অযথাই আঙুল দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ওই ত দেখনা ট্রামে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে ট্রামের ভিড় দেখার আগ্রহ অনুভব করল না বাসু। দোকানের বাচ্চা বয়গুলোর একটাকে ইশারায় ডাকল। কড়া-মিষ্টি দু কাপ চা, দুটো টোস্ট আনতে বলে গৌরাঙ্গর মুখোমুখি তাকাল। বলল, 'একটা চাকরি করছিস বলে তোর, গৌরে, বড় রোয়াব বেড়ে গেছে। খুব টাইম দেখাচ্ছিস। একেই ত শালা এখনকার আটটা মানে আগের সাতটা।'

'দেখাচ্ছি কি মুফত—টাইম মতন অফিস যেতে হবে না। ওটা কি আমার বাবার জমিদারি?'

'আরে নে; অত টাইম ছাড়িস না। তুই একলাই অফিস করছিস, আর কেউ করে না।' বাসু তার রেখে দেওয়া হাতের থলিটার দিকে ইঙ্গিত করল, 'ওই ত, দেখ না; বাজারের থলি। বাজারে করে ফিরব, রান্না হবে, দিদি খেয়ে দেয়ে অফিস যাবে।'

গৌরাঙ্গ আর জবাব দিল না। আটটা বেজে গেছে কি বাজে নি জানবার জন্যে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল, কার হাতে ঘড়ি আছে খুঁজছিল। এখন যারা আছে, কারও হাতে ঘড়ি নেই।

চা টোস্ট এল।

টোস্টে কামড় দিয়ে বাসু কি খেয়ালে কে জানে আচমকা বলল, 'তুই যে বলেছিলি তোর টুনুমামাকে বলবি? বলেছিস?'

মাথা নাড়ল গৌরাঙ্গ। না, বলে নি। বলে কোনো লাভ নেই। স্ট্যাম্প ভেণ্ডারের-ই হোক, কিংবা মেলব্যাগ কালেকশান হোক—যাই করুক না কেন, এ-সব চাকরির জন্যে কম করেও পাঁচশো টাকা জমা রাখতে হবে। বাসু কোথা থেকে পাঁচশো টাকা জমা দেবে? কাজেই টুনুমামাকে বলা বৃথা। গৌরাঙ্গ কিছুই তাই বলে নি।

'বলিস নি?' বাসু আবার শুধোল, চায়ে চুমুক দিয়ে, চোখ তুলে।

'না।' গৌরাঙ্গ টোস্টের একটা টুকরো নিয়ে বাকি টুকরোটা বাসুর প্লেটে তুলে দিল। 'আমি আর খাবো না, একটু পরেই ভাত খেতে হবে!'

'বললি না কেন তোর টুনুমামাকে? আর বুঝি দম নেই তোর মামার? এক শালা ভাগ্নেকে ঢুকোতেই খতম?' গৌরাঙ্গ সামান্য উপহাসের সুরেই বলল!

গৌরাঙ্গর সম্ভবত আত্মীয়-মর্যাদায় লাগল। জবাব দিল বিরস গলায়, 'টুনুমামা ত করতেই পারে, কিন্তু পাঁচশো টাকা যে জমা লাগবে? পারবি দিতে?'

'জমা, কেন?'

'বা, জমা লাগবে না। তুমি শালা যদি স্ট্যাম্প নিয়ে কেটে পড়, কিংবা ধরো মেল ব্যাগ কলেকশাম করাব সময় মনিঅর্ডারের টাকা নিয়ে হাওয়া মেরে গেলে। তখন?' গৌরাঙ্গ তার কথার এবং কাজের গুরুত্বটা পুরোপুরি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করল, 'তখন কোন্ বাঁট চুষবে ওরা!'

গৌরাঙ্গর কথা যেন বেশ মন দিয়ে শুনছিল বাসু। একটু ভাবল। তারপর বললে, 'তোরা সবাই পাঁচশো টাকা করে জমা দিয়েছিস?'

'সবাই নয়; টুনুমামার খাতিরে আমি পাঁচশো দিয়েছি, আর এক-জন আছে—ভুবন—সে লাহিড়ী মশাইয়ের শালার ছেলে। বাকি সব হাজার।'

'লাহিড়ী মশাইটা কোন মক্কেল রে?' বাসু পকেট থেকে দু'টো সিগারেট বের করে একটা ধরাল, একটা গৌরাঙ্গর দিকে ছুঁড়ে দিল।

'লাহিড়ী মশাই-ই তো কনট্রাকটার। ও-ই কনট্রাক্ট নিয়েছে জি, পি, ও-তে—স্ট্যাম্প বিক্রি আর মেল ব্যাগ কালেকশানের। গৌরাঙ্গ বাসুর দেওয়া চ্যাপ্টানো সিগারেট আঙুলে রগড়ে গোল করতে লাগল। 'লোকটার অঢেল টাকা মাইরি। তিন বছরের সাব কন্‌ট্রাক্টের জন্যেই নাকি দু'তিন হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছে।'

বাসু আর কিছু বলল না। বলার কোন আগ্রহ কৌতূহল কিছুই বোধ করছিল না। নেহাত যেন চাকরির কথাটা সময় কাটাবার জন্যেই তুলেছিল, কিংবা মুখে এসেছিল বলেই।

একটু চুপচাপ থেকে গৌরাঙ্গ বলল, 'এ-সব জায়গায় চাকরি পেলেও তুই ফ্যাসাদে পড়ে যেতিস।'

'কেন?'

'ও, অনেক সব আছে। ফল্‌স্ স্ট্যাম্প বিক্রি। আমাদের সঙ্গে পুরোন মাল ক'টা আছে—শালা ঠেলে ফল্‌স্ স্ট্যাম্প বিক্রি করে। কী বুকের পাটা মাইরি!' গৌরাঙ্গ ঝুটো ডাকটিকিট বিক্রি করে যারা তাদের চোখ মুখ হাত সাফাইয়ের কথা ভেবে অবাক হয়ে বলছিল।

বাসুও রীতিমত অবাক। গৌরাঙ্গর দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বলল, 'ফল্‌স্ স্ট্যাম্প আবার কিরে?'

'সে আছে সব। তুই বুঝবি না। ইউজ্‌ড্ স্ট্যাম্প—মানে যে ডাক-টিকিট খরচা হয়ে গেছে, পোস্টাফিসের সিল লেগে গেছে—সেগুলোই আবার বিক্রি করা।'

'ভাগ্‌ শালা, গুল? যারা টিকিট কেনে তারা অন্ধ কি না?' বাসু বিশ্বাসই করতে চাইল না।

'অন্ধ কি রে, তোর দশটা চশমা থাকলেও তুই ধরতে পারবি না, অ্যায়সা কায়দায় পোস্টাফিসের সিলের দাগ তুলে দেয়। আমরাই বুঝতে পারি না, ত পাবলিক।' গৌরাঙ্গ একটু থেমে ব্যাপারটা আরও ভাল করে

বোঝাবার চেষ্টা করল বন্ধুকে, 'আচ্ছা, আমি তোকে দেখাব একটা। আজই। কত সাহেবসুবো, আফিসের পিয়োন দারোয়ান আসে—পাঁচ সাত টাকার স্ট্যাম্প কিনতে। অত টাকার স্ট্যাম্পের ভেতর ভাল স্ট্যাম্প দিলি কিছু বেশি করে, বাকি ফল্‌স্‌ চালিয়ে দিলি টাকা খানেকের। কি আছে, একটা এক টাকার কিংবা চার আনা-আট আনার চার পাঁচটে চালাতে।'

বাসুর যেন বিশ্বাস হল এতক্ষণে। গৌরাঙ্গর মুখের দিকে বোকার মতন তাকিয়ে তাকিয়ে বলল, 'তোরা কি ছাপ-মারা স্ট্যাম্প ধুয়ে নিস ?'

'আমরা ধুই না। ও-সব আলাদা লোক আছে। তারা কি করে যেন ধোয়। তাদের কাছ থেকে কিনে নিতে হয় সস্তায়।'

'তুই ফলস স্ট্যাম্প ঝাড়িস না ?'

'পাগলা নাকি তুই ? একদম শালা নতুন চাকরি। ওই করতে গিয়ে চাকরি ত যাকই, তার ওপর পুলিস—, জেল।'

গৌরাঙ্গর ভীরুতা আর অক্ষমতা বাসুর মোটেই পছন্দ হল না। ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল, 'এমন চান্স্‌ পেয়ে তুই শালা থারটি রুপিজের ঘণ্টা মারছিস ! হ্যাত্‌—এক নম্বরের ভীতু তুই, একটা মাগী। বুঝলি !'

গৌরাঙ্গ ব্যস্ত ভাবে উঠে পড়ল। সাড়ে আটটা বেজে গেছে। চা টোস্টের পয়সা টেবিলে ফেলে দিয়ে বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে যেতে বলল। তারপর বাসুকে তাড়া দিল, 'বড্ড দেরি করে দিলি তুই। নে ওঠ্‌।'

রাস্তায় নেমে গৌরাঙ্গ বলল, 'কি রে তুই ত শালা আমার পয়সায় প্রেমসে চা-টোস্ট মারলি। স্বপ্নের কথা বললি না যে !'

'সন্ধ্যেতে বলবোখন।'

'আচ্ছা।' গৌরাঙ্গ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল, 'দুপুরে কিন্তু চিনি দিয়ে আসবি, তখন আবার অন্য কোন মেয়েছেলেকে ওআর্ড দিস না যেন !'

'বলেছি ত। কি এক কথা ঘেনর ঘেনর করিস।' বাসু বাজারের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল আবার, 'এই ত, বাজারটা বাড়িতে ফেলে দিয়ে চিনির দোকানে যাব।'

নয়

'কি হে, পাততাড়ি গুটোচ্ছ নাকি ?'

গলার স্বরে মাথা তুলে তাকালেন গিরিজাপতি। সামনে যে-মানুষটি দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখবার প্রত্যাশাই করেন নি। 'আরে তুমি, সতীশ! এসো এসো। বসো।'

সামনের চেয়ারটা টানলেন একটু, বসলেন না সতীশ; চেয়ারের পিঠে হাত রেখে ডানদিকের পার্টিশান-করা কামরাটার দিকে তাকালেন। 'অন্ধকার অন্ধকার লাগছে কেন, মিহির নেই ?'

'না। একটা কাজে বেরিয়েছে—ফেরেনি এখনও।'

'তুমিই বা বসে আছ কেন, উঠে পড়।'

'ওঠার তোড়জোড়ই করছি।' গিরিজাপতি হাসিমুখে বললেন, 'তারপর তোমার খবর কি ? খোঁজই পাওয়া যায় না যে।'

'মোল্লা না থাক মসজিদ ত ছিল ভাই।' সতীশ কৌতুক করে বললেন।

'তা ছিল। কিন্তু মসজিদ থেকে কোনো সঠিক খবর পেলাম না। শুনলাম তুমি কলকাতায় নেই।' গিরিজাপতিও মৃদুহাস্যে বললেন।

সতীশ কথাটা শুনলেন, মনোযোগ দিলেন বলে মনে হল না। খানিকটা অন্যমনস্ক, ব্যস্ত মনে হচ্ছিল তাঁকে। 'তোমার উঠতে দেরি হবে গিরিজা ?'

'না দেরির কিছুই নেই। এখুনি উঠতে পারি। কিন্তু তোমার অত তাড়া কিসের ? বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?'

'তাড়া আছে একটু। তুমি তাড়াতাড়ি নাও। সেরে ফেল চটপট।' চেয়ার টেনে বসলেন সতীশ।

বন্ধুর মুখের দিকে অল্প একটু তাকিয়ে গিরিজাপতি হাতের কাজগুলো গুছিয়ে টেবিল পরিষ্কার করতে বসলেন। আগেই খানিকটা গুছিয়ে

ফেলেছিলেন। বাকি যে-টুকু এবার তাতে মন দিলেন। পেপারওয়েট দিয়ে একটা সন্ত-ছাপা কাগজ চাপা দিয়ে রাখলেন। ভাউচারের খাতায় কার্বন গুঁজে ভাউচার লিখলেন। তারপর সতীশকে বললেন, 'একটু বসো, আমি প্রেসের মধ্যে থেকে ঘুরে আসছি।'

সতীশ বসে। পেপারওয়েট-চাপা ছাপা কাগজটা আগেই চোখে পড়েছিল। অল্প একটু সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন। মুখ ফেরালেন দেওয়ালের দিকে। পশ্চিমের জানলাটা খোলা। একপাশের শার্সি গুটোনো। এককোণে প্যাক করা এক-মানুষ উঁচু কাগজ। চারপাশটাই ঠাসা।

ভেতরে প্রেসের মেশিন চলছে, তার শব্দ ভেসে আসছিল। বাইরে কারা কথা বলছে। এ-সবেরই সঙ্গে সতীশ পরিচিত। কোনো কিছুই তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছিল না।

পকেট থেকে আঙুলের মতন একটা সরু চুরুট বের করে ধরিয়ে নিলেন। শুকনো কাশি গলায় লাগল। একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। চুরুট কিন্তু নিবিয়ে ফেললেন না। কাশির দমকটা কমে আসতেই আবার দাঁতে চেপে টানতে লাগলেন।

মানুষটি এই রকমই। কেমন এক ধরনের বেপরোয়া; একগুঁয়ে। চেহারার মধ্যে তার ছাপ আছে। গোলগাল, সামান্য খাটো চেহারা; রঙ কালোই প্রায়। মাথার চুল কিছু কিছু পেকেছে। গিরিজাপতি প্রায় সমবয়সী—সামান্য কিছু ছোট হতে পারেন। গোল মুখ। পাতলা চুল। সিঁথি করে চুল আঁচড়ানো। ছোট কপাল। কোথায় যেন একটা দৃঢ়তা আছে। নাকের ডগা টোল খাওয়া। মাংস ঢাকা ঢেউ তোলা চিবুক। গোঁফ আছে। চাপা ধরনের ঠোঁট। সমস্ত মুখের গঠনে মোটামুটি একটা সরলতার ভাব যেমন আছে, তেমনি এক ধরনের পৌরুষ; ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব মানুষকে সহসা আকর্ষণ করে না, দূরেও ঠেলে দেয় না। কিন্তু কৌতূহল জাগায়। অত্যন্ত স্বচ্ছ, উজ্জ্বল অথচ চঞ্চল চোখের দিকে তাকালে মনে হয়—মানুষটির মধ্যে আবেগের প্রতি স্বাভাবিক একটা বশ্যতা আছে। কথাবার্তা গাম্ভীর্যের মধ্যে কোথায় যেন তা তলিয়ে থাকে।

গিরিজাপতি কথা বলতে বলতে ঘরে এলেন। পিছনে তারাপদ। প্রেসের লোক। টেবিলের ওপর পেপারওয়েটে চাপা ছাপা-কাগজ, ভাউচার বই দেখিয়ে তারাপদকে বুঝিয়ে বললেন গিরিজাপতি, 'এই হ্যাণ্ডবিল। ট্রেডলে ছাপা হচ্ছে, শেষ হয়ে এল বলে। দু' হাজার—বুঝলে ত। ভদ্রলোক আজই নিতে আসবেন। গুনেটুনে নেবে। ভাউচার লেখা আছে সই করিয়ে নিও।' নিজের চেয়ারের পিঠ থেকে গাঢ় নস্যি-রঙের গরম শালটা, তুলে নিলেন গিরিজাপতি। গায়ে জড়ালেন।

'চলো সতীশ।' গিরিজাপতি জানলার কাছ থেকে হাতের লাঠিটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সতীশও।

রাস্তায় নেমে খানিকটা গলিপথ। তারপরই বড় রাস্তা, আমহার্স্ট স্ট্রীট। আমহার্স্ট স্ট্রীটে পা দিতেই শীতের কনকনে হাওয়ার ঝাপটা এসে গায়ে লাগল। গিরিজাপতি রাস্তার ও-পাশটায় তাকালেন—মানিকতলার দিকে। ঘন কুয়াশার সঙ্গে অন্ধকার। দূরে দূরে ঢাকা গ্যাস পোস্ট। আলো নেই বললেই চলে। একটা রিকশা চলে যাচ্ছে, ঠুনঠুন শব্দটা কানে পড়ে। রাস্তায় মানুষ জন কম। খুবই কম। কেমন যেন আচ্ছন্ন আবহাওয়া।

'সাড়ে ছ'টা বেজেছে—এর মধ্যেই কী অন্ধকার দেখছ।' গিরিজাপতি স্বগতোক্তির মতন বললেন। 'মনে হয় যেন কত রাত হয়ে গেছে।'

'ডিসেম্বরের অর্ধেকের ওপর হল, আবার কি, এখন পাঁচটার পরই সন্ধ্যে হয়ে যায়।' সতীশ তাঁর নিভন্ত চুরুট ধরাবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ে দেশলাই জ্বালালেন। মুখে ধোঁয়া এলে আবার হাঁটতে লাগলেন, বললেন, 'এই রাস্তাটা এমনিতেই ফাঁকা—তার ওপর কুয়াশা। খুব কুয়াশা হয়েছে আজ।'

'শীতই বা মন্দ কি।' গিরিজাপতি গায়ের চাদর কাঁধের দিকে আরও একটু ঘন করে নিলেন। 'কোন্ দিকে যাবে সতীশ?'

'তাই ভাবছি। তোমার সঙ্গে কটা কথা ছিল।'

গিরিজাপতি ঘাড় ঘুরিয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন। মুখ দেখা যায়, ভাবভঙ্গিমা চোখে পড়ে না। 'তবে আমার ওখানে চলো।' বললেন গিরিজাপতি।

'তাই চলো। যাবো যাবো করেও তোমার ওখানে যাওয়া হল না।'

'তবে নাও রাস্তা পেরোও। সোজা হাঁটি। একেবারে ঠনঠনিয়ার পক্ষে ট্রাম ধরা যাবে।'

রাস্তা পেরিয়ে—সিটি কলেজের পাশ দিয়ে ঠনঠনিয়ার দিকে এগুতে লাগলেন দুই বন্ধু।

'তোমরা বুঝি খুব জলসা নাচগান হৈ-হল্লার হ্যাণ্ডবিল ছাপছ আজকাল?' সতীশ সহসা শুধোলেন।

'দেখলে বুঝি। হ্যাঁ, খুব না হলেও দু একটা ছেপেছি।' একটু আগে তাঁর টেবিলে যে ছাপা-কাগজে চাপা দিয়ে এসেছেন, যার ভাউচার লিখেছেন সেই কাগজের লেখাগুলো এলোমেলো ভাবে মনে পড়ল গিরিজাপতির: "মেদিনীপুর দুর্গত নরনারীর সাহায্যার্থে চ্যারিটি শো"..."সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ফ্রেণ্ডস ক্লাব কর্তৃক নাটকাভিনয়" "বিখ্যাত শিল্পীদের গান।"

'এই সব জলসা নাচগান থেকে ক'টা পয়সা হয়, গিরিজা?' সতীশ কতকটা আপনমনেই বললেন।

গিরিজাপতি জবাব দিলেন না। সব কথার জবাব দেবার প্রয়োজন হয় না। চুপচাপ কিছুটা পথ এগিয়ে এলেন দু-জনে। সতীশের চুরুটে ধোঁয়া উঠছে না। হয়ত নিভে গেছে। এ-রাস্তা অত ফাঁকা নয়।

পথ হাঁটতে হাঁটতে সতীশ বললেন আবার, 'যারা মরবার তারা মরে বাঁচল যারা বেঁচে আছে তারা এখন মরছে। কলেরায় বসন্তে; দুর্ভিক্ষে উপোস করে শুকিয়ে।' সতীশের গলার স্বর না করুণ, না আবেগবিহ্বল। কোনওও ঠিক নয়। কেমন যেন কঠিন, তিক্ত, শুষ্ক।

গিরিজাপতি সহসা কোনো কথা বলতে পারলেন না। অন্ধকার-অস্পষ্ট পথে সঙ্গীর মুখের দিকে তাকালেন। 'তুমি বুঝি আবার ও-দিকেই গিয়েছিলে?'

সতীশ স্পষ্ট কোনো জবাব দিলেন না; বন্ধ ঠোঁট—একটা শব্দ শুধু শোনা গেল; ছোট ভারি শ্বাস-ধ্বনি; চুরুট মুখে তুলে টান দিলেন। ধোঁয়া এল না। খেয়াল হল, চুরুট আগেই নিভেছে। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

'এই যে সব রিলিফের দলটল গেল, খানিকটা সামলান গেল না? অবস্থা কি তেমনি আছে?' গিরিজাপতি শুধোলেন।

'কি সামলাবে—? কাদেরই বা সামলাবে? আর তুমি যদি সামলাতে চাও—তাও কি তোমাকে কাজ করতে দেওয়া হবে, ভেবেছ।' সতীশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন আবার, 'কি জানি ভাই, এখনও ত দেখলাম ন্যাংটো পুরুষ, ছেঁড়া ছোট কামিজ ফতুয়া পরা গামছা জড়ানো মেয়েছেলে। ঘুসো চিংড়ি তেঁতুল পাতা সেদ্ধ করে খাচ্ছে।' সতীশ মোটা অসরল গলায় বললেন। ক'মুহূর্ত থামলেন, মনের ভাবনা আবার গলায় এসে ধাক্কা দিল, 'এখানে এই শীত, ও-সব জায়গায় আরও কত বেশি। গায়ে চাবুক মারে। অথচ জানো গিরিজা, কম্বল কাঁথা দূরে থাক খানিক আগুন জ্বালিয়ে গা গরম করবে তারও উপায় নেই। এমন গ্রামও আমি দেখেছি কাঠ খড় গাছের পাতারও অকুলান।'

আবার নীরবতা। জুতোর শব্দ উঠছে। পাশাপাশি দুই সঙ্গী। রাস্তার ধার ঘেঁষে একটি মেয়ে স্বামীর হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছে। কোনদিকে চোখ নেই। ওরা হয়ত নিশ্চিন্ত, এই আবছা অন্ধকারে ওদের দিকে কারও চোখ পড়বে না। উত্তরের কনকনে হাওয়া এখানে আটকা পড়েছে—বাড়ির আড়ালে। এখানে বাতাসে স্নায়ু শীতল ঘ্রাণ নেই। 'মেদিনীপুরের ব্যাপারে গভর্নমেণ্টের অ্যাটিচিউড্ অত্যন্ত জঘন্য। ইনহিউম্যান।' এক দমক জ্বালা সতীশের গলা থেকে বেরিয়ে এল।

গিরিজাপতি বন্ধুর মুখের দিকে চাইলেন। 'কেন, তমলুক কাঁথি-টাঁথির গণ্ডগোলের জন্যে?'

'তাছাড়া আর কি হতে পারে। কিন্তু তাতেই কি ওদের দমানো যাবে?' সতীশের গলায় স্বর এবার বেশ রুক্ষ, অধৈর্য। এবং হয়ত ঈষৎ উত্তেজিত।

'এই সাইক্লোনের পরও? বরং এখন মরাল ব্রেক করার কথা।'

'মরাল ব্রেক!' রাস্তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন সতীশ। গিরিজাপতি তাঁকে ঠেলা দিলেন। হাঁটতে হাঁটতে এবার সতীশ বললেন, 'তুমি কিছু

জানো না গিরিজা, তাই এ-কথা বলতে পারলে। আমি বরং বলবো, নির্যাতনে ওরা আরও সবল হয়েছে। হ্যাঁ, একশোবার এ-কথা আমি বলবো।'

গিরিজাপতি সামান্য অস্বস্তি বোধ করছিলেন। সতীশের উত্তেজনার মুখে বোধ হয় কথাটা বলা বেঁফাস হয়ে গেছে। সামলে নেবার জন্যে বললেন, 'তুমি ত জানো সতীশ, সেন্সারের কৃপায় কাগজে কিছু বেরোয় না। ছিঁটে ফোঁটা খবর যাও বা কদাচিত ছাপা হয়—তা থেকে কিছু বোঝা যায় না। বরং উলটোটাই বোঝা যায়। দোষ আমাদের নয়। আমরা জানতে পাই না।'

'পাও না ; বাস্তবিকই পাও না।' সতীশ যেন কথাটা আরও স্পষ্ট করে বললেন মাথা ঝাঁকিয়ে, 'তোমরা বড় জোর দু-চারটে পোস্টাফিস লুট আর গুলিতে মরার খবর শুনেছো, তার বেশি নয়। কিন্তু ওরা অনেক বেশি করেছে, অনেক বেশি করবে।'

ট্রাম-রাস্তার কাছে এসে পড়েছে। একটা ট্রামও চলে গেল শ্যামবাজারের দিকে। বাস আসছে মনে হল, ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

গিরিজাপতি বলতে যাবেন, একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও, বাস আসছে বোধ হয়—কিন্তু তার আগেই সতীশ একটা রিক্শা দেখতে পেয়ে ডাকলেন।

'রিক্শাতেই যাবে যদি অযথা এদিকে হেঁটে এলে কেন? আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকেই আমরা রিকশা নিতে পারতাম'। গিরিজাপতি বিস্ময় বোধ করেন।

সতীশ কোনো জবাব দিলেন না। গিরিজাপতির পাশে উঠে বসলেন।

চলতি রিকশায় বসে অল্পক্ষণ চুপ করে থাকলেও সতীশ বেশিক্ষণ নীরব থাকলেন না। চাপা গলায় বললেন, 'আমরা আমাদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছি। দাঁড়াবো।'

রিক্শা জোরে ছুটতে পারছে না। ট্রাম আসছে, বাস যাচ্ছে, মাঝে মাঝে ট্যাক্সি। লোকজনও চলাচল করছে। ঝাপসা আলো আর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে সব কিছুর ওপর চোখ রেখে রেখে তবু যতটা জোরে পারে রিকশাটা যাচ্ছে। ঘন্টি বেজে চলেছে অনবরত। কখনো কখনো হাঁক দিচ্ছে। মেছুয়ার মোড়ের সামনে ঘোড়ার গাড়ির আস্তানায় কিসের যেন গণ্ডগোল

যেখেছে।' গিরিজাপতির কানে সতীশের অদ্ভুত গলার স্বরটা বাজছে। যেন কথাটা শেষ হল এই মাত্র।

এবার একটু বেশি আলো। কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। পুলিস টহল-গাড়ি চলে গেল শিয়ালদার দিকে। বইয়ের দোকানগুলো বন্ধ। মাথার ওপর প্লেনের শব্দ। ফুটপাথের ধার ঘেঁষে একটা ঠেলাগাড়ি দাঁড়িয়ে। মোড়ের ট্রাম-স্ট্যাণ্ডে কিছু লোক।

আবার রিকশাটা অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগল গিরিজাপতির। অন্ধকার কলেজ স্কোয়ার। গাছের মাথার ওপর কালো আকাশ। কুয়াশায় একাকার। ডান দিকে সেনেট হাউস থমথম স্তব্ধতা আর শূন্যতা মেখে দাঁড়িয়ে আছে। গিরিজাপতির মনে হচ্ছিল, রিকশা নয়—সতীশ—সতীশই যেন অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ছুটছে। সামনে কখনও একটু আলোর আভাস—কখনও অন্ধকার।

গিরিজাপতি ছুটন্ত রিকশার এলোমেলো গতি আর সামনের অস্পষ্টতাকে মনের চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছেন মনে হল। মনে হল, সতীশের সম্পর্কে যে-সন্দেহ তাঁর হয়েছে, তার এখনকার কথার পর আর তা সন্দেহ থাকছে না; সত্য হয়ে উঠেছে।···বন্ধুর মুখের দিকে না চেয়ে গিরিজাপতি ট্রাম লাইনের দিকে তাকালেন। কেন—তা তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন না। রিকশাঅলার পিঠকুঁজো চেহারার মাথা টপকে দৃষ্টি কিছুতেই সামনের রাস্তায় গিয়ে পড়ল না। আর চোখ দুটো চঞ্চল জলের ওপর ছায়াপড়া আলোর মতন অস্থির থেকে শেষে শান্ত হয়ে এল সতীশের পায়ের ওপর। এই পায়ের ওপর ও ভর দিয়ে দাঁড়াবার কথা ভাবছে। ঠিক কেন তা অবশ্য বুঝতে পারলেন না, চেষ্টাও করলেন না, তবে নিজের থেকেই মনে হল, ওই পা কি অত শক্ত!

মুখ তুলে সতীশের দিকে চাইলেন, ঘাড় ফিরিয়ে। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় কেমন যেন ক্লান্ত মুখ। তবু দৃঢ়তা আছে, ঈষৎ কাঠিন্যও।

'তুমি তাহলে এই মুভমেণ্টে যোগ দিলে···।' গিরিজাপতি অন্যমনস্ক ভাবে বললেন। মনে পড়ল, সতীশের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের কথা।

মাস চারেক আগে। সতীশ তখন নিঃসন্দেহ ছিল, এই আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে। তার ধারণা ছিল, বেশিদিন নয়—প্যাটেলের কথা মতন ঠিক এক হপ্তার মধ্যে না হোক্—মাস খানেক এ-রকম গণ্ডগোল চললে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট রফায় না এসে পারবে না। ভেতরের এত গণ্ডগোল, বাধা, ক্ষয়ক্ষতি অগ্রাহ্য করে ভারতবর্ষ থেকে যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়। 'মাথা ওদের নোয়াতেই হবে গিরিজা—' বলেছিল সতীশ। কিন্তু সময় যত পেরিয়ে যেতে লাগল, মাথা নোয়ানো দূরে থাক—মাথা কাটাবার পথ নিল—মীমাংসার রাস্তা ছেড়ে—ঠিক বিপরীত পথটাই—দমন আর নির্যাতনের—সতীশ ততই হতাশ আর অধীর হয়ে উঠতে লাগল। নিজের মুখেই সতীশ তখন বলেছে—'ঠিক মতন কাজ হচ্ছে না। তা না হলে এ হতেই পারে না। টোটাল, প্ল্যানড্ ডিস্টারবেনসেস দরকার; মারাত্মক ভাবে আঘাত করতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটাই বড় খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছে।'... পুজোর আগে থেকেই সতীশ তার দেশবাড়ি মেদিনীপুরের দিকে যাতায়াত শুরু করেছিল। তখনও গিরিজাপতি ঠিক বুঝতে পারেন নি। তারপর সাইক্লোন। সতীশ চলে গেল—ফিরল প্রায় সপ্তাহ তিন পরে। অল্প কিছুদিন থেকে আবার চলে গেল। সে-সময়েই গিরিজাপতি বুঝেছিলেন, শুধু পাশে দাঁড়িয়ে সহানুভূতি নিয়ে সতীশ আর এই আন্দোলনের গতিটা দেখতে রাজী নয়। হয়ত—মেদিনীপুরের ব্যাপারের পর এবং আরও পাঁচ কারণে চাপা আগুন বাতাস পেয়ে জ্বলে উঠেছে। হতে পারে, তার প্রত্যাশা সফল হয়ে উঠছে না দেখে সতীশ—স্বাভাবিক ভাবেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে, যা তার স্বভাব—বেশির ভাগ মানুষেরই। এ-ছাড়াও গিরিজাপতি অনুমান করতে পারছেন, সতীশের কর্মক্ষেত্রের বহু সঙ্গীর কেউ যখন জেলে, কেউ লুকিয়ে এই আন্দোলনের কাজ চালাচ্ছে—তখন তাদের প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ প্রভাব, তাদের প্রতি নীতির আনুগত্য, সহকর্মী সুলভ কর্তব্যবোধ সতীশের নিষ্ক্রিয়তাকে লজ্জা ও আঘাত না দিয়েছে এমন নয়। সতীশ তাই সরাসরি এবার কাজে নেমে গেছে।

'শেষ পর্যন্ত অ্যাকটিভলি তুমি যে এই মুভমেন্টে জয়েন করবে—

এ আমি আগেই ভেবেছিলাম।' গিরিজাপতি কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন।

'না নেমে পারলাম না—!' সতীশ থমথমে দ্বিধাহীন গলায় বললেন, 'এ আমার কর্তব্য। দেশের কাছে দলের কাছে। আমার লয়ালটি।'

স্পষ্ট সরল সহজ কথা। কোনো লুকোচুরি, অযথা কথার ঘোর প্যাঁচ নেই। গিরিজাপতি অনুভব করতে পারেন, সতীশ যা বলছে তার মধ্যে কোথাও মিথ্যে নেই। সতীশ একাই শুধু নয়—আরও অনেকে আছে—বহু—শত সহস্র—যারা ঠিক এই ভাবে ব্যাপারটা দেখতে অভ্যস্ত। তারা স্বদেশের প্রতি এক প্রগাঢ় তীব্র অনুভব নিয়ে থাকে। এ এক ধরনের মর্যাদা বোধ, অধিকার বোধ, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বোধ। 'আচ্ছা সতীশ, সত্যিই কি তোমাদের এ-ভাবে লড়বার ক্ষমতা আছে?'

'ক্ষমতা তুমি কাকে বলো?'

'এ-ক্ষেত্রে যোগ্যতা, আয়োজন?'

'সব রকম আয়োজন হয়ত নেই, যোগ্যতা আছে।' সতীশের গলার স্বর গাঢ়, চোখ শান্ত। মাথা ঝাঁকুনি দিলেন সতীশ, 'আমাদের মনুষ্যত্ব পৌরুষ সেখানে যেখানে আমরা চেষ্টা করি পীড়ন থেকে বাঁচবার; অন্যকে বাঁচাবার চেষ্টা করি। তারপর কি হবে না-হবে সে অন্য কথা—যোগ্যতার কথা নয়।'

গিরিজাপতি সামনের অদ্ভুত রহস্যময় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ডান পাশে মেডিকেল কলেজের ডাস্টবিন থেকে বিশ্রী এক গন্ধ ভেসে এল। মিলিয়ে গেল আবার হাওয়ায়। মুখটা হাওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

'কিন্তু সতীশ, পরিণামের কথা ত চিন্তা করতে হবে।'

'হবে।' সতীশ স্বীকার করে নিলেন, 'সে-চিন্তা আমরা করেছি। স্বেচ্ছাচার থেকে নিজেদের প্রতিরোধ করব। নিজেদের মতন করে নিজেরা বাঁচব। নিজেদের যদি আমরা না বাঁচাই—আমরা মরব—সকলে। বৃটিশ সরকার আমাদের বাঁচাবে না।' সতীশ এমন এক নিঃসন্দিগ্ধ কণ্ঠে কথা

বললেন, এত জোর দিয়ে যে, একটি কথাও বাহুল্য মনে হল না। আমরা আজ তৈরী হয়েছি, গিরিজা।'

গিরিজাপতি সতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'বিশ্বাস করতে পারছ না?'

'কথাটা কি বিশ্বাস করার মতন সতীশ? কিন্তু তুমি ত মিথ্যে বলবে না।'

'কি লাভ!…তবে একটা কথা তোমায় বলি, আমি যাদের কথা বলছি, তারা রাতারাতি গজিয়ে ওঠেনি। কিছু সময় নিয়ে—আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে।'

গিরিজাপতি দ্বিতীয়বার আর কোনো প্রশ্ন করলেন না।

সাধারণ কৌতূহল গিরিজাপতিকে কখনই বিচলিত করত না। কিন্তু সতীশের কথাবার্তায় যে অসাধারণত্ব তৈরি হচ্ছিল, অসামান্য একটি ঘটনার ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছিল—তার সম্পর্কে কৌতূহল নিছক কানে শোনার মতন নয়। অনেক গভীর, যথেষ্ট বিস্ময়ের এবং সম্ভবত গিরিজাপতির নিজের কাছে অন্তত, বিবেচনার যোগ্য। তবু নীরব থাকাই এ-ক্ষেত্রে শ্রেয় মনে করলেন গিরিজাপতি। বউবাজার মোড় পেরিয়ে এল রিকশা। গিরিজাপতি কিছু বলবার আগেই সতীশ রিকশাঅলাকে থামতে বললেন।

'এখানেই নেমে পড় গিরিজা, আমায় ক'টা চুরুট আর দেশলাই কিনতে হবে। তোমার বাড়ি কাছেই না?'

'হ্যাঁ, মিনিট দুয়েকের পথ।' গিরিজাপতি রিকশা থেকে নামলেন। ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।

বউবাজার স্ট্রীটের মোড়ের পানের দোকান থেকে সতীশ চুরুট দেশলাই কিনছিলেন। দু'হাত দূর থেকে কেমন এক অভিভূত চোখে দেখছিলেন গিরিজাপতি সতীশকে। খদ্দরের মোটা হাঁটুঝুল গলাবন্ধ কোট। কাঁধে পাট করা গরম চাদর। এই সেই সতীশ। বয়সের ভার তাকে শিথিল করেছে বলে আক্ষেপ করত। বলত, অকর্মণ্য হয়ে পড়ছি হে। আর বেশি দিন নয়।…

এখন মনে হচ্ছে, ওর বয়স হয় নি, জরা ওকে ছুঁতে পারে নি। খুব তাকি

শক্ত একটা পাথরের মতন আজও সে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য, এতগুলো বছরের মধ্যেও মানুষের মনটা একটুও বদলাল না।

চুরুট না পেয়ে—সিগারেট ধরিয়ে সতীশ ফিরে এলেন।

'চলো, নিউ বউবাজার লেন দিয়েই যাই'—গিরিজাপতি সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন। সতীশ পাশে পাশে।

প্রায়-অন্ধকার গলি—কিন্তু চওড়া। ফুলুরি ভাজা দোকানটায় ক'জন এ-আর-পি-র নীল জামা পরা ছেলে বেঞ্চিতে বসে হাসির হল্লা তুলেছে চা ফুলুরি খেতে খেতে। গুপী বসু লেনের মোড়ের মাথায় অন্ধকারে সাজগোজ করা একটি নিম্ন শ্রেণীর মেয়ে। বিড়ি খাচ্ছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

ফটিক দে লেনের মুখে এসে পড়লেন গিরিজাপতি। এখান থেকে ত্রিশ চল্লিশ পা রাস্তাটা বড় ছোট। পাশাপাশি দুটো মানুষ চলতে পারে না। আর তেমনি অন্ধকার। গ্যাসের আলোও নেই। চাপা গলির মধ্যে বিশ্রী এক গন্ধ। ভ্যাপসানো।

'গিরিজা, তোমার ভাই পো এম. এ. পড়ছে, না?' সতীশ আচমকা শুধোলেন।

'হ্যাঁ'।

'তোমার ভাই ঝি?'

'বাড়িতেই পড়াশোনা করে। সংসারটা ওই দেখে।'

'বয়স কত?'

'বছর ষোলো হবে বোধ হয়।' গিরিজাপতি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

'তোমার বাড়িতে আমি ক'টা কাগজ রেখে দিয়ে যেতে চাই।' সতীশ সহসা খুব চাপা গলায় বললেন।

'কিসের কাগজ?'

'কংগ্রেস বুলেটিন।'

'রেখে যেয়ো।'

সরু অন্ধকার গলি শেষ হল। ক'হাত দূরে গ্যাসপোস্ট। টিমটিমে আলো। পিচঢালা গলিপথ যেন ধাঁধার মত পড়ে আছে।

একটু ইতঃস্তত করলেন সতীশ। গিরিজাপতির কাঁধে আস্তে করে হাত রাখলেন। 'তুমি আমাদের হয়ে সামান্য কিছু কাজ করতে পার না?'

বাড়ির সদরে দাঁড়িয়ে ভেজান দরজায় হাত রেখেছিলেন গিরিজাপতি। ঘাড় ফিরিয়ে সতীশের দিকে চাইলেন। সতীশের মুখের রেখা দেখা যাচ্ছিল না। দেওয়ালে পড়া ছায়ার মতনই প্রায় ভাবলেশহীন। তবু সতীশের গলার স্বর—অল্প একটু হেলান মাথা, হাতের চাপ—এমন এক বক্তব্যকে প্রকাশ করছিল, গিরিজাপতি সহজেই যা অনুমান করতে পারলেন।

'আর কিছু নয়'—সতীশ প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'বুলেটিন লিফ্‌লেট —এ-ধরনের জিনিস কিছু কিছু লেখা।······তোমার ভাইপো টাইপোর হাত দিয়ে কাউকে কাউকে দেওয়া······'

সামান্য একটু নীরবতা। সতীশ আবার বললেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য রেখেই লিখতে হবে। অনেকটা তাই। উদ্দেশ্য বুঝে যা লেখা উচিত। অবশ্য সময় সময় তুমি কংগ্রেসের বুলেটিন পাবে। তার থেকে মেটিরিয়াল নেবে।' সতীশের গলার স্বরে আগে যে সন্দেহ এবং দ্বিধার ভাব ছিল—এখন তা একটু কেটে যাচ্ছে মনে হল। গিরিজাপতিও বুঝতে পারলেন।

সদর দরজা খুলে গিরিজাপতি বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। 'এসো।'

ঘরে এসে নিজের হাতে ক্যাম্বিসের নতুন আরাম-চেয়ারটা ঠেলে এগিয়ে দিলেন সতীশকে। 'বসো। যা ঠাণ্ডা, একটু চা খাও।' ও-ঘরে চায়ের কথাই বলতে গেলেন উমাকে।

ফিরে এলেন একটু পরেই। গায়ের শাল খুলে ফেললেন না, তবে এলোমেলো ভাবে জড়িয়ে—বেতের মোড়ায় বসলেন।

দু-চারটে সাধারণ কথা। ঘর ত তেমন ভাল নয়, ড্যাম্প। কত ভাড়া দেও? ওপর তলায় কারা থাকে? বাড়িঅলা? ভাড়াটে? সতীশ অন্যমনস্ক ভাবে শুধোন। গিরিজাপতি জবাব দেন।

সময় ঠিক সহজ ভাবে কাটছে না। সতীশ মনে মনে বুঝতে পারছেন, গিরিজাপতির মতামত তাঁর মুখ থেকে শোনার জন্যে নিজের আগ্রহ ক্রমশই অধীর হয়ে উঠছে। গিরিজাপতিও অনুভব করতে পারছেন, অস্বস্তিকর এক মুহূর্তের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। সতীশ তাঁর জবাবের জন্তে অপেক্ষা করছে।

সতীশ গলাবন্ধ কোটের বুকের কাছে বোতাম খুললেন। অনেকগুলো বোতাম। বুকের কাছে কোটটা হাঁ হয়ে গেল। ভেতরের জামা খুলে ফেললেন সতীশ তারপর। শেষে ফতুয়ার পকেট থেকে ভাঁজ করা কিছু কাগজ। খুব বেশি নয়। মনে হচ্ছিল কতকগুলো চিঠি, ভাঁজ করা। বাণ্ডিলের মতন দেখাচ্ছিল। সতীশ একবার চোখ বুলিয়ে একটি ভাঁজ করা কাগজ বেছে নিলেন। গিরিজাপতির দিকে হাত বাড়ালেন। 'এটা কংগ্রেস বুলেটিন। লেটেস্ট্। ক'দিন মাত্র আগে পাওয়া গেছে।'

একটু কৌতূহলের সঙ্গেই নিলেন গিরিজাপতি কাগজটা। ছোট হরফের লেখা। ইংরিজী বুলেটিন। সাইক্লোস্টাইল ছাপা। "দি ফ্রিডম্ স্টাগল ফ্রন্ট।"……চোখ বুলিয়ে চললেন। এক দুই করে নম্বর। প্রতিটি নম্বরের সঙ্গে হেডিং। এক নম্বর—দি স্ট্রাগল অফ রিভোল্ট। দু' নম্বর—দি নেচার অফ দি আপহিভ্যাল।…তিন, চার, পাঁচ, ছয়—জায়গায় জায়গায় চোখ বুলিয়ে এসে ছয়ের এক জায়গায় থেমে গেল চোখ। আবার করে পড়লেন—নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের গুদাম, ভাঁড়ার অধিকার করার কথা—খাজনা বন্ধ করার নির্দেশ। আরও আছে—আদালত আইন অমান্য কর—ইউনিয়ন বোর্ড, চৌকি, থানা অধিকার করে নিজেরা চালাও।

উমা চা নিয়ে এল। গিরিজাপতি হাতের কাগজ ভাঁজ করে—কোলের কাছে টেনে নিলেন। যেন সাধারণ কোনো কাগজ পড়ছিলেন।

সতীশ বিস্মিত চোখে উমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। উমা হাত বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালা দিল। সতীশ সচেতন হলেন। চা নিয়ে—একটু হাসি টানলেন মুখে। গলা যতটা সম্ভব সহজ করে বললেন, 'এইটি বুঝি তোমার ভাইঝি, গিরিজা ?'

'হ্যাঁ।' সতীশের বিচলিত অবস্থা 'এবং তার সহজ হবার চেষ্টা—কোনোটাই অবোধ্য থাকল না গিরিজাপতির। সতীশকে শুধু নয়, উমাকেও বিব্রত না-হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতেই যেন হালকা গলায় বললেন, 'ওঁর চায়ে চিনি দিসনি ত রে, উমা ?'

মাথা নাড়ল উমা। না, দেয় নি। কাকা বারণ করে দেওয়া সত্ত্বেও যে কেন চিনি দেবে সে—উমা বুঝতে পারল না। না, অত ভুলো মন ওর নয়।

গিরিজাপতি নিজের চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিলেন। উমা চলে গেল।

'ও কি বরাবরই এই রকম ?' সতীশ শুধোলেন [illegible] গলায়।

'বরাবর আর কি—তা বোঝাও যায় না। পরে আট দশ বছর বয়সের থেকে বোঝা গেল—।' কথাটা অসমাপ্ত ভাবে শেষ করে গিরিজাপতি হাতের কাগজটা আবার চোখের সামনে ধরলেন।

সতীশ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলেন। তার এক রকম শব্দ উঠছিল। মনে হচ্ছিল, মানুষটা চায়ের উষ্ণতায় একটু আরাম পাচ্ছে। তার বিচলিত, অধৈর্য ভাবটা হয়ত প্রশমিত করার এ এক রকম স্নায়ু যুদ্ধ। সিগারেট ধরিয়ে নিলেন আবার সতীশ। এক মুখ ধোঁয়া গলায় রেখে, গিলে ফেললেন। আর চেষ্টা করলেন, চেষ্টা করছিলেন গিরিজাপতির মুখের ভাব লক্ষ্য করবার।

সাত নম্বর নির্দেশটা পড়া হয়ে গেল গিরিজাপতির। 'আদার ফ্রণ্টস' : সর্বমুখী পরিকল্পনা। নির্দেশটা স্পষ্ট। সোজা কথায় অর্থ নৈতিক অবরোধ তৈরি কর। গ্রাম থেকে খাবার আর কাঁচা মাল চালান বন্ধ করে দেও। শহর, শিল্পাঞ্চলের নাড়িতে টান পড়বে। তারপর দেখ, ডিয়ারনেসের ক'টা টাকাতে চড়া দরের চাল গম আটা চিনি শাক সব্জি কতটুকু আসে। বাজার দর নামার কোনো আশা নেই—বাড়বে, বাড়বে—আরও বাড়বে—এর পর সবাই জানে কলকারখানা অঞ্চলে কি করে শ্রমিকদের অসন্তোষকে উগ্র করে কাজে লাগাতে হবে—এবং কত সহজে ধর্মঘট করানো সম্ভব। ধনী মহলে স্বদেশ-প্রেমের আবেগ বিহ্বলতা প্রচার কর। বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক অসন্তোষকে চড়া পর্দায় জাগিয়ে রাখ, পেটিবুর্জোয়ারা মরীয়া হয়ে লড়ার জন্যে রাস্তায়

নামো। ছাত্র আর শ্রমিকদের সংগঠন কর। সরকারী চাকরিতে ভারতীয় অফিসার যারা আছে, তাদের কাছ থেকে গোপনে অর্থ সাহায্য চাইতে আর সরকারী শাসনবিধির গোপন গুরুতর ব্যাপারগুলোর গিঁট কোথায় বাঁধা, কেমন করে বাঁধা—তার হদিস নিতে হবে। তারপর স্যাবোটেজ করো।

গিরিজাপতি (খুবই আশ্চর্য হলেন এখন নিজেই) কোনো রকম রোমাঞ্চ বোধ করলেন না—করছেন না ; বুলেটিন পড়ার পরও। বরং, সতীশের মুখের কথা, তার গলার স্বর, অস্পষ্ট অথচ কেমন এক আত্মবিশ্বাসপূর্ণ উত্তেজনায়—খানিক আগে পর্যন্ত যেন কেমন এক উন্মাদনা বোধ করেছিলেন। বলা যায় না, লেখা কথা আর মানুষের মুখের কথার ক্ষমতায় এ-রকম অদ্ভুত হেরফের হয় কি না। হয়ত হয়।

শেষ প্যারাটায় খাপছাড়া ভাবে এবার চোখ বুলিয়ে নিলেন গিরিজাপতি। বিপ্লব পরিচালনার কর্মনীতিই বলা যায় ; অ্যাড্‌মিনিসট্রেটিভ ওআর্ক। কর্মী তৈরি করো, শিক্ষিত করো—প্রচারপত্র ছড়াও, বার্তাপত্র আর স্লোগান চলতি করো···আর—আর অর্গানিজেশন অফ কন্‌ট্যাক্টস্···

কন্‌ট্যাক্টস্···। হাতের কাগজ থেকে চোখ তুললেন গিরিজাপতি। সতীশের দিকে তাকালেন। বুকের কাছে আড়াআড়ি ভাবে হাত রেখে সতীশ অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। গিরিজাপতির মনে হল, ওর চোখ প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। ভাল লাগল, মানুষটাকে ভাল লাগল গিরিজার। এতোক্ষণ কাগজের লেখায় যে শুষ্ক নিষ্প্রাণ মামুলি ধরনের উত্তেজনা বিস্বাদ অশ্রুত কলরব তুলেছিল, তা যেন ধুয়ে গেল। মনে হল, গ্রামোফোনের রেকর্ডে একটা বীরত্বব্যঞ্জক পালা বাজছিল কানের কাছে। সেটা থেমেছে। আর সামনে একজন মানুষ বসে আছে, যে থিয়েটার করছে না—নকল পৃথ্বিরাজ নয়। আসলও যে, তাও না। তবু, কিছু আছে। হ্যাঁ, কিছু আছে। সে জিনিস কি—তা স্পষ্ট বোধগম্য নয়। শরীরের ত্বকের কোথাও, বুকের কোনো দুর্জ্ঞেয় জায়গায়—তুমি তা অনুভব করতে পার। বুদ্ধি বিবেচনা বিচার—না, এদের আওতায় এই অনুভব নেই। অন্য কোথাও আছে—অন্য কোথাও। বোধ হয় মানুষের প্রাচীন রক্তে।

হাতের কাগজটা ভাঁজ করে ফেলেছিলেন কখন, গিরিজাপতির খেয়াল ছিল না। কাগজ সমেত হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। সতীশ নিজের মুঠোয় কাগজটা নিলেন।

'দেখলাম।' গিরিজাপতি সতীশের চোখে চোখ রেখে তাকালেন, 'তোমাদের কংগ্রেসের কথা এ ছিল না।'

'কেন?'

'কই আমার ত মনে হচ্ছে না—আমি এর আগে কোথাও কংগ্রেসের এ-ভাবে সিজিওয়র অফ পাওয়ারের কথা শুনেছি! আর তুমি যে কাগজ পড়তে দিলে তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়—তোমরা ক্ষমতা অধিকার করার কথা বলছ? আর বোধ হয় সেটা অহিংস ভাবে না।'

'কোনো অন্যায় হয়েছে তাতে?' সতীশের গলায় ভয়ঙ্কর বিরক্তি। উপহাসও বোধ হয়।

'হচ্ছে বৈ কি। নিজেদের নীতি, আদর্শ এবং বোধ হয় মর্য্যাদাকেও হেয় করছ। আমি সত্যাগ্রহ বুঝি—আইন অমান্য বুঝি—কিন্তু থানা, পোস্ট অফিসে হানা দিয়ে সেগুলো দখল করা বুঝি না।...তুমি প্রতিরোধ করো, অমান্য করো—কিন্তু আক্রমণ করবে, অধিকার করবে, এ হয় না। এ-দুয়ের আইডিয়াই আলাদা—একেবারে উলটো। পথও আলাদা। কাজেই হয় না। অবশ্য হয় না মানে কংগ্রেসী মতে হয় না, গান্ধী মতে হয় না।'

সতীশের ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছিল। হাত তুলে গিরিজাপতিকে থামতে বললেন। 'তোমার কথা শুনলাম। এবার আমার কথা শোনো।'

'বলো।'

'কতকগুলো নপুংসক বীর্যহীন মানুষের আড্ডা নয় কংগ্রেস। কংগ্রেস কোথাও এ-কথা বলে নি, তোমার ক্ষেতের ফসলে আগুন ধরিয়ে দিলে, বাড়ি পুড়িয়ে দিলে, বউ মেয়েকে ধর্ষণ করলে, প্রতিবেশীকে রাস্তায় কুকুরের মতন গুলি করে করে মারলে—তাই সব, মুখ বুজে সহ্য করো। না, কোথাও কংগ্রেস এ-কথা বলে নি।' সতীশের মুখের ওপর উত্তেজনা থর থর করে কাঁপছিল।

চোখ ঝলসে উঠেছিল। আরাম-চেয়ারের ওপর থেকে যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চাইছিল শরীরটা।

'সতীশ—' গিরিজাপতি শান্ত ঠাণ্ডা নরম গলায় যেন ডাকলেন। মুখের দিকে মোলায়েম চোখে চেয়ে সহানুভূতির সুরে আস্তে আস্তে বললেন, 'তুমি আমার কথা ভুল বুঝেছ। আমি মানুষের স্বাভাবিক প্রতিবাদ স্পৃহা বুঝি। তার মূল্য দিতেও রাজি আছি। কিন্তু, উভয় অর্থে ব্যবহার করা চলে এমন শব্দগুলো শুধু বুঝি না নয়, অপছন্দ করি। হ্যাঁ, ঘৃণা করি—করবো। আমরা, তুমি জানো—আমরা পুরনো যুগের বাঙ্গালী স্বদেশীরা—' গিরিজাপতি কি বলতে গিয়ে আচমকা থেমে গেলেন। সামান্যক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন সতীশের মুখের দিকে, মাথা নোয়ালেন। তারপর আর কোনো কথা নয়।

কথা নয় খানিকক্ষণ। শেষে মাথা তুলে মৃদু ধীর গলায় আবার বললেন গিরিজাপতি, 'বলার আর কি আছে, তুমি সব জানো। যাকৃগে—কথা কাটাকাটি করে কি হবে। আমি কংগ্রেসের মেম্বার নই—হিন্দুমহাসভারও নয়। পলিটিক্স করি না।...তবে তোমরা কংগ্রেসের মেম্বার—তোমাদের হয়ত মনে করিয়ে দিতে পারি, তোমাদের গান্ধীজী বম্বাইয়ে বার বার বলেছিলেন, আণ্ডারগ্রাউণ্ড অ্যাকটিভিটি পাপ। মনে আছে। দেয়ার শুড্ বি নো সিক্রেট মুভমেণ্ট। ইট ইজ এ সিন।—আর যারা করবে তারা? উইল কাম্ টু গ্রীফ্। তোমরা পাপ ত করছই, উপরন্তু একদিন অনুশোচনা করতে হবে।' সতীশের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু কেমন ম্লান হাসলেন গিরিজাপতি, 'অনুশোচনা ত আগেও করেছ। তবু শিক্ষা হয় নি। বাঙ্গালী জাতের দোষ। আমরা সাবালক হইনা সহজে।'

'তোমার সাবালকত্ব তোমার থাক—' সতীশ আর অতটা গলার পর্দা উঁচু করতে পারলেন না। উত্তেজনাও কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। তবু কঠিন রুক্ষ গলাতেই বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি—' আচমকা লুকোনো এক যন্ত্রণার বেদনা অনুভব করে যেন কথা বন্ধ করে ফেললেন সতীশ। মাথা নাড়তে লাগলেন, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি—তুমি এ-সময়—। যাকৃগে, ভুল

ভেবেছিলাম। আমার বোঝা উচিত ছিল।' সতীশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের অন্ধকার দেওয়ালের কোণে যেন খানিক সান্ত্বনা খুঁজছিলেন। একটু নড়াচড়া করলেন সতীশ। তারপর হঠাৎ কেমন এক বিহ্বল গলায় বললেন, 'গান্ধী—গান্ধী—গান্ধী। গিরিজা, তুমি গান্ধী ছাড়া কি কিছু জানো না? কংগ্রেস গান্ধীর জমিদারী নয়। কংগ্রেস তাঁর একার নয়। আমাদের—আমাদের সকলের। সকলের দেশে যা হচ্ছে—যা করছি আমরা—ভাল বুঝেই করছি। গান্ধীতে কী আসে যায়। আমাদের নিজের ভাববার করবার অধিকার কেউ নিতে পারে না। ···না, আমরা কোনো পাপ করছি না; অনুশোচনাও করব না কোনোদিন।'

গিরিজাপতির মধ্যে কোথাও একটা উপহাসের ভাব এসেছিল একটু আগে যখন পাপ, অনুশোচনার কথা বলছিলেন। এখন হাওয়ায় উড়ে যাওয়া ধুলোর মতন উপহাসের মালিন্য বিরক্তি যেন উড়ে গেল। সতীশের দিকে সহানুভূতির চোখে তাকাতে পারছিলেন, সপ্রশংস দৃষ্টিতেও বোধ হয়।

'চলি। কতকগুলো কাজ নিয়ে এসেছিলাম কলকাতায়। কিছু হল—কিছু হল না।···মা এখন কলকাতায় আছে—বোনের বাড়ি। দেখা করে যাব।' সতীশ ঘরের চারপাশে তাকাতে তাকাতে অন্যমনস্ক সুরে বললেন।

'তোমার স্ত্রী?'

'ভালো আছে। তিনি এখন তাঁর ছেলের কাছে চলে গেছেন খড়গপুরে। ছেলে আর মা মিলে ঠিক করেছে আমার ছায়া মাড়াবে না।' তিক্ত বেদনাদায়ক পরিহাসের মতন শোনাল সতীশের কথা।

'তোমার মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি সতীশ?'

'ওই ত বিশ্বাস করবে না। বাস্তবিকই তাই। ছেলেটা খড়গপুরের রেলওয়ে ওআর্কশপে একটু উঁচুদরের চাকরি করে—গভর্নমেন্ট সারভেন্ট—··· আর বাপ ত দেখছি—এনিমি টু দি গভর্নমেন্ট।' সতীশের কাঁধের চাদর মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তুলে নিতে নিতে ব্যঙ্গহাসি হাসলেন, 'আমার বউ বললে, সারাটা জীবন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছ আমায়—ছেলে মেয়ে দুটোরও সর্বনাশ না করে ছাড়বে না।···আমি বললাম, ভাল কথা—ছেলের কাছে

গিয়ে থাক। আমি ও-পথ মাড়াবো না। মেয়ে নিয়ে বউ চলে গেল। ভালই আছে সব। অবশ্য খোঁজ খবর—' সতীশের চোখে মেঘলা দিনের আলোর মতন বিষণ্ণ নিষ্প্রভতা ছায়া ফেলেছে। চাপা অভিমান।

সতীশ হাওয়ার জন্যে নড়েচড়ে উঠে পা বাড়ালেন দরজার দিকে।

'কাগজপত্রগুলো যে রেখে যাবে বলেছিলে!' গিরিজাপতি বললেন।

মাথা নাড়লেন সতীশ। না। 'রেখে যাওয়ার কথাটা ছুতো। আসল কাজ যেটা—ভেবেছিলাম তোমাকে কাজে লাগনো যাবে—না, তুমি আর সেই গিরিজা নও। মরে গেছ। একেবারে মরে গেছ।' কথাই শুধু নয়, সতীশ এমন ভাবে তাকালেন গিরিজার দিকে, যেন বাস্তবিকই মৃত গিরিজার দিকে তিনি চেয়ে আছেন।

সতীশের এই এলোমেলো, হতাশ ক্ষুব্ধ কথাগুলো গিরিজাপতি মন দিয়েই শুনলেন। মনে হল না—তিনি আহত বা অভিভূত হলেন।

সতীশের সঙ্গে সঙ্গে গিরিজাপতি বাইরে এলেন। খানিকটা পথ পৌঁছে দিতে চললেন।

গলির পথে পা দিয়ে সতীশ বললেন, 'ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট আমার জন্যে ওৎ পেতে আছে। কবে ধরা পড়ব জানি না। একটা অন্তত আনন্দ নিয়ে এবার জেলে যেতে পারব—বাংলা দেশের মাটিতে নিজেদের একটা গভর্নমেণ্ট করতে পেরেছি।'

গিরিজাপতি চমকে উঠলেন। বিস্ময়ে বিমূঢ় হলেন, স্বপ্নকথার মতন মনে হচ্ছিল তাঁর। 'নিজেদের গভর্নমেণ্ট—কোথায়?'

'কেন, আমাদের দিকে। তমলুকে। পরশু সতেরোই তারিখ থেকে—আমাদের গভর্নমেণ্ট ফরম্ করেছে। একটু যেন কি ভাবলেন, বা বলা যায়,' কি মনে পড়ায় যেন বাধা পেলেন সতীশ। গিরিজাপতির দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে—ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যেই বললেন, 'আচ্ছা চলি।'

সতীশ কাঁধের চাদর নামিয়ে গায়ে জড়ালেন। গিরিজাপতির কাঁধে আস্তে করে চাপ দিলেন খুশীর। তারপর স্বাভাবিক মানুষের মতন হাঁটতে লাগলেন সামনের দিকে। শ্রীনাথ দাস লেনের মুখ থেকে ট্রাম রাস্তা দেখা যাচ্ছিল।

দশ

ক.

সংসারের সব কাজ চুকিয়ে একটু শান্ত হয়ে বসতে রত্নময়ীর রাত হয়ে যায়। শীতের দিন; তাড়াতাড়ি কাজ সারবার চেষ্টা করেন। তবু সারতে-করতে দশটা। তার আগে কোনোদিনই বিরাম পান না। রান্নাবাড়া খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে হেঁসেল তোলা, ধোয়া মোছা—আরও কত এটা-সেটা শেষ করে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে থানার পেটা ঘড়িতে দশটা বেজে যায়। নিস্তব্ধ গলিটা তখন আরও নিঃঝুম। নীচের তলা থেকে থমথমে ভাবটা যেন ধোঁয়ার মতন পাকিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। উমার সাড়াশব্দ নেই। নিখিলদের ঘরের জানলায় কোনোদিন একটু আলো চোখে পড়ে—কোনোদিন পড়ে না।

রত্নময়ী যখন ঘরে ঢোকেন—মেয়েরা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। মেঝেয় সুধা; ওপরে রত্নময়ীর খাটের পাশে আরতি। ছেঁড়া লেপ, কাঁথা কম্বল চাপাচুপি দিয়ে যে যার মতন ঘুমোচ্ছে। রত্নময়ী হেঁসেল এঁটো কাঁটার কাপড়টা ছেড়ে ফেলেন। কোনো রকমে ছেঁড়া পেঁজা গায়ে জড়ানো কিছু একটা পরে নীচে সুধার বিছানার মাথার কাছটিতে বসেন। ডাবর টেনে পান সাজেন। বেতো হাঁটুতে হাত বোলান।

মেয়েরা রোজই ঘুমিয়ে পড়ে না; কোনো কোনো দিন কেউ একজন জেগে থাকে। রত্নময়ী দুটো কথা বলতে চান; বলতে পারলে খুশী হন। কিন্তু মেয়েদের তাতে গরজ নেই। তারা হুঁ হাঁ করে কাজ সারে—চোখ খোলে না। পাশ ফিরে শোয়। অগত্যা রত্নময়ীকে চুপ করতে হয়। পোড়া চোখে ঘুমও যে সহজে আসে না—, তাই কোনোদিন ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি টেনে বসে রত্নময়ী পাড় থেকে সুতো তোলেন, কোনোদিন আমল কি

কাঁথা সেলাই করেন। মিটমিটে আলোয় কতক্ষণ আর পারেন। চোখ জ্বালা করে জল আসে। সব সরিয়ে রাখেন। খোঁপা খোলা বিনুনি সরিয়ে মেয়ের ঘাড়ের ময়লা তুলে দেন; কোনোদিন বা খানিকটা চুপ করে শুয়ে থাকেন সুধার গায়ে হাত রেখে।

সুধা ঘুমের ভান করে যেদিন জেগে থাকে—বুঝতে পারে সব। ভাল লাগে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। খানিক পরে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে। তবু নড়ে না; যতক্ষণ পারে। নিজেকে আরও ঘুমন্ত অসাড় করে তোলবার চেষ্টায় ভাল করে নিশ্বাস পর্যন্ত নেয় না। হঠাৎ একসময় এই স্নেহ-নিবিড় সোহাগ অসহ্য হয়ে ওঠে সুধার। তখন—ঠিক তখনই—পাশ ফেরে। কৃত্রিম ঘুমজড়ানো গলায় অস্ফুট বিরক্তিকর কি যেন শব্দ করে—রত্নময়ীর হাত সরিয়ে দেয় গায়ের ওপর থেকে।

রত্নময়ী উঠে পড়েন। বুঝতে পারেন হয়ত সবই। তবু দীর্ঘনিশ্বাস বুকে চেপে রাখতে পারেন না। খানিক আগে এক ধরনের অব্যক্ত ঘন সুখ সহানুভূতি মায়া মমতার যে-স্বাদ তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং বুকের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল—এখন তা যেন কনকনে জলের ঢেউয়ে ধুয়ে মুছে যায়। অসহ্য যন্ত্রণা আর কান্না বুকের মধ্যে গুমরে উঠতে থাকে।

বাতি নিভিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েন রত্নময়ী। টুকরো-কাপড় সেলাই কাঁথাটা গায়ে টেনে নেন।

ঘরের মধ্যে অন্ধকারের মশারি ঝোলে। চোখ বন্ধ করে রত্নময়ী কার পায়ে যেন মাথা কোটেন। সন্তানদের মুখে দুবেলা দুটো ডালভাতের জন্যে প্রতিদিন এই মাথা কোটা, সংসারের একটু স্বচ্ছলতার জন্যে ভিক্ষে চাওয়া—কবে শেষ হবে কে জানে!

রত্নময়ীর বুকের কাছে ঘুমকাতর আরতির কোঁকড়ানো শরীরটা ডাঁই করা অগুছোল কাপড়ের মতন পড়ে আছে। গায়ে গা ঠেকে। অন্ধকারেই মেয়ের গায়ের কম্বলটা ঠিক করে দেন। বড় ছটফটে আরতি; গা থেকে ঢাকা ফেলে দেয়, কাপড় চোপড় সরে যায়। ঠাণ্ডায় কনকনিয়ে পুঁটলি হয়ে থাকে।

ঘুমের ঘোরে একসময় আরতি বুঝতে পারে মা এসে শুয়েছে। গায়ের কম্বল মায়ের ওপর খানিকটা ছুঁড়ে —মার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে—গলায় হাত রেখে আরও ঘন হয়ে ঘুমুতে থাকে।

রত্নময়ীর ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে কখন একসময়ে ঘুমের আলস্য আর জড়তা নেমে আসে। চোখের পাতা আস্তে আস্তে জুড়ে যায়। তিনটি মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, পাশ ফেরা, ঘুমের ঘোরে কোনো জড়ানো কথায় গোঙানি, কাশির শব্দ এ-ঘরের ঠাণ্ডা মলিন ভ্যাপসা গন্ধ দেওয়ালের অবরুদ্ধ বাতাসে কেমন এক আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করে।

ও-ঘরে বাসুও কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত্রের আড্ডা সেরে বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই তার খাওয়ার তাড়া। খাওয়া দাওয়া সারা হলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে ফেলে। বিড়ি সিগারেট যা থাকে, জানলার কাছে সরে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লম্বা লম্বা টান দিয়ে শেষ করে, ধোঁয়ার কুণ্ডলী জানলার বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে গন্ধটাকে এ-ঘরের বাতাস থেকে তাড়াতে চায়। তারপর শুয়ে পড়ে। বাসুর সবসময় ভয়, পাছে মা ঘরে এসে ঢোকে। ঘুমের ভান করে রত্নময়ীকে সে বাইরেই রাখতে চায়। ছেলে জেগে আছে জানলেই মা আসবে। আর তারপর যত রাজ্যের ঘ্যানর ঘ্যানর। গালাগাল, কান্নাকাটি। সংসার, সংসার···যত সব রদ্দি কথা আর উপদেশ। বাসুর ভাল লাগে না। বরং বিশ্রী লাগে, রাগ হয়, মেজাজ বিগড়ে যায়। অত ল্যাঠায় দরকার কি বাবা। তার চেয়ে ঘর বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে এই বাজে ঋঞ্ঝাটের হাত থেকে রেহাই পাওয়া ভাল। বাস্তবিক, বাসু দেখছে—মাও যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছে। বড্ড খিটখিট করে, সব সময় ছেলের দোষ ধরছে। কিছু না—দিদির হাওয়া লেগেছে, ওরই উস্কোনি।···যাক্ গে···বয়ে গেল বাসুর। বাড়িতে কতক্ষণই বা সে থাকে··· মেহাত এই রাতটুকু। ইদানীং একটা মাউথ অর্গ্যান বাগিয়েছে বাসু কোথা থেকে। ইচ্ছে হয়—রাত্তিরে বেশ মেজাজে একটু বাজাবে—কিন্তু মুশকিল বেধে যায় রত্নময়ীকে নিয়ে। ছেলে শুয়ে শুয়ে বাজনা বাজাচ্ছে জানলে পাছে ঘরে আসতে চায়—সেই ভয়ে বাসু মাউথ অর্গ্যানটা পর্যন্ত ভাল করে বাজাতে

পারে না। আর এত ধীরে ধীরে বাজায় যে নীচের তলার কেউ শুনতে পায় কি না কে জানে। উমার হয়ত কানেই যায় না।

মার হেঁসেল ধোওয়া হচ্ছে বুঝলেই—আর কথা নয়; মাউথ অর্গ্যান রেখে সটান লেপ গায়ে টেনে শুয়ে পড়ে বাসু। একেবারে ঘুম।...

ওপর তলার মানুষের রাত এমনি ছক কাটা। নীচের তলার ছকের সঙ্গে খুব একটা প্রভেদ নাই। গিরিজাপতি দশটার আগেই তার ঘরে শুয়ে পড়েন। এ-বয়সে ঘুম একটু দেরিতে আসে। প্রথম রাতটা তাই তন্দ্রা তন্দ্রা ভাবের মধ্যে কাটে। কোনো কোনোদিন ঘুমিয়েও পড়েন।

নিখিলদের ঘরে—তক্তপোশে বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিখিল কোনো কোনোদিন একটু বেশি রাত পর্যন্ত পড়ে। উমা নীচে বিছানা পেতে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ে।

যদি কোনোদিন উমার ঘুম না আসে—আর নিখিলও জেগে থাকে—তবে দুই ভাইবোনে যত রাজ্যের গল্প হয়। বক্তা প্রায়শই নিখিল। ইউনিভারসিটির নতুন বন্ধুদের গল্প বলে। মৃগাঙ্ক কেমন ভাল গান গায়, সমরেশ কী সুন্দর কবিতা লেখে। তৃপ্তি মজুমদার নামের একটি মেয়ে, কী বিরাট বড়লোক...। উমা নির্বাক হয়ে শোনে। মাঝে মাঝে কি মনে হয়—বলে, তুই যখন চাকরি-বাকরি করবি দাদা, বিয়েটিয়ে হয়ে যাবে—তখন আমায় আর সংসারের খাটুনী না খাটিয়ে পড়তে শুনতে দিস। বোনের কথা শুনে নিখিল হেসে ওঠে; জবাব দেয়, আমার বিয়ে হলে তোর আর কি সুবিধে—বরং উলটে তোর বিয়ে হয়ে গেলে আমাদের হোটেলে মেসে সিট ভাড়া করতে হবে।...উমা চুপ মুখে কথাটা শুনে যায়। মনের কোথায় যেন একটা ফাঁকা বাতাস পাক খেয়ে খেয়ে ঘূর্ণির মতন উড়ে উড়ে মিলিয়ে যায়।...নিখিল আবার বলে, তুই পড়লেই পারিস, কে তোকে বারণ করেছে। আসলে তোর মাথায় খালি চাল ডালের হিসেব ঘুরছে—নয়ত এতোদিনে তোর আই. এ পাশ করে যাওয়ার কথা। আরতির মাথাটা কিন্তু খুব সাফ রে, উমা। দেখছিস, এ ক'মাসে কি রকম প্রগ্রেস করেছে। বেশ বড় বড় ট্রানস্লেশন করতে পারে আজকাল। মন দিয়ে পড়লে ও কিন্তু প্রাইভেটে

ম্যাট্রিক দিয়ে পাশ করে যেতে পারে।...উমাও দাদার কথায় সায় দেয়। বলে, সত্যি দাদা—আরতিটা ছেড়ে হলে কি হবে ওর বেশ বুদ্ধি আছে।... বোনগুলো কত ভাল—কিন্তু ভাইটাকে দেখে—কেমন যেন।...নিখিল সঙ্গে সঙ্গে বলে, একটা ষাঁড়। গুণ্ডা।...উমার কে জানে কেন, দাদার এই উগ্র রকমের তাচ্ছিল্য ভাবটা পছন্দ হয় না। জবাব দেবার জন্যে ঠোঁট খুলেও চুপ করে যায়। নীরবতার ছেদ দীর্ঘ হয়ে আসে ধীরে ধীরে। হ্যাঁ—না—কি জানি—এ-ধরনের দু-একটা খাপছাড়া শব্দও শেষে থেমে যায়। কখন যেন উমা ঘুমিয়ে পড়ে। নিখিলও।

ফটিক দে লেনের এগারোর এক বাড়িটার রাত্রের প্রহরগুলি এই বাঁধা ছকে গড়িয়ে চলে। কোনো বৈচিত্র্য নেই, রোমাঞ্চ না। একঘেয়ে ক্লান্ত ধীরে একটা ছন্দ যেন অন্ধকার ক্লান্তি আর আলস্যের সঙ্গে তাল রেখে যাচ্ছে।

পাশাপাশি আর পাঁচটা বাড়িরও একই অবস্থা। গোটা পাড়াটাই শান্ত, নির্জীব, ক্লান্ত। মনে হয় সারাদিনের মুখরতার অবসাদ তাকে জড়িয়ে ধরেছে। গলির পথ দিয়ে কচিৎ চলে যাওয়া রিকশার শব্দও একসময় থেমে যায়। কুকুরের কান্না আর শোনা যায় না। ঘুমন্ত পাড়া—ঘুমন্ত মানুষ। মাথার ওপর শীতের হিম ঘন হয়ে ওঠে। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন অসাড় মানুষের শয্যায় নিবিড়তর উষ্ণতা।'

খ.

নিত্যকার বাঁধা সরল একঘেঁয়ে ছক হঠাৎ ভীষণ ভাবে ওলট পালট হয়ে গেল।

ন'টা বেজেছে সবে। বাইরে পৌষের শীত আর হিম। আর কুয়াশা ভেজা অফুরন্ত জ্যোৎস্না। ওপর তলার খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে গেছে অনেকক্ষণ। নীচের তলারও। সুধাদের ঘরে বিছানাপাতা। সুধা পা গুটিয়ে শুয়ে। ভঙ্গিটা শান্ত স্থির নয়, অস্থির অধৈর্য, উদ্বিগ্ন মানুষের মতন। রত্নময়ী জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। আরতি আর উমা রত্নময়ীর বিছানার ওপর পা গুটিয়ে বসে।

বাইরে বারান্দায় বাসুর পায়ের অস্থির শব্দ। কখনও খোলা বারান্দায়, কখনও ঘরের কাছে। কখনও বা আর শোনা যায় না।

নীচের তলায় গিরিজাপতি তাঁর ঘরে বিশ্রাম করছেন। সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। নিখিলের বরং সাড়া পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বাইরে বারান্দায় এসে ডাকছে উমাকে। ঠিক চিৎকার করে সরাসরি নয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডাকছে: জলের গ্লাস কোথায় রেখেছিস? আমার কলমটা পাচ্ছি না উমা, কোথায় গেল?

দাদার ডাকাডাকি হাঁকাহাকিতে বিরক্ত হয়ে উঠল উমা। 'এমন ভীতু আর দেখিনি বাবা।' উমা চটেমটে উঠে দাঁড়াল। বাইরে চলে গেল। সিঁড়ির মুখের কাছ থেকে কি যেন বলল চেঁচিয়ে। ফিরে এল আবার।

'তুমি নিখিলদাকে ঘুমোতে বললে উমাদি।' আরতি একটু শুকনো হাসি টেনে বলল, 'আচ্ছা মানুষকে ঘুমোতে বলেছ। সারা রাত এখন ঠায় জেগে থাকবে।'

'থাকুক।' উমার বিরক্তি কমেনি একটুও। 'বলুন ত মাসীমা—পুরুষ-মানুষের আবার অত ভয় কি। যেন আমি ঘরে থাকলেই আর বোমা পড়বে না।'

কথাটা কানে গেল রত্নময়ীর। ফিরে তাকালেন না, জবাবও দিলেন না। আধখোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছিলেন। বাস্তবিক কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। গলির ও-পাশে উলটো মুখে দত্তদের বাড়ির টালির ছাদ ধসে যাওয়া এবড়ো খেবড়ো দোতলার দালানটুকু দেখা যাচ্ছিল। তাও সবটুকু নয়। চাঁদের আলো পড়েছে। চিলে কোঠার মতন একটা ঘর। মানুষ জন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দেখা পাবার কথাও নয়। দত্তদের বাড়ির এই ভাঙা ধসে পড়া ঘরগুলোর তলায় ক'টা মুচি থাকে, আর রিকশাবালা। তারা কেউ ওপরে ওঠে না। চিলে কোঠার মতন ঘরটা ফাঁকা পড়ে আছে—কবে থেকেই। ওই-বাড়ির পরই তেতলা সুরকি ওঠা, ভাঙা ইঁট, হালদারদের বাড়ি। বিরাট একটা কালো পর্দার মতন ঝুলছে। আড়াল করা চাঁদের আলো তার মাথায় পড়ছে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে বাড়িটা। জানালা দিয়ে আর কিছু দেখা যায় না। আশ পাশ থেকে পাঁচিলে বাড়িতে ঠেসে গেছে। গায়ে-গা কতকগুলো ঠাণ্ডা কনকনে ইট কাঠের প্রেত। রত্নময়ী গলা ঝুঁকিয়ে নীচে গলিটা দেখবার চেষ্টা করলেন। দেখা যায় না। তবে বেশ বোঝা যায় ঘুট ঘুট করছে গলি।···কি আশ্চর্য, এত বড় পাড়াটায় ন'টা বাজতে না বাজতেই মাঝ রাত্তিরের থমথমে ভাব। সাড়া নেই, শব্দ নেই, গ্যাসের আলোও সব ক'টা জলে না, কারা যেন নিভিয়ে দিয়েছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার জনপ্রাণীহীন বনের মতনই মনে হয়। ছমছম করে ওঠে গা। ভয়ে দুশ্চিন্তায় মনটা আরও মুষড়ে পড়ে।

নিশ্বাস ফেলে রত্নময়ী আধ খোলা জানলা চেপে বন্ধ করে দেন। জানলার কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে আসেন। সারা মুখে ভীষণ এক উদ্বিগ্নতা, শঙ্কা। চোখের তলায় অসহায়তার কেমন এক কালিমা। দৃষ্টিটা খুব অন্যমনস্ক।

সুধার বিছানায় এসে বসলেন রত্নময়ী। বাইরে বাসুর অর্থহীন একটা উক্তি শোনা গেল। বোঝবার চেষ্টা করেও বুঝতে পারলেন না রত্নময়ী। ছড়ানো পায়ে হাত বুলোতে লাগলেন, পিঠটা কেমন ধনুকের মত বেঁকে বেঁকে উঠছিল। 'ক'টা বাজল রে?' আরতির দিকে চোখ রেখে শুধোলেন।

'সাড়ে ন'টা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।' আরতি বলল। এখন, সাড়ে ন'টা বেজে যাওয়ার পর তার কি রকম লাগছে সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে আরও বলল, 'আমার কেমন যেন লাগছে,······এত বিচ্ছিরী······।'

'কারই বা সুচ্ছিরী লাগছে—!' উমা বলল, 'না কি মাসিমা?'

রত্নময়ী এমন চোখে তাকালেন—যার অর্থ, ঠিক—কারও সুচ্ছিরী লাগছে না। বললেন, 'তোর কাকাবাবু কি বললেন?'

'কিচ্ছু বললেন না, মা।' রত্নময়ীর দিকে চেয়ে বলল আরতি, 'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, কি জানি—বোমা পড়তেও পারে।···চাঁদ ভাল করে উঠলে পড়বে—না আজকেও দশটার পর পড়বে—কিচ্ছু বললেন না।'

রত্নময়ী শুনলেন কথাগুলো। বেশ মনোযোগ দিয়েই।

'কাকা বাবু চাপা মানুষ।' উমা বলল, 'যদি ভয় পাই আমরা তাই আগে থেকে কিচ্ছু বলবেন না।'

'বাসু যে বলল কোথ থেকে শুনেছে, ভাল করে চাঁদ উঠলে—ঠিক পরশুর মতন দশটার পর বোমা পড়বে।' আস্তে আস্তে বললেন রত্নময়ী।

'লোকে তাই বলছে।' উমা বলল, 'দাদাও শুনে এসেছে।'...একটু থেমে চোখে ভয় আর আতঙ্কের ছায়া মিশিয়ে আবার বলল উমা, 'জানেন মাসিমা—জাপানীরা কেন চাঁদের ফুটফুটে আলোয় বোমা ফেলে? আলোয় নাকি সব স্পষ্ট দেখতে পায় ওপর থেকে। তাই।'

'জাপানীরা খুব সাহসী, না উমাদি, সাহেবদের মতন নয়।' আরতি শুধোল।

'খুব। মরা টরার একদম ভয় নেই।' গলার ওপর আঁচলটাকে আর এক পাক দিয়ে নিল উমা। 'কথায় কথায় নিজেদের পেট চিরে ফেলে।'

আরতির চোখ একটুক্ষণ থমকে থাকল উমার মুখের ওপর। তারপর শিউরে উঠে বলল, 'রক্ষে কর বাবা। দরকার নেই ও-সব কথা শুনে।'

বাসুর পায়ের শব্দ, কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে বাইরে। ফাঁকা উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাপানী প্লেনের খোঁজ করছে আকাশের দিকে চেয়ে। হতাশ হয়ে ফিরে আসছে। আবার যাচ্ছে।

এবার হঠাৎ দরজার কাছে এসে দাঁড়াল বাসু। মুখে চোখে খানিক উত্তেজনা। 'একটা প্লেনের আওয়াজ যেন শোনা যাচ্ছে, মা।'

বাসুর কথা শেষ হবার আগেই আরতি খপ্ করে উমার হাত ধরে ফেলল। আতঙ্কের কালি যেন কেউ পিচকিরি দিয়ে তার মুখে ছুড়ে দিয়েছে। কান পেতে শব্দটা শোনবার চেষ্টা করল উমা। রত্নময়ীও।

বাসু ঘরের মধ্যে দেওয়ালে ঝুলনো র‍্যাকটার কাছে এগিয়ে গেল। টাইমপিস ঘড়িটা দেখল।

'কই শব্দ!' উমা অনেকক্ষণ কান পেতে থেকেও আকাশে প্লেনের শব্দ শুনতে পেল না। রত্নময়ীও তাকালেন বাসুর দিকে, তিনিও কিছু শুনতে পান নি।

'সাইরেন বাজছে না কেন?' আরতি শুধোল।

বাসু সামান্য মাত্র দ্বিধা করল না, বলল, 'জানতে পারলে ত সাইরেন বাজাবে। এরা জানতেই পারে না—এত উঁচু দিয়ে জাপানীরা আসে।'

'কাল পরশু দুদিনই সাইরেন বেজেছে—?' উমা বলল।

'ও যখন নীচে নেমে এল তখন—। তার আগে আর নয়।' বাসুর চটপট জবাব। যেন ব্যাপারটা সে সব জানে।

সুধা পাশ ফিরে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল এতক্ষণ। কোনো কথা বলেনি। এ-পাশ ও-পাশ একটু নড়াচড়া করছিল শুধু। এবার উঠে বসল। আঁচলটা গায়ে টেনে, মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল। বাইরে যাবে। যেতে যেতে বলল, 'বোমা যখন পড়বে তখন ঠিক পড়বে ; জানতে পারবে সকলেই। হৈ চৈ করে রাত জেগে বসে থেকে লাভ কি!'

সুধা বাইরে চলে গেল। ওর পায়ের শব্দ সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাত-বিরাতের জন্যে দোতলায় কাজ চালানো একটা ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সবাই জেগে রয়েছে দেখে সুধা নীচে কলঘরে চলে গেল।

'এখন খুব সাহস…সাইরেনের শব্দ শুনলেই তখন মুখ আমসি হয়ে যায়' উপহাসের গলায় বাসু বলল, দরজার দিকে তাকিয়ে। 'পড় না ঘুমিয়ে সব—দিব্যি নাক ডেকে ঘুমোও—তারপর বোমাটি যখন পড়বে আর চোখ চাইতে হবে না।'

বাসুর কথা উড়িয়ে দেবার মতন নয়। রত্নময়ীর মনে হল ; সত্যি, কে জানে কখন বোমা পড়বে। শীতের রাত—জানালা দরজা বন্ধ, লেপ চাপা দিয়ে অঘোরে ঘুমোবে মানুষ—তখন যদি বোমা পড়ে—জানতে পারবে কি করে? সাইরেন যদি সত্যিই না বাজে—! বাজলেও যে ঘুমন্ত মানুষ শুনতে পাবে এমন কি কথা আছে।

তবু রত্নময়ী বললেন, 'সারারাত মানুষ এ-ভাবে ঠায় জেগে থাকবেই বা কি করে! মেয়েটার সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি গেছে—কালও আবার অফিস।

'সুধাদি ঘুমিয়ে পড়ুক, আমরা বরং জেগে থাকি।' উমা বলল।

'তোরা সবাই বরং ঘুমো গে যা। আমি বুড়ো মানুষ—আমার ঘুম খুব পাতলা ; আমি জেগে থাকব—যতক্ষণ পারি।' রত্নময়ী বললেন।

'যার ঘুম পায় ঘুমুক, আমি বাবা ঘুমোচ্ছি না। তারপর কালকের মতন হোক।' বাসু সাকসুক গলায় বলল ; বলে তাকাল উমার দিকে—কেমন এক রহস্যময় চোখে। তারপর আবার রত্নময়ীর দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। 'বরং তুমিই খানিক জিরিয়ে নাও মা। আরতিটা জেগে থাক।'

'আমি পারব না।' আরতি সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভাবে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাল, 'সবাই ঘুমিয়ে পড়বে···আমার ভয় করে না বুঝি ?'

'করুক ভয়। সারা দুপুর নাকে তেল দিয়ে ঘুমোস—আবার রাত দশটা বাজতে না বাজতেই ঘুমে ঢুলে পড়িস—?' বাসু ধমক দিয়ে উঠল। 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ত হাতির মতন মোটা হচ্ছিস খালি।'

বাসু চলে যাচ্ছিল। রত্নময়ী বললেন, 'বাইরে হিমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুই-ই বা অত ঠাণ্ডা লাগাচ্ছিস কেন ?'

'এই ত মাফলার।' খয়েরী রঙের করকরে উলে বোনা একটা মাফলারে বাসুর মাথা কান জড়ানো ছিল।

'থাক মাফলার। তোর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার দরকারটা কি ?'

কি দরকার ? মার কথা শুনে বাসুর মনে হল, যেন নেহাত বাজে ছেলে-মানুষী একটা কথা বলছে মা। দরকার আবার কিসের—দেখা, চোখ দিয়ে একটা ফাইট দেখা আকাশের গায়। প্লেনগুলো কি করে আসবে, কেমন করে বোমা ফেলবে—তারপর যদি ফাইট্ লেগে যায়—সিনেমায় যেমন দেখায়—ইস্ সে কী কাণ্ড—শালা দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে প্লেনে—টাল খেতে খেতে ছিটকে পড়বে। লালে লাল হয়ে উঠবে আকাশ।

মাকে এত কথা বোঝান বাসুর সাধ্য নয়। ইচ্ছেও নেই। কাজেই ভাল করে কোনো জবাব না দিয়ে শুধু বলল, 'ফাইট দেখব।' অযথা আর দাঁড়িয়ে না থেকে বাসু বাইরে চলে গেল।

'দাদার খালি মুরুব্বিগিরি।' বিরক্ত গলায় বলল আরতি, 'রাত জেগে হিম লাগিয়ে ফাইট দেখছেন।'

উমা একটু হাসল। আরতি যে কেন রেগেছে বুঝতে পেরেছে ও। দুপুরে ঘুমিয়ে মোটা হওয়ার কথায়। দুপুরের ঘুমের কথা বাড়াবাড়ি। না,

আরতি দুপুরে তেমন ঘুমোয় না। কিন্তু মোটা হোক না হোক—দিন দিন আরতির চেহারাটা সত্যিই বেশ গোলগাল হয়ে আসছে। আগে ও কেমন ছিল কে জানে, তবে চোখের সামনেই উমা দেখছে—দেখতে দেখতে কেমন গড়নটা ভরাট ভারি হয়ে আসছে আরতির। হাত, ঘাড়, বুক, পিছন—পায়ের গোছা—সত্যি যেন রাতারাতি পুরনো আরতি নতুন হয়ে উঠেছে। কত কষ্টে হেলাফেলা করে থাকা, চালমুড়ি চিবিয়ে—তবু দেখ বয়েস তাকে পেয়েছে। দেখতে বেশ হবে আরতি—আর কিছুদিন পরে।

উমা এ-সময় এতগুলো কথা এক পলকে ভেবে নিল। কেন, কে জানে।

রত্নময়ী ডাবর টেনে পান সাজতে বসেছেন আবার। উমা বলল, 'আমায় একটা পান দেবেন মাসিমা? খাই···অম্বল অম্বল লাগছে।'

'আমি একটু জল খাই বাবা, বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে।' আরতি খাট থেকে নেমে পড়ল।

'আমায়ও দিস।' উমা বলল। বলে রত্নময়ীকে উদ্দেশ করে আবার, 'আমি বলি কি মাসিমা, সুধাদি এ-ঘরে ঘুমোক। আপনিও একটু জিরিয়ে নিন। আমরা ও-ঘরে গিয়ে বসি। খুব রাত ত হয়নি এখনও। ঘুম পেলে তখন সব উঠে পড়ব।'

আরতি জল গড়াচ্ছিল। বলল, 'বোমাটোমা যা পড়বার—তার চেয়ে পড়ে যাক—সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমোই। এ-রকম হতচ্ছাড়াগিরি ভাল লাগে না।'

নীচে কলঘরে যাবার সময় নিখিল ঘরে বসে সুধার পায়ের শব্দ শুনেছিল। ভেবেছিল উমা নীচে নেমে এসেছে। ডাক দিয়ে অপেক্ষা করছিল উমার। ···কলঘর থেকে বেরিয়ে সুধা যখন আবার চলে যাচ্ছে—কলঘরের দরজা খোলার শব্দ, পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে এবার একটু অধৈর্য আর বিরক্তির সঙ্গে নিখিল ডাকল, 'উমা—'

এবারও জবাব নেই। নিখিলের রাগই হল। কতক্ষণ থেকে একা এ-ঘরে বসে রয়েছে, বার বার ডাকছে উমাকে—মেয়ের কোনো গ্রাহ্যই নেই।

দরজার কাছে এসে নিখিল ডাকল—'উমা—এই উমা।'

সিঁড়ির মুখের কাছে এসে পড়েছে তখন সুধা। দাঁড়িয়ে পড়ল। নীচের উঠোনে জ্যোৎস্নার আলো পড়ে নি—কিন্তু আভা আছে পুরোপুরি। তাতে মানুষ না চেনার নয়। নিখিল সম্ভবত না দেখে না চিনেই ডেকেছে। একবার ভাবল, সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে যায়। অথচ যেতে পারল না। কেমন যেন আপনা আপনি দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছু ফিরে তাকাল। 'উমা ওপরে।' মৃদু গলায় বলল সুধা।

নিখিল বাস্তবিক দেখেনি। অধৈর্য হয়ে যখন ডেকেছে তখন সে ঘরের মধ্যে; চৌকাটে পা দিয়ে উঠোনে তাকাতেই চিনতে পারল, উমা নয়, সুধা। বিব্রত হল নিখিল। সুধার কথায় আরও সংকোচ বোধ করল। কি বলবে না বলবে ঠিক করতে না পেরে বলল, 'আমি ভেবেছিলুম···।'

'পাঠিয়ে দেব উমাকে?' গিরিজাপতির ঘরের দিকে অযথাই তাকাল সুধা। দরজা বন্ধ।

'না, থাক—।'

একটু চুপ। সিঁড়িতে পা রেখে যাই যাই ভাব করেও সুধা যেতে পারল না। কথা বলার ভীষণ একটা আগ্রহ সে অনুভব করছিল। ঠিক যে কেন, সুধা বুঝতে পারল না। হয়ত এখনকার এই রাত্রের বিশ্রী উদ্বেগ ব্যাকুল দমবন্ধ আবহাওয়ায় দুটো কথা বলার মধ্যে স্বস্তি আছে একটু। বাসু উমা—এদের সঙ্গে নয়, ওরা কিছু জানে না, বোঝে না। নিখিল জানলেও জানতে পারে। সুধা বলল, 'ওপরে বোমাপড়া নিয়ে জটলা হচ্ছে।' একটু থামল সুধা, 'ওরা সব জেগে থাকবে।'

'সারারাত?'

'কে জানে। চোখ না ভেঙে আসা পর্যন্ত কি আর ঘুমোবে?' সুধা অন্যমনস্ক ভাবে বলল। 'উমার জন্যে বসে না থেকে আপনি শুয়ে পড়ুন।'

বলা সোজা, কিন্তু চুপ করে শুয়ে থেকে প্রতি মুহূর্ত মৃত্যুর কথা চিন্তা করা যে কী—নিখিল ভাবল, তা উনি কি জানেন না? বলল, 'ঘুম আসছে না। এত খারাপ লাগছে। খুব বড় একটা অপারেশনের আগে যেমন লাগে তেমনি যেন। কি হবে না-হবে কেউই কিছু জানে না।' নিখিল

এতগুলো কথা বলার পর অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করল—সুধার সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রথম সে একসঙ্গে এত কথা বলে ফেলেছে।

সুধার ভাল লাগল কথাটা। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে নিখিল। সুধার আচমকা মনে হল, নিখিলের ভীতু স্বভাব নিয়ে হয়ত সে একটু প্রচ্ছন্ন ঠাট্টাই করতে চেয়ে ছিল। কেন—কে জানে? উচিত হয় নি। নিখিলও ইচ্ছে করলে কি সুধাকে উপহাস করতে পারত না! তাড়াতাড়ি কথাটা যেন চাপা দেওয়ার জন্যেই বলল সুধা, 'আজ কি বোমা পড়বে?'

'সবাই তাই বলছে। পড়বে।' একটু ভাবল নিখিল। 'সিঙ্গাপুর রেঙ্গুনের মতন অ্যাটাক শুরু করতে পারে। করলে কি হবে—কে জানে!'

কি হবে কেউ জানে না। নিখিল নয়, সুধাও নয়। এ-শহরের কেউই নয়। বিভ্রান্ত বোধ করছিল সুধা। হতাশ, অসহায়। 'কি হবে আর—মরব। সবাই আমরা মরব।'

আর কোনো কথা হল না। সুধা সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল নিখিল।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে গত পরশু আর কালকের কথা মনে হচ্ছিল সুধার। পরশু, রবিবার—সাইরেন বেজেছিল রাত দশটার একটু পরে। সুধা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রথমে কেউই তাকে ডাকেনি। ভেবেছিল, মাঝে মাঝে যেমন সাইরেন বাজে—এও তেমনি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বোঝা গেল, আজকের সাইরেন ঝিছিমিছি নয়। নীরব থমথমে রাত আর জ্যোৎস্নাভরা আকাশ প্রতিধ্বনি করে শব্দ উঠল। অনেকটা তোপ দাগার মতন। তবে অত মৃদু নয়, আরও যেন জোরে। মনে হল, বোমা (ওই শব্দ যে অ্যান্টি এয়ার ক্রাফটের পরে জেনেছে।) পড়ছে দূরে। হুড়মুড় করে সবাই তারা নীচে ছুটলো। কাকাবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে ডাকছিলেন। নীচে তখন কেমন একটা আতংক আর বিহ্বলতা। ঘরের বাতিগুলো নিভলো।

উমাদের ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে তারা কটা মানুষ। কে কে আছে দেখার উপায় নেই। তবে বাচ্চু ছিল না। অল্প সময়ের জন্যে নীচে নেমে এসে আবার সে ওপরে পালিয়ে গেছে। কী বেয়াড়া বদমাশ ছেলে, এ-রকম

অবস্থাতেও তার কম ভয় নেই। দোতলায় ছুটে গিয়ে সে বোমা ফেলা দেখছে।… ঘরে সুধারা যেন নিশ্বাস বন্ধ করে বসে। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। সুধা হাঁটুর মধ্যে মাথা চেপে ধরে ভগবানকে ডাকছিল। নিখিল মাঝে মাঝে কি যেন বকছিল বিড় বিড় করে। উমা আর আরতি থেকে থেকে ব্যাকুলভাবে আবোল তাবোল চিৎকার করে উঠছিল। রত্নময়ী চুপ। হয়ত সুধার মতন তিনিও ঈশ্বরের পায়ে মাথা খুঁড়ছিলেন। কিন্তু সুধা জানে, ভগবানকে সে বাস্তবিকই একমনে ডাকতে পারছিল না। ডাকার মতন বিশ্বাসও ছিল না। কিছু যদি না—কোথাও যদি না ভরসা থাকে—তবে কেমন এক অভ্যাসের বশে ভগবান আসে। ভগবানকে ডাকছিল সুধা, যদিও ঘুটঘুটে অন্ধকারে চোখের মধ্যে কিম্ভূতকিমাকার আকারহীন ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন দুলছিল। মনে হচ্ছিল, এই—এখুনি মাথার ওপর বোমা পড়তে পারে—এই বাড়িঘর—মা ভাই বোন সব পলকে রক্তমাংস হাড়ের টুকরো হয়ে ইট কাচে ছত্রাকার হয়ে যেতে পারে। কিংবা—কিংবা কি হতে পারে—, সুধা ভাববার চেষ্টা না করেও নানারকম বীভৎস দৃশ্যকে টুকরো টাকরা ভাবে অনুভব করতে পারছিল। মাথাটা তখন ধরে গেছে। শুধু ধরা নয়—কপালের চারপাশে শিরা উপশিরাগুলো টান হয়ে গেছে। দপ্ দপ্ করছে কপাল। টলে যাচ্ছে মাথা। হৃদপিণ্ড বুকের একপাশ থেকে যেন ছিটকে অন্য কোথায় চলে যেতে চাইছে। সুধার বেশ মনে পড়ে, নিজের মৃত্যুর কথা তখন তার মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সুচারুকে।

সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে সুধা দাঁড়াল। ওপরে সে উঠে এসেছে। উঠোন ভরা চাঁদের আলো। মাথার ওপর আকাশ। চাঁদও দেখা যাচ্ছে। হিম-কুয়াশার একটা পর্দা ছড়িয়ে আছে—আকাশের তলায়।

এই চাঁদ, আকাশ, আলো কিছুই ভাল লাগল না সুধার। যদি চাঁদ না থাকত, যদি এই অফুরন্ত জ্যোৎস্না নিভে যেত—খুশী হত সুধা; স্বস্তি পেত। মনে পড়ল ওর, অফিসেও ঠিক এইসব কথা হচ্ছিল আজ। কে যেন একজন ঠাট্টা করে বলছিল, চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে করে আর ছেলে ঘুম পাড়াতে

হবে না, তারকদা; এখন থেকে ছড়া-টড়া পালটে ফেলুন, চাঁদ উঠল বোমা পড়ল···এইসব শুরু করুন।

তা ঠিক, সুধা ভাবল। বাস্তবিক এখন সেই-রকম অবস্থা। চাঁদ যে এখন কত বড় আতংক, কী ভীষণ দুর্ভাবনা, তা শুধু কলকাতার মানুষই বুঝছে।

খোলা উঠোনে একটু দাঁড়িয়ে থাকায় সুধার গলা খুস খুস করছিল। গলা পরিষ্কারের জন্ত বার কয়েক কাশল। সুধার কাশির শব্দে বাসু ঘাড় ঘোরাল। বারান্দার একদিকে সরু গোল থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাসু। কোনো কথা বলল না। সুধাও তেমন করে ভাইকে দেখল না।

ঘরে এসে এবার লেপটা গায়ে পায়ে ভাল করে টেনে শুয়ে পড়ল সুধা। 'কটা বেজেছে মা ?'

'তা প্রায় দশটা।' রত্নময়ী বললেন, 'তুই ঘুমো। আমরা ত জেগে আছি। মেয়েরা ও-ঘরে যাচ্ছে।'

আরতি আর উমা পাশের ঘরে চলে গেল।

'বাতি নিভিয়ে দি ?' রত্নময়ী শুধোলেন।

'দাও।···তুমি শোও মা ; ওদের সঙ্গে ঠায় বসে রাত জেগে কি করবে ? কিছু কি ঠিক আছে কখন বোমা পড়বে। এখনও পড়তে পারে—শেষ রাতেও পড়তে পারে। দেখলে না, পরশু পড়ল দশটার পর, কাল পড়ল তিনটের পর।'

'তা ঠিক।' রত্নময়ী বললেন—কি যেন ভাবতে ভাবতে।

কালকের কথা মনে পড়ে সুধার। প্রথম রাত ভয়ে দুর্ভাবনায় অনেকক্ষণ জেগে থেকে শেষে মনে হল, বোমা আর পড়বে না আজকে। অবসন্ন শরীর ; কখন ঘুম নেমে এসেছিল। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল।··· অসাড় আরামের ঘুম ভেঙে জেগে উঠল যখন সুধা—তখন সাইরেন বাজছে। একটা তীক্ষ্ণ বাতাস-চেরা পরিচিত শব্দ একটানা চড়া পর্দা থেকে খাদে নেমে এসে যেন ঘুমন্ত মানুষগুলোকে উঠিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে। খাদের পর্দা কমে এসে এসে আবার তীক্ষ্ণ চড়া তীব্র হয়ে উঠছে। ওই শব্দের সঙ্গে যে আতংক, চঞ্চলতা, অসহায়তা এবং যন্ত্রণা জড়িয়ে আছে—সুধাকে

সব যেন মুহূর্তে জাপটে ধরল। আরতি ধড়মড় করে নীচে ছুটে যাচ্ছে। রত্নময়ীর ভয়ব্যাকুল চোখ, গলার স্বরে কোনরকম স্বাভাবিকতা নেই, সুধাকে টানছেন হাত ধরে, সুধা—সুধা। ওঠ্ শীগগির···।

ধড়মড় করে উঠে বিস্রস্ত বেশবাস নিয়ে ছুটতে ছুটতে পড়তে পড়তে সবাই নীচে নেমে গেল। ঘরের বাতিগুলো বাসু সব নিভিয়ে দিয়েছে।

নীচেও অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। দেখার মতন মন বা চোখও নেই। উমাদের ঘরে এসে হুড়মুড় করে সব ঢুকে পড়ল।

সাইরেন থামল। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ। তারা ক'টি প্রাণী যেন কোন পাতালে নেমে যাচ্ছে। তেমনি হু হু ভয় আর পারাপারহীন অন্ধকার। প্রত্যেকটি মুহূর্ত কী অসম্ভব দীর্ঘ আর দুঃসহ। কানই যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের হয়ে একা কাজ করছে। কোথাও কি শব্দ হচ্ছে···দূরে···অনেক দূরে? কোনো কোণ থেকে কি একটু গুরু গুরু ধ্বনি ভেসে আসছে? জাপানী প্লেন কি এসে গেছে মাথার ওপর?

বাইরের গলিতে পায়ের শব্দ উঠছে। ত্বরিত-ব্যাকুল জড়িত-কণ্ঠস্বর; এ-আর-পির ছেলেরা। রাস্তার বাতি নিভনো কি না দেখছে। দেখছে, কোনো বাড়ির জানলা যদি খোলা থাকে, একটু আলোর আভাও যদি আসে কোথা থেকে। ওদের সময় নেই মুহূর্তও—ছুটতে ছুটতে এসেছে—ছুটতে ছুটতে চলে গেল। সুধা শুনতে পেল—দোতলা থেকে বাসু চেঁচিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বললে। ক'টা বেজেছে রে অমূল্য? তিনটে। তিনটে বেজে গেছে, বাজছে? কি, বাইরে থাকব না···যা বে যা—ঠিক আছি।···

তিনটে বেজে গেছে। সুধার মনে হচ্ছিল—যদি সকালটা এখনই হয়ে যায়, বেঁচে যায় সব। কাল দু' ঘণ্টা পরে সাইরেন থেমেছে—আজ কখন থামবে?

'ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে।' আরতি ভয়ভেজা গলায় বলল।

'আমারও।' উমার গলা।

সুধা কিছু বলল না। কিন্তু বুঝতে পারল তারও অসহ পিপাসায় গলা শুকনো কাঠ হয়ে রয়েছে। একটু জল পেলে সেও বাঁচত।

'জল আছে, এ-ঘরেই।' উমা বলল, 'কিছু যে দেখতে পাচ্ছি না। বাতিটা একবার জ্বালি।'

উমা হাতড়ে হাতড়ে বাতি জ্বালল। জলের কুঁজোটা দেখে নিল। নিখিল তাড়া দিচ্ছে। জল গড়িয়ে দিল উমা আরতিকে। নিজেও খেল। নিখিলও। সুধা উঠে গেল।

আর মুহূর্তে কি যেন হয়ে গেল। দূর থেকে একটা শব্দ, ভারি প্রতিধ্বনিত শব্দ ভেসে এল। ঘরের প্রত্যেকটি মানুষ সঙ্গে সঙ্গে পাথর। চমকটুকু মেলাবার আগেই নিখিল বাতি নিভিয়ে দিয়েছে। নিরেট অন্ধকার। রত্নময়ী চিৎকার করে বাসুকে ডাকতে লাগলেন দরজার কাছ থেকে। গিরিজাপতিও বারান্দায় এসে বাসুকে ডাকছিলেন। আবার একটা শব্দ হল। অনেক স্পষ্ট। অনেক জোরে।

বোমা পড়ছে। এই শহরের ওপরই। হয়ত আশে পাশে কোথাও। রত্নময়ী ঘর থেকে কখন বেরিয়ে গেছেন। সিঁড়ির পথ থেকে গালাগাল দিচ্ছেন বাসুকে : হতভাগা হাড় জ্বালানো ছেলে—আপদ কোথাকার। নেমে আয়।

আরতি ডাকছে রত্নময়ীকে। তুমি চলে এস—ওমা, তুমি চলে এস।

সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। আকাশও থর থর করে কাঁপছে। কেমন একটা গুম গুম শব্দ। মাঝে মাঝে সেই ভারি—প্রতিধ্বনিত ধ্বনি। অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট্ নাকি? কোথায় পড়ছে বোমা? খিদিরপুর? গঙ্গার বুকে, ফোর্টে······

মাথার ওপর দিয়ে গুম গুম শব্দটা ভেসে যাচ্ছে। জাপানী প্লেন। শব্দটা এই রকমই না! এই শব্দটাই যেন মৃত্যু-বাহন। কঠিন গম্ভীর নির্মম।

সুধার মনে হল, ঠিক তার মাথার ওপর শব্দটা এসে থেমে গেছে। নড়ছে না। ঘর নিস্তব্ধ। রত্নময়ী কোথায় কে জানে। আরতিকে একবার ডাকার চেষ্টা করল সুধা। গলায় স্বর ফুটল না।

হঠাৎ ভীষণ ভয় পেয়ে কিছু একটা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছিল সুধা। অন্ধকারেই হাতড়ে যাচ্ছে। কাছে পেয়ে কাকে যেন প্রাণপণে চেপে ধরল।

নিখিল। তবু—তখন নিখিল যেন অন্য কিছু। সুধা বুঝতে পারল, নিখিলের হাত চেপে ধরেছে। বুঝতে পারল, কিন্তু হাত ছাড়তে পারল না। একজন মানুষ তার কাছে, তার পাশে—মাত্র এইটুকু বোধ-সম্বল ছাড়া আর কিছুই অনুভব করতে পারছিল না সুধা।······অস্ফুট স্বরে কি একটা বলল নিখিল। সুধা বুঝতে পারল না। কিন্তু নিখিল যে বসে পড়ছে সুধা বুঝতে পারল। হাতের টান থেকে। সুধাও বসে পড়ল।

মাথার ওপর সেই মেঘের-তলায়-মেঘ ডাকার মতন শব্দটা সরে গেছে। অ্যান্টি-এয়ারক্রাফটের গুরুগম্ভীর ধ্বনি মাঝে মাঝে ভেসে আসছে।

বমি করতে শুরু করল কে। নিখিল—নিখিলই। সুধা বুঝতে পারল। হাত ছেড়ে দিল না সুধা। মুঠোটা আলগা হয়ে এল।

'কে?' রত্নময়ীর গলা শোনা গেল। ঘরেই আছেন তবে তিনি।

'উমাদি?' আরতি শুধোল। চাপা শুকনো স্বর।

'না।' উমা বলল, 'আমি না।'

নিখিলের আর একবার বমির দমক এল। সুধার আলগা মুঠো একেবারেই আলগা হয়ে গেল।

'সুধা?' রত্নময়ী ব্যাকুল গলায় ডাকলেন।

'আমি না। উনি বমি করছেন।' সুধা বলল। আর এই একটা কথা বলার পর যেন একটু সাহস ফিরে পেল। তারপর অস্পষ্ট উচ্চারণে প্রায় ফিস ফিস করে বলল, 'ধরবো আপনাকে?'

কোনো জবাব দিল না নিখিল। জোরে জোরে শ্বাস টেনে হাঁপাচ্ছিল।

আকাশে এবার অনেকগুলো প্লেন যেন নীচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। কালকের মতন। অন্য আর কোনো শব্দ নেই। মাথার ওপর থেকে প্রকাণ্ড মেঘের মতন আতংকটা যেন একটু একটু করে ফিকে হচ্ছে। তবু দ্বিধা, সন্দেহ ঘুচছে না।

'বমি করছিস কেন, দাদা?' উমার গলা, 'গা বিড়োচ্ছে? মাথা ঘুরছে?'

নিখিল যেন কি বলবার চেষ্টা করে শুধু একটা গোঙানির মতন শব্দ বের করতে পারল।

অল ক্লিয়ার বেজে উঠেছে। মৃত্যু ভয় ভাবনা অসহ উদ্বেগকে যেন দু-হাতে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে একটা স্বস্তি, শান্তি সাইরেনের শব্দের তরঙ্গে তরঙ্গে ঝরে পড়তে লাগল। পাতাল থেকে, মৃত্যুর গহ্বর থেকে আবার জীবনে ফিরে এল সবাই। পায়ের তলায় মাটি পেল।

ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। ছাই সাদা মুখ, আতংক-বিহ্বল চোখ, কমকমে বুক, শুকনো ঠাণ্ডা ঠোঁটে একটু একটু করে স্বাভাবিক জীবনের তাপ লাগছে আবার। নিখিল বমি করেছে। আলো জ্বালার পর তার দুর্বল পাংশু মুখ অস্বস্তিতে করুণ হয়ে উঠল। অধোবদন হল নিখিল।

সুধারা নীচের ঘর থেকে চলে এল। দোতলায় আসতেই চোখে পড়ল আকাশ। কী শান্ত! মনেই হয় না, কিছুক্ষণ আগে ওই জ্যোৎস্নার তলায় বিভীষিকা আর নির্মম মৃত্যুর পায়ের শব্দ উঠছিল গুম গুম···। খুব মিহি ফরসার সঙ্গে মরা জ্যোৎস্না পেঁজা তুলোর মতন ছড়িয়ে রয়েছে।

কাল কি ঘটেছিল না-ঘটেছিল প্রায় সমস্ত কথাই এবং গোটা দৃশ্যটাই সুধার মনে অসংলগ্ন ভাবে এল এবং মিলিয়ে গেল। রত্নময়ী ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলেন। সুধার মনটা ছমছম করে উঠল। বাতি জ্বালা থাকলে তবু যেন একটু সাহস জোটে কোথা থেকে।

'মা।' সুধা ডাকল। একটু চুপ, 'তুমি ওদের সঙ্গে ছড় করে কি করবে। তুমিও শোও।'

সুধা না বললেও রত্নময়ী একটু শুতেন। কোমরের তলায় খুব ব্যথা হয়েছে। একে বাত, তার কাল হুড়মুড় করে ওঠা নামা করতে গিয়ে সিঁড়িতে পা হড়কে গিয়েছিল। বেশ লেগেছিল। ব্যথাটা বিকেল থেকে মাঝে মাঝে চিড় চিড় করে উঠেছে।

মেয়ের পাশে এসে শুলেন রত্নময়ী।

'এমনি ভাবে কতদিন আমরা রাত জেগে থাকব, সুধা? কতদিন বোমা পড়বে আর?' এক সময় রত্নময়ী বললেন।

'কে জানে মা, ভগবান জানেন কতদিন এ-ভাবে থাকতে হবে!' ভারি নিশ্বাস পড়ল সুধার।

একটুক্ষণ চুপচাপ। মেয়ের গায়ে হাত রেখে শুয়ে আছেন রত্নময়ী। আচমকা শুধোলেন, 'যুদ্ধ কবে থামবে রে ?'

কবে থামবে সুধাও যে সহস্রবার এই প্রশ্ন করে। কাকে ? কাউকে নয়। তৃতীয়, অজ্ঞাত অদৃশ্য কাউকে যেন। কবে থামবে যুদ্ধ ? কবে ফিরে আসবে সুচারু ? অশেষ ক্লান্তি কষ্ট—উদ্বেগ ভয় অনিশ্চয়তা থেকে কবে যে মুক্তি পাবে—?

ও-ঘরে উমা আর আরতির কাছে বাসু গত দুদিনের বোমা পড়ার বিবরণ শোনাচ্ছে। সারাদিনে কয়েকবার শোনানো হয়েছে। কখনও রত্নময়ীকে। কখনও আরতিকে। এবারের মূল শ্রোতা উমা। বাসু নিজে অবশ্য বোমা পড়ার জায়গাগুলো দেখে নি ; কিন্তু যারা দেখেছে তাদের কাছ থেকে শুনেছে। এই শোনা কথাই চোখে দেখার চেয়ে জলজ্যান্ত বর্ণনা দিয়ে বলছিল বাসু। খিদিরপুরের ডকের কাছাকাছি এক ঠাসা বস্তিতে কি ভাবে মানুষ মরেছে পরশুর বোমাতে—একেবারে মাংসর কিমা হয়ে গেছে—কোথায় হাত কোথায় পা কোথায় ধড় তার ঠিকানা নেই—তার বিবরণ যখন শেষ করল বাসু, উমার সমস্ত মুখ তখন বিভীষিকার অসহিষ্ণুতায় কাগজের মতনই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখের মণি দুটো গভীর নীল কাঁচের গুলির মতন চক চক করছে। কপাল গাল কুঁচকে উঠেছে ; দাঁতে দাঁত এক হয়ে—অসহ্যতার একটা করুণ ভঙ্গি ফুটে উঠেছে।

বাসুর গায়ের ছেঁড়া লেপ কোমর পর্যন্ত টেনে আরতি হাই তুলছিল—উমার পাশে বসে। চোখ দুটো তার ছোট হয়ে আসছে—টেনে টেনে যাচ্ছে। বলল, 'এই রাত্তিরে আর ও-সব কথা বলো না দাদা। ভাল লাগে না। গা শির শির করে উঠছে।'

উমার ভাল লাগছিল না। বলল, 'সত্যি, দরকার নেই আর শুনে।' একটু চুপ করে আবার বলল, 'আমার যদি ও-ভাবে মরতে হয়—একটা পা গলিতে হাতটা ছাদে······না বাবা—' উমা গলা গাল চোখ সিটকে শিউরে উঠল।

'তুমি কখনও হাত দেখিয়েছ উমাদি ?' আরতি চুলুনি সামলে অদ্ভুত এক প্রশ্ন করে বসল।

'হ্যাঁ। অনেকবার। হেতমপুরে আমাদের এক চেনা পিসিমা ছিল—মেয়েছেলে হলে কি হবে খুব ভাল হাত দেখতে পারত।' উমা বাঁ হাত চোখের সামনে তুলে নিজেই একবার রেখাগুলো দেখল।

'আমিও দেখিয়েছি। আমরা সবাই।' আরতি বলল, 'মনে আছে দাদা—সেই যে এক সাধু এসেছিল।'

'ভাগ—হাত! ও-সব হাত ফাত সেরেফ ভাপ্পি, গুল।' বাসু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল।

'তোমার আয়ু কতদিন, উমাদি ?' আরতি শুধোল, বাসুর কথায় কান না দিয়ে।

'ও অনেক। বাটেরও ওপর।'

'আমারও তাই।'

'তবে কি, যতই বোমা পড়ুক—আমরা মরব না।' উমা একটু হেসে বলল। বাসুর দিকে চাইল।

'আমি মরা ফরা কেয়ার করি না। মরতে ত একবার হবেই। আজ হোক কাল হোক, পঞ্চাশ বছর পরে হোক।' বাসু অবজ্ঞার সঙ্গে বলল।

আলোচনাটা হঠাৎ থেমে গেল। কেউ আর কোনো কথা বললে না। হয়ত দীর্ঘ আয়ুর কথা ভাবছিল; বিশ্বাস করতে চাইছিল। শেষে এক সময় বাসুই কথা বলল: জাপানীরা প্লেন থেকে কি কাগজ ছড়িয়েছে—কলকাতা থেকে কেন পালাতে বলেছে তার কথা।

আরতির বেশ ঘুম পেয়েছে। হাই তুলছে অনবরত। চোখ বন্ধ করে ঝিমোচ্ছে। এবার বিছানার ওপর ঘাড় পিঠ গুঁজে মাথা চেপে চুলুনিটা সামলে নেবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

'একটা তাস টাস থাকলে জমত।' বাসু বলল।

'তাস ?'

'খেলা যেত। রাত জাগতে গেলে বেশ জমে।'

'আমি জানি না খেলতে।'

'কিছু না! টুয়েন্‌টি নাইন?'

'না।'

'গাধা পেটাপেটি?' বাসু হাসল।

উমাও হাসল। হেসে ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ সেটা জানে। লুডো? বাসু আবার হাসিমুখে শুধোল। উমার তরফ থেকেও একই জবাব।

'এবার একবার বাইরেটা দেখলে হয়।' বাসু বলল; 'ওরা ও-ঘরে দিব্যি সব ঘুমিয়ে পড়ল নাকি!' মাফলারটা গলা থেকে খুলে মুখে মাথায় জড়িয়ে বাসু একটু যেন কি বলি বলি করে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ বাইরে চলে গেল।

উমা বসে থেকে থেকে হাই তুলল। মাথা চুলকোল। আরতি ঘাড় পিঠ গুঁজে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। আরতির পাশে একটু কাত হয়ে বসার জন্তে উমা ওরই পিঠে মাথা রাখল। উমারও ঘুম পাচ্ছে। ঘরের একজন কেউ ঘুমিয়ে পড়লে অন্তজনের কি জেগে থাকতে ইচ্ছে হয়। আপনিই ঘুম আসে। চোখের পাতা বন্ধ করে ক্লান্তি কাটাবার চেষ্টা করছিল উমা।

খানিকটা সময় কাটল। বাসু আসছে না কেন? ও এলে তবু কথায় কথায় ঘুম-ভাবটা কাটানো যায়। একা একা পারা যায় না। তা ছাড়া কাল প্রায় সারা রাতই উমার জেগে কেটেছে।······কাল—উমার মনে হল—কাল এক কাণ্ডই হয়েছে। না, বোমা পড়া শুধু নয়; তা ছাড়াও অন্ত এক কাণ্ড। কথাটা আজ সারাদিনে কয়েকবারই মনে পড়েছে উমার—। কেন?

তখন কটা হবে? বোধ হয় বারোটা একটা হবে। কি দেড়টাও হতে পারে। তার অনেকক্ষণ পরে কিন্তু সাইরেন বাজল। ওই রকম বারোটা কি একটা হবে রাত, বোমা পড়বে পড়বে করে অনেকক্ষণ জেগে থেকে সব ঘুমিয়ে পড়েছে। কি রকম এক বিশ্রী স্বপ্ন দেখে উমা জেগে উঠল। দাদা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘরের বাতিটা জ্বলছে। বাতি জ্বালিয়ে রেখেই ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। জল তেষ্টা পেয়েছে উমার। উঠল, জল খেল। বাইরে কার পায়ের শব্দ। দরজাটা খুলে বাইরে এল উমা। বাসু। দরজা-খোলার শব্দে বাসুও দাঁড়াল। সিঁড়ির মাঝপথে প্রায়। অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে উঠে

গেল। বোধ হয় পায়খানা টায়খানায় গিয়েছিল, উমা কলঘরে যাবার সময় ওপাশ থেকে বিড়ির গন্ধ পেয়ে অনুমান করল।

ফেরার সময় বারান্দায় উঠে এসে উমা একটু দাঁড়াল। ওপর থেকে চাপা-চাপা বেশ সুন্দর একটা শব্দ ভেসে আসছে। অনেকগুলো ভোমরা আর ঝিঁঝি যেন এক সঙ্গে ডাকছে। ওই রকমই কিছু হবে। বাসু সেই বাজনাটা বাজাচ্ছে—মাউথ অর্গ্যান। বেশ শুনতে লাগে। বাজায়ও চমৎকার। ছেলেটার এ-সব দিকে মাথা আছে। বলতে কি, গুণ অনেক ওর। চেহারাটা সুন্দরই। যেমন রঙ···মাসিমার চেয়েও ফরসা, তেমনি মুখ চোখের গড়ন—শরীর স্বাস্থ্য। গায়ে অসুরের মতন জোর। ভীষণ সাহস। দায়ে অদায়ে পড়ে আরতিকে দিয়ে কিছু কাজের কথা বলালেই করে দেয়। একদিন তাকে আর আরতিকে সিনেমা দেখিয়েছে। এই ত কাছেই রূপম।

উমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। ঝিঁঝি-ভোমরার গুঞ্জনটা যেন কেঁপে কেঁপে তার সামনে আলো-ছায়া ভরা উঠোনে নেমে এসে পড়ছিল। ওপরের দিকে তাকাল উমা। একটু আকাশ দেখা যায়, পাশের বাড়ির লম্বা দেওয়ালে খানিক চাঁদের আলো—আর কিছু নয়। বাসু তবে জেগেই আছে। একা, পাহারাদারের মতন। আর তারা সবাই ঘুমোচ্ছে! যদি সাইরেন বাজে, বোমা পড়ে—বাসুই তবে সকলকে জাগিয়ে তুলবে। বাসুর ওপর কৃতজ্ঞ হল উমা। মনে হল, দেখ এই শীতে ও একা জেগে থেকে সবাইয়ের আরাম করে ঘুমোনোর সুযোগ করে দিচ্ছে।

এখন ক'টা বেজেছে? কেমন দেখাচ্ছে আকাশটা? চাঁদ এখন কোথায়—মাথার ঠিক ওপরেই নাকি? জ্যোৎস্না কেমন? উড়ো জাহাজের কোন শব্দ টব্দ কি শুনেছে বাসু একবারও?

ঘরের দরজা বাইরে থেকে টেনে ভেজিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সটান ওপরে উঠে গেল উমা। ঢাকা বারান্দার একপাশে গা মাথা মুড়ি দিয়ে মাউথ অর্গ্যান বাজাচ্ছে বাসু।

কী শীত! উমা আঁচলটা খুব ঘন করে জড়িয়ে বাসুর কাছে এসে দাঁড়াল। 'ইস্ কী শীত!'

'খুব বাতাস যে।' বাসু বাজনা বন্ধ করল।

'জ্যোৎস্নাও খুব।' উমা উঠোনের আলো আর আকাশ দেখতে দেখতে বলল। 'ভয় করে।'

'আজ খুব ভাল চান্স্। তাক করে করে বোমা ফেলবে।'

'আজ আর ফেলবে না।

'বলেছে—!'

'ফেললে এতক্ষণ ফেলত।...কটা বেজেছে?'

'কে জানে।' বাসু ঠোঁটের গোড়ায় মাউথ অর্গ্যান তুলে আবার একবার ফুঁ দিল। খুব আস্তে বাজাতে লাগল। থেমে থেমে।

উমার শীত করছিল। কাঁপুনি লাগছে। ঠাণ্ডায় নাক কনকনে করছে, চোখের পাশে শিরাগুলোও। উমা যাব যাব ভাবছিল। বাসু আচমকা বললে, 'জাপানী এরোপ্লেনগুলোর দূর থেকে ঠিক এ-রকম শব্দ হয়।' মাউথ অর্গ্যানে চাপা একটা গুন গুন বের করতে লাগল। উমার মনে হল, ঠিক যেন একটা বোলতা আশে পাশে উড়ছে। একটুক্ষণ শব্দটা কান পেতে ভাল করে শুনল উমা। জাপানী এরোপ্লেনের শব্দ দূর থেকে এ-রকম শোনায় কি না তা ঠিক করতে পারল না।

শীতটা অসহ্য ঠেকছিল উমার। মুখ নাক কান ঠাণ্ডা কনকন করছে। হাত পা প্রায় অসাড়। 'কী ঠাণ্ডা, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। যাই।' একটু থেমে যেন অবাক হয়েই বাসুকে শুধোল, 'শীত করছে না?'

'করছে।'

'তবে?' অর্থাৎ তবে বসে আছ কেন?

বাসু জবাব না দিয়ে হাসল। উমা ভাল করে দেখতে পেল না। মনে হল, ও হাসছে। হাসির যে কি আছে—উমা বুঝতে পারল না। (বোঝার কথাও নয়। বাসু যে এই ঠাণ্ডায় বসে ছিল না, এবং নীচে থেকে আসবার সময় উমাকে না দেখলে মাউথ অর্গ্যান বের করে বাজাতে বসত না—তা জানবে কি করে।) একটু দাঁড়িয়ে থেকে সিঁড়ির দিকে চলল উমা। একবার আকাশের দিকে তাকাল। কোথাও কিছু নেই। উমার মনে হল, বাসু অযথাই বসে আছে,

ঠাণ্ডা লাগাচ্ছে। সিঁড়ির মুখে এসে ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার দেখল বাসুকে। তারপর তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ঘরে এসে বাতি নিভিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ নিখিলের দিকে তাকাল একবার। ঘুমোচ্ছে। মুখ হাঁ করে।...আর নিখিলকে ঘুমোতে দেখে আচমকা মনে হল—গরম গায়ের কাপড়টা ভালো করে জড়িয়ে আবার যদি সে ওপরে উঠে যায়—তা' হলে অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারবে; এত শীত আর লাগবে না।...উমা অবশ্য বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। ওপরে উঠল না।

গতকালের কথা ভাবতে ভাবতে আজ এখন উমার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিল। চোখের পাতা বুজে যাচ্ছিল। কান আর গালের কাছে টুপটাপ করে কি পড়ল। ক'বার। উমা গালে হাত দিল। কিছু না। চোখ চেয়ে তাকাল। কিছু নয়। উঠে বসল। কই কিছু না ত। আরতি বেঁকে চুরে অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। এদিক ওদিক তাকাতে চোখে পড়ল—কাগজের ছোট্ট দুটো পাকানো ডেলা পড়ে আছে। একটা বিছানায়—অন্যটা নীচে। এই কাগজ পাকিয়ে ছুঁড়ে মারছে কে? দরজার দিকে তাকাল উমা। কেউ নেই।

একটু ভাবল উমা। বাসু। নিশ্চয় বাসু। এ-সব তার কীর্তি। উমাকে না ঘুমোতে দেবার মতলব। চমকে দেবার।......উঠে পড়ল উমা। দরজার চৌকাট ডিঙোতেই চোখে পড়ল, বাসু চৌকাটের পাশে দেওয়ালে পিঠ ঠেস দিয়ে আঁট দাঁড়িয়ে আছে। উমা দাঁড়াল। কি কথা যেন মুখে এসেছিল, আটকে গেল। হাসি পেল। আ, কি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখ না! যেন কিছু জানে না। 'সাধুপুরুষ—!' উমা মাথা নিচু করে চোখের দৃষ্টিটা বেঁকিয়ে বলল।

'মানে?' বাসু এক পা সরে এল। উমার মাথা বাসুর বুক পর্যন্তও পৌঁছোয় না। তার ওপরে অন্তত আরও এক হাত দেড় হাত লম্বা বাসু।

'কাগজ ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিল কে?' উমাকে উঁচু দিকে চাওয়ার মতন ঘাড় মুখ উঁচু করে বলতে হল।

'কাগজ, কিসের কাগজ ?'

'আহা, জানেন না উনি ! ইয়ার্কি—!'

'আরে—আমি জানব কি করে ?'

'তা বই কি ! ভূতে ছুঁড়ছিল ?' উমা এবার মুখটা নীচু করলে।

'বা বাব্বা ! কিসের কি—! মা কালীর দিব্যি—'

'এই—' উমা মুখ উঁচু করে প্রায় ধমকের গলায় বাধা দিল।

বাসু হেসে ফেলল। 'কালী কালী আমার কিছু করতে পারবে না। ওসব আমার পেরাকৃটিস আছে। বাসু ভট্‌চায—একটা—একটা—'

'না পারুক। মিথ্যে কথা বলতে হবে তা বলে ?'

'মিথ্যে কথা ! হু—স্, কি হয়, কি হয় বললে ?'

'উচিত না। খারাপ।'

'ওঃ—হ ! খারাপ ! এ-পৃথিবীতে কোন শালা মিথ্যে কথা না বলে। লাট বেলাট রাজা—সবাই বলে।'

'আমি বলি না।' উমার গলা স্পষ্ট, বেশ দৃঢ়।

বাসু চুপ। একটু যেন বেসামাল মনে হল। কি বলবে না-বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। কয়েক মুহূর্ত, তার পরই সব ঠিক ; খপ করে ডান হাত বাড়িয়ে, পিঠ নোয়াল, 'আরে বাপ্‌স্—তবে ত ভগবান। পায়ের ধুলো নিতে হয়।'

উমা ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই তার হাঁটুর তলায় বাসুর হাত নেমে এসেছিল। তাড়াতাড়ি পা টেনে পিছু সরতে গিয়ে চৌকাটে গোড়ালি পড়ছিল আর একটু হলে। সামলে নিল। বাসু হেসে উঠল। উমা খুবই অপ্রস্তুত। চোখে নকল ধমক তুলে বলল, 'অসভ্য !,

বাসু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকল উমার দিকে তাকিয়ে।

একটু চুপচাপ। উমা বলল, 'বড় ঘুম পাচ্ছে। নীচে যাই—একটু ঘুমিয়ে নি।'

নীচে গিরিজাপতি এখনও ঘুমোয় নি। ঘরের দরজা বন্ধ ; বাতিও নিভনো। শুয়ে রয়েছেন ; মাঝে মাঝে তন্দ্রার গাঢ়তা আসছে, ফিকে হয়ে

যাচ্ছে আবার। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম কমে এসেছে। প্রথম রাত এই রকমই তন্দ্রাতন্দ্রা ভাবের মধ্যে কাটে বেশির ভাগ দিন।…ইদানীং মিহিরের প্রেসে কাজ নিয়ে ভেবেছিলেন—সাত আট ঘণ্টার খাটুনির পর যে ক্লান্তি আসবে, হয়ত তাতে রাত্রের ঘুমটা ভালই হবে। হয়েও ছিল গোড়ায়। তারপর যথারীতি—যে কে সেই।

ঘুম না আসার পরিণাম—এই চোখ বন্ধ করলে যত রাজ্যের চিন্তা গুহাগর্ত থেকে বেরিয়ে এসে চেপে ধরে। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। বরং আরও ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। প্রেস থেকে ফিরেছেন একটু সকাল সকাল। বোমা পড়ার হাঙ্গামা আর বিশৃঙ্খলায় কর্মচারীরা সন্ধ্যে ছ'টার পর কেউ আর থাকতে রাজী হয় নি। ছ'টায় প্রেস বন্ধ হয়ে গেল। মিহির বলল, 'আমরা আর তবে কেন শ্মশান জাগি গিরিজাদা, চলুন উঠে পড়ি।'

সকাল সকাল বাড়ি ফিরে দেখেন উমা সাত সকালে রান্নাবাড়া শেষ করে বসে আছে। ওপরের দেখাদেখি। যেন খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে হাত ধুয়ে সংসারের নিত্যকার হাঙ্গামাটা চুকিয়ে রাখা ভাল। গিরিজাপতির হাসি পায়। আবার ভেবে দেখেন, কাজটা বুদ্ধিমানের মতনই হয়েছে। সাইরেন আর বোমা এত অনিশ্চিত যে ভরসা করে রাত করা যায় না।…খানিক বিশ্রাম করে উমার তাড়ায় খাওয়া দাওয়া সেরে নিলেন। তারপর নিয়মিত অভ্যাস মতন ডেস্কের ওপর বাঁধানো খাতাটি রেখে 'নিজের কথা'র লেখাটুকু সারলেন। সামান্যই লিখলেন আজ। বিশেষ কিছু ছিল না। তারপর আরও খানিকটা বসে বিশ্রাম নিয়ে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে পাঁচ কথা ভাবতে ভাবতে একটি ভাবনা নিয়ে বেশ তন্ময় হয়ে পড়লেন। উমা আজ বলছিল, বেছে বেছে এমন সময়টাতেই এলেন কাকা কলকাতায়, যখন এই জায়গাটা যমপুরী। হৈ হল্লা আগুন গুলি বন্দুক—তার ওপর বোমা।

কথাটা ঠিকই। এ-সময় কেন এলেন কলকাতায়? গিরিজাপতি নিজেও ভেবেছেন। হেতমপুরের সঙ্গে কলকাতার জীবনের প্রভেদটা কম নয়। দীর্ঘকাল এক রকম বাঁধা ধরা ভাবে কাটিয়ে এখন তার কত অদল বদল হয়ে গেল। কলকাতার এই অলিগলি, অন্ধকার, চাপা বাতাস, ভিড় টিড়

গিরিজাপতির খুব পছন্দ নয়। কষ্ট এবং অস্বস্তিই হয়েছিল প্রথমে—কিন্তু কখনও মুখ ফুটে বলেন নি। অর্থহীন অভিযোগ অনুযোগ না করাই ভাল। তাতে কোনো লাভ নেই, খুঁত খুঁতুনি জানানো ছাড়া। জীবন যেখানে এক ভাবে কাটবার নয়, অদল বদল হবেই—সেখানে পরিবর্তনকে সহজ করে নেওয়াই ভাল। ভাল। গিরিজাপতি তাই করেছেন—করছেন।

হেতমপুর ওঁকে ছেড়ে আসতেই হত। প্রথম কারণ নিখিল। নিখিলের পড়াশোনার জন্যে কলকাতায় না এসে উপায় ছিল না। মেসে হোটেলে রেখে ভাইপোকে পড়ানোর খুব একটা পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। অত অর্থও নেই। উপরন্তু সময়টাও এমন—যাতে নিখিলকে কলকাতায় পাঠিয়ে তিনি স্বস্তি বা শান্তির মধ্যে থাকতে পারতেন না।

দ্বিতীয় কারণটাও তুচ্ছ করার নয়। গিরিজাপতি অর্থবান মানুষ নন। হেতমপুরে তাঁর জীবিকা ছিল—কলকাতার একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অর্গানাইজারী করা। অনেক কাল এই কাজটাই করেছেন। হেতমপুর আর আশপাশের পঞ্চাশ ষাট মাইলের মধ্যে ঘোরাঘুরি প্রায় নিত্যই ছিল। আলাপ পরিচয় বহুজনের সঙ্গে। মোটামুটি কাজটা ভালই করেছিলেন। ঠিক চাকরির বাঁধা ছকের জীবন নয়। অভ্যাস টভ্যাসও সেই রকম জন্মে গিয়েছিল। যা আয়—তাতে এক রকম স্বচ্ছন্দেই কুলিয়ে যেত। ইনসিওরেন্স অর্গানইজারী করার আগে অবশ্য মনিহারীর দোকান ছিল। বছর দুই তিন চলতে চলতে দোকানের যা চেহারা হল তারপর আর খদ্দের ঢুকত না। গিরিজাপতির নিজের মূর্খতা এবং অনভিজ্ঞতার ফলাফল দেখে কাণ্ডজ্ঞান জন্মে গিয়েছিল। দোকান তুলে দিলেন।...ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অর্গানাইজার হিসাবে কিন্তু কাজ মোটামুটি ভালই করেছিলেন। শেষের দিকে কোম্পানীর সঙ্গে একটা গণ্ডগোল বাধল। গিরিজাপতি গোঁ ধরলেন। অনেক চিঠি চাপাঠি, তর্কাতর্কি। শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিলেন গিরিজাপতি। নিখিলের বি এ পরীক্ষা শেষ হয়েছে তখন; ওকে কলকাতায় রেখে পড়ানোর চিন্তা দুশ্চিন্তা মাথায় ঘুরছে।

কলকাতায় আসার আরও একটা কারণ ছিল; প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ।

গিরিজাপতির মনে ইদানীং কেমন এক কলকাতা কলকাতা ভাব হয়েছিল! শহর কলকাতা তাঁকে ভীষণ ভাবে আকর্ষণ করছিল। মফঃস্বল শহরের নিস্তরঙ্গ একটানা জীবনের মধ্যে বর্তমান কালের কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অথচ গিরিজাপতি নিঃসন্দেহ এবং সচেতন ছিলেন, এমন একটা সময়ের মধ্যে মানুষ এসে পড়েছে যে-সময় আর আগে কখনও আসেনি। এই যুদ্ধ নিছক একটা ঘটনা নয়—তার চেয়ে অনেক বেশি, ভবিষ্যতের প্রশ্ন—সভ্যতার প্রশ্ন। মানুষকে হয় পিছিয়ে গিয়ে বর্বর উন্মাদ অস্বাভাবিক হতে হবে—এবং ঈশ্বরের পরিবর্তে দ্বিতীয় ঈশ্বরের কাছে মানুষকে তার সত্তা বিক্রি করতে হবে। যুক্তি জ্ঞান বিবেচনা বোধের আলোগুলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে আবার গুহাবাসী হতে হবে। হয় এই, না হয় সভ্যতার স্রোতের চারপাশ থেকে যে বাধা ময়লা পথ রোধ করে জমে উঠেছে—তাকে পরিষ্কার করে আবার স্রোতকে সামনের দিকে পথ করে দিতে হবে।

বর্তমান সময়কে তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল গিরিজাপতির। ভারতবর্ষ যতই না না করুক, এ-যুদ্ধের সঙ্গে তার ভাগ্য জড়িয়ে গেছে। পরিত্রাণ নেই। বরং তার ভাগ্য আরও জটিল। নিজের ঘরে আগুন লাগেনি, এই ভরসায় চার পাশের আগুনকে উপেক্ষা করার মতন মূর্খতা যদি তার হয়, ললাট লিখনের অনিশ্চিতি ছাড়া তার পথ নেই। অথচ, এই সময় যে মহামূল্য! সভ্যতাকে সঠিকভাবে চিনে নেওয়াই শুধু নয়—তাকে স্বাধীনতাও অর্জন করতে হবে। আর সে-স্বাধীনতা ইংরেজের হাত বদল হওয়া স্বাধীনতা নয়। দ্বিতীয় ঈশ্বরের, রঙ-বদল স্বেচ্ছাচারিতার পায়ে আত্মসমর্পণ না। এ-স্বাধীনতাকে মানুষের এবং সমাজের হতে হবে—ভুয়ো ঐতিহ্যের আর অন্ধ বিশ্বাসের গোঁড়ামির পঙ্ক থেকে মুক্তি।

গিরিজাপতির মনে হয়েছিল, হেতমপুর খুব ছোট আর অল্পশক্তির আতস কাঁচ—এই দূরবীক্ষণ দিয়ে আজকের আকাশ দেখা যায় না, যতটুকু দেখা যায়—তা কিছু নয়। কলকাতা সে-তুলনায় অনেক বড় আর বেশি শক্তির আতস কাঁচ—চোখ রাখলে গিরিজাপতি অনেক ভাল অনেক স্পষ্ট করে আজকের আকাশ দেখতে পাবেন।

সঠিক ভাবে গিরিজাপতির এই মিশ্র ইচ্ছা অথবা আগ্রহের সবটুকু তিনি নিজেই বোঝেন নি। হয়ত তা সম্ভব ছিল না। আসলে এই ব্যক্তিটির মনের তলায় যে আগ্রহী জিজ্ঞাসু কৌতূহলী চিন্তাশীল মানুষটি দর্শকের ভূমিকা নিয়ে বসেছিলেন—সেই মানুষটি এবার সেখানে আসতে চাইলেন—যেখানে তবু কিছুটা সময়ের তরঙ্গ আছে।

আজ উমার প্রশ্নের জবাব হিসেবে গিরিজাপতির এইসব কথা মনে পড়ছিল শুয়ে শুয়ে। কলকাতায় না এসে তাঁর উপায় ছিল না।

তন্দ্রার ভাবটা কখন গাঢ় হয়ে এসেছিল, আচমকা ভেঙে গেল। অন্ধকার ঘুটঘুটে ঘরে একটুক্ষণ চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখলেন গিরিজাপতি। হয়ত বোঝবার চেষ্টা করলেন এখন কত রাত ? আন্দাজে মনে হয় এগারোটা হবে কি হয়ে গেছে। নিখিল উমা—বোধ হয় ঘুমিয়েছে এতক্ষণে। ওরা যা শুরু করেছিল তার কিছু কিছু কানে গেছে গিরিজাপতির। ওদের কোনো দোষ বা দুর্বলতা তিনি আলাদা করে দেখতে পান নি। গত দু'দিন বোমা পড়ার পর কলকাতা শহরের অবস্থা এই রকমই দাঁড়িয়েছে। পুরো একটা বছর বোমা পড়বে পড়ছে করে মানুষ যখন এক রকম এই আশঙ্কাকে প্রায় অনিশ্চিতের কোঠায় ফেলেছে—তখন হঠাৎ পর পর দু'রাত একেবারে কলকাতা শহরের ওপর বোমা পড়ে তাদের জ্ঞান বুদ্ধি লোপ করে দিয়েছে। বোমা যখন পড়তে শুরু হয়েছে—তখন দু'দিনেই থামবে না, দশদিন ধরে চলবে —অথবা জাপানীদের কলকাতা আক্রমণ শুরু হয়ে গেল—এ-সব দুশ্চিন্তা ত হবেই। হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তার ওপর হুজুগে লোকদের হুজুগ, তিলকে তাল করা; গুজবে গুজবে শহর এখন সরগরম। কেউ তিথি নক্ষত্র মিলিয়ে বলে দিচ্ছে এই শুক্লপক্ষের মধ্যেই কলকাতা—জাপানীদের হাতে যাচ্ছে। বাংলা দেশটা ওরা নেবেই।

গিরিজাপতির নিজের ধারণা, মিহিরও একমত, যে-জাপানের এই আচমকা বোমা ফেলার মধ্যে বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। মিহির বলে, এ কিছু না; পাবলিকের মর‍্যাল ভাঙবার চেষ্টা। অ্যাটাক্ কি একে বলে, তা হলে সিঙ্গাপুর রেঙ্গুনের মতন করত। চোখে দেখতে দিত না

গিরিজাপতির আরও মনে হয়, বৃটিশ আর আমেরিকান বিমান বহর বর্মায় যে জোর বিমান হানা শুরু করেছে—আর আরাকানের মধ্যে দিয়ে বর্মায় ঢোকবার যে রকম আপ্রাণ চেষ্টা করছে, তার ফল এই কলকাতায় বোমা ফেলা। আসলে বৃটিশদের পিছনের ঘাঁটিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এগুনোর চেষ্টাটাকে রুখে দেওয়ার মতলব—কারুর কারুর অবশ্য অন্য ধারণা।

ব্যাপারটা এখনও খুব স্পষ্ট নয়, জাপানীদের মতলব কিছুই সঠিক ভাবে বলা যায় না। বিশেষ করে যুদ্ধের প্যাঁচালো দাবাচাল কাগজের খবর কুড়িয়ে অনুমান করা মুশকিল। একটা বিষয়ে শুধু নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, জাপানীদের অনেক দূর ঘাঁটি থেকে বোমা ফেলতে আসতে হচ্ছে। মাঝপথে বৃটিশদের ঘাঁটি। বেশ পাকা পোক্ত করে ফেলেছে গত একবছরে। জাপানীরা খুব সুবিধে করতে পারছে না; পারবেও না। এলো মেলো বোমা ফেলে পালাচ্ছে।

একটু সুস্থির সংযত বিবেচক হয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি! জাপানের মতি গতি বুঝতে দু'দিনের বোমাই যথেষ্ট নয়।

গ.

বারোটা বাজল। আরও খানিক উঠে এসেছে চাঁদ। আজ বোধ হয় ত্রয়োদশী কি চতুর্দশী। খানিক আগে এক খণ্ড মেঘ এসে জমেছিল। সরে গেছে। জ্যোৎস্না উথলে পড়েছে আবার। কুয়াশা আর হিমের চাদর পাতা রয়েছে শূন্যে। শান্ত স্তব্ধ নিঃঝুম রাত।

কানায় কানায় ভরা এমন নিস্তব্ধতা আচমকা ভাঙল। ভীষণ আচমকা। প্রথমটায় বিশ্বাস হয় না; মনে হয় ভ্রম। আতঙ্কের দুঃস্বপ্নের ভ্রম। কিন্তু না। কানের পর্দায় নিতান্ত রূঢ় সত্যটাই ধরা পড়ে। সাইরেন বাজছে। একটানা। যান্ত্রিক তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার নিস্তব্ধ শান্ত থমথমে তন্দ্র-কাঠ কলকাতার বুকে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। এই আকস্মিক আর্তনাদ কেমন মনে হয়! যেন কোনো অসহায় ব্যাকুলতা ত্রস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে।

সাইরেন বেজে যায়—রাত্রির স্বাভাবিক অসহায়তার অস্বস্তিকর ভারি মুহূর্তকে আরও ভীত ভয়ঙ্কর করে একটা ধাতব হুঁশিয়ারী ডাক দিয়ে যায়।

অন্যদিনের মতন আজ সুধাদের বাড়িতে অতটা হুটোপাটি ছুটোছুটি নেই। একটু অভ্যস্ত হয়ে গেছে সকলেই। সাইরেনের শব্দ কানে যেতেই রত্নময়ীর পাতলা ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসলেন। সুধাকে ডাকলেন। সুধারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ও-ঘরে আরতি মাথা মুখ ঢেকে ঘুমোচ্ছিল। বাসু টান মেরে উঠিয়ে দিল। তারপর আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল সকলে, বাসু বাদে।

গিরিজাপতির ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কী যেন বলছিলেন নিখিলদের। নিখিলদের ঘরেরও দরজা খোলা। ওরা ভাইবোনে জেগে উঠেছে।

রত্নময়ীরা উমাদের ঘরে এলেন। নিখিল একটা ছোট লণ্ঠন জ্বালিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে। টিম টিম সেই আলো কেমন একটু লাগল চোখে. এক কোণে লণ্ঠন, তার পাশেই কুঁজো ভর্তি জল, গেলাস।

সুধা আর আরতি উমার বিছানায় গিয়ে বসল। রত্নময়ী দরজার কাছে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকলেন। নিখিল পা গুটিয়ে বসল তার বিছানায়।

লণ্ঠনের মরা মিটমিটে আলোয় কিছুই দেখা যায় না। পাশের মানুষের মুখও অস্পষ্ট। তবু অনুমান করা যায় ঘুম ভাঙা মুখে চোখে কেমন এক অনিশ্চয়তার উদ্বেগ এবং ভয় বিহ্বলতা।

উমাই প্রথমে কথা বলল। হাই তুলে, খুলে-যাওয়া খোঁপা ঘাড়ের পাশে সরিয়ে দিতে দিতে—'এই ত এসে শুয়েছি—অমনি বাঁশি বাজল।' উমার গলায় বিরক্তি। সেই কখন থেকে জেগে বসেছিল; খানিক আগে এসে শুয়েছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে ধরেছে গভীরভাবে, এমন সময় সাইরেন।

আরতির এক দফা ঘুম হয়ে গেছে। তবু চোখ ঘুমে ভরা। বলল, 'এর চেয়ে দিনে দিনে সাইরেন টাইরেন বেজে যাওয়াই ভাল, না উমাদি! রাত্তিরে মানুষ ঘুমিয়ে বাঁচতে পারে।'

'তোমার আমার ঘুমের জন্তে ওদের কত মাথা ব্যথা!' নিখিল জবাব দিল, বিদ্রূপ গলায়।

কথা শুরু হয়ে হঠাৎ আবার থেমে গেল। সবাই চুপ। সুধার মুখ-মাথা হেঁট। বুকের মধ্যে কেমন এক অস্বস্তি। শীত শীতও করছে। আসবার সময় সুতির চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলে হত।

রত্নময়ী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে একপাশে এসে বসলেন। সুধার পাশেই।

'জাপানী এরোপ্লেনগুলো এতক্ষণ কোথায় এসে গেছে, নিখিলদা?' আরতি আচমকা শুধোল।

কোথায় এসে গেছে—নিখিল কী করে জানবে? কিন্তু কী আশ্চর্য্য, নিখিলের মনে হল, ঠিক এই কথাটা সেও ভাবছে। মনের মধ্যে আকাশ আর এরোপ্লেনের অদ্ভুত অস্পষ্ট ছবি ছাড়া আর কিছুই নেই। কল্পনায় দেখছে, অনেকগুলো প্লেন যেন ঝাঁক বেঁধে কলকাতার ওপর এসে পড়েছে। আকাশের তলায় বাতাস কাঁপছে থর থর করে।

জবাব দিল না নিখিল। দিতে পারল না।

অথচ আশ্চর্য, নিখিল বুঝতে পারল না, প্রশ্নটা যদিও আরতির, কিন্তু উমা, সুধা, রত্নময়ী—সকলের মনেই ওই একই জিজ্ঞাসা। জাপানী প্লেন এখন কোথায়—কতদূরে?

নিখিলকে চুপ দেখে উমা বলল, 'ওরা ত কলকাতার কাছে এসে পালিয়েও যেতে পারে।'

'পালাবে—! কেন? এদের ভয়ে—?' নিখিল গ্রাহ্য করল না, বিশ্বাসই করতে পারল না। অবশ্য পালিয়ে গেলে যে ভালই হয়—এক-কথাও না ভেবে পারল না।

'একটা বোমায় কত মানুষ মরে?' আরতি আচমকা শুধোল।

অদ্ভুত প্রশ্ন। কিন্তু, এখন—এ-সময়ে যেন এই প্রশ্নগুলোই স্বাভাবিক। জাপানী প্লেন কোথায়, একটা বোমায় কত মানুষ মরে—সঠিক ভাবে কে জানে কে বলতে পারে—তবু জানার আগ্রহ আছেই। এ এক অদ্ভুত কৌতূহল। আশ্বাসের জন্তে কিছুটা—কিছুটা বা স্থিরতার জন্তে।

আরতির প্রশ্নে নিখিল বিরক্ত হল। কেন কে জানে। বলল, 'বোকার মতন কথা বলো না। এ কি তোমার চাল ডালের হিসেব। এক সের চালে ক'জন খেতে পারে—?'

সুধা মুখ তুলল। দেখতে চাইল নিখিলকে। মুখের একটা ছায়া চোখে পড়ে; তার বেশি কিছু নয়। সুধা বুঝতে পারছিল, নিখিল ক্রমেই অসহিষ্ণু, অধৈর্য হয়ে পড়ছে। এই রকমই হয় ও। সুধা দেখছে আজ ক'দিন। আপদে বিপদে আকস্মিকতায় কেমন যেন হারিয়ে ফেলে নিজেকে। অন্য সময়ের সেই লাজুক নম্র বিনীত ভাবটা আর তেমন থাকে না। কেন?

সুধা বুঝতে পারছিল না। কিন্তু খুব আচমকা যেন নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, তার নিজের স্বভাবও অনেকটা ওই রকম। নিখিলের মতন সেও আপদে বিপদে আকস্মিকতায় অসহিষ্ণু অধৈর্য অস্থির হয়ে ওঠে। …সুধা একটু কম, নিখিল একটু বেশি। সুধা ভাবল, হয়ত মেয়ে বলেই চাপা স্বভাবের জন্যে স্বাভাবিক ভাবেই অতটা ও হতে পারে না, নয়ত নিখিলের মতনই হত। সাইরেনের শব্দ শুনলেই ছটফট করত, ছেলেমানুষী, পাগলামি, বমি—আরও কত কি যে! হয়ত—হয়ত—সুধাও অমনি ভাবে কেঁদে ফেলত ভয়ে ভাবনায়—যেমন করে নিখিল কাল কেঁদে ফেলেছে।

নিখিল কাল সত্যিই কেঁদে ফেলেছিল। কেউ জানে না। শুধু সুধা জানে, সুধা টের পেয়েছিল। বমি করার আগে—যখন মাথার ওপর প্লেনের মৃদু একটানা গুমগুম শব্দটা স্পষ্ট, প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর একটা কিছু এখুনি ঘটবে—ঠিক তখন অন্ধকারে ভুল করে নিখিলের হাত চেপে ধরে সুধা বদ্ধ নিঃশ্বাসে কী যে ব্যাকুলতায় আতঙ্কে পাথর হয়ে ছিল—এখন আর তা অনুভব করা যায় না—ঠিক তখন বুঝতে পারল, নিখিল কাঁদছে। সুধার মনে হল, তার হাতে কার যেন চোখের জল পড়ছে। আর কি আশ্চর্য, নিজের ভয় উদ্বেগ বিহ্বলতা সত্ত্বেও পলকের জন্যে নিখিলের ওপর একটু মমতা ও মায়া অনুভব করেছিল ও।

সুধার ভাবনা ছিঁড়ে গেল। গলিতে এ-আর-পির ছেলেদের গলার শব্দ। বাইসিকেলের ঘন্টিও। গলির মোড়ের মাথায় গ্যাসের আলোটা নিভিয়ে

দেবার জন্যে একজন আর একজনকে হাঁক দিচ্ছে। হুইসল্ দিল দূর থেকে কে একজন। নিঃশব্দ গলিতে ছোটাছুটি, জুতোর খট্‌খট্ শব্দ অদ্ভুত শোনাচ্ছে। টর্চ কেলে ফেলে, লোহার টুপি মাথায় ছেলেগুলো কটিক দে লেনের এলাকা পেরিয়ে শ্রীনাথ দাস লেনে চলে গেল। বাইসিকেলের ঘন্টি আগেই মিলিয়ে গেছে।

একটু সাড়াশব্দ উঠেছিল—এ-আর-পির ছেলেগুলো চলে গেলে আবার সব নিস্তব্ধ। ঘরে সুধারাও কেউ আর কথা বলছে না। আরতি শব্দ করে হাই তুলল। নিখিল কাশল। রত্নময়ী কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন—

হঠাৎ সিঁড়িতে দুড়দুড় শব্দ। তার পরই বাসুর চিৎকার—'প্লেনের শব্দ হচ্ছে—মা, ওমা—শুনছ।' মাঝপথ থেকে খবর শুনিয়ে বাসু আবার ওপরে ছুটে গেল।

আচমকা যেন কি-রকম এক সচকিত ভাব এসে ঘরের আবহাওয়া ভরে গেল। কানের পর্দা আকাশমুখী। ঘর চুপ। জোরে নিঃশ্বাস নিলে শব্দ পাওয়া যাবে যেন। কান ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইন্দ্রিয় কাজ করছে না। আর মন—অন্ধের মতন অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

...শব্দ ? কোনদিকে ? কই...!

'হ্যাঁ—ঠিক। শব্দই—' উমা ফিসফিস করে বললে। শব্দটা তার কানে গেছে।

নিখিল, সুধা, আরতি—আরও গভীরভাবে কান পাতল। 'কই শব্দ ? কোন দিকে ?'

'দিক—জানি না। আমাদের মুখের দিকে।'

'না—পাচ্ছি না। ভুল শুনেছিস।'

আবার চুপচাপ ক' মুহূর্ত। হঠাৎ সুধা বলে উঠল, 'সত্যি মা, শব্দই হচ্ছে।'

হ্যাঁ শব্দটা আর অস্পষ্ট নয়। যদিও মৃদু তবু শোনা যায়। ঠিক যেন কতকগুলো ভোমরা একসঙ্গে ভোঁ-ও-ও-ও করে উড়ছে, অন্ধকারে মাথার ওপর।

রত্নময়ী জোর হাতে মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করলেন। মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরটা গলিতেই।

আরতি উমার আরও একটু গা ঘেঁষে বসল। সুধার বুকের মধ্যে দমকা এক রক্তের স্রোত যেন উথলে এল। ধক ধক করে উঠল বুক। বেশ বুঝতে পারল সুধা, হৃদ্‌পিণ্ড দ্রুত হয়ে উঠেছে। নিখিলের দিকে তাকাল সুধা। দেখা যাচ্ছে না। একটা পাথরের ছায়া যেন।

সবাই উৎকর্ণ। বাইরে বারান্দায় গিরিজাপতিও বেরিয়ে এসেছেন। 'তোমরা সবাই ঘরের মধ্যে ত, নিখিল ?'

'হ্যাঁ, কাকা।' জবাব দিল উমা।

'বাসু ওপরে ?'

'হ্যাঁ।'

'কি দরকার—কি দেখার আছে ওভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে।' গিরিজাপতি যেন অনুযোগই করলেন। তারপর আর তাঁর গলা পাওয়া গেল না—। সম্ভবত ঘরে গিয়ে বসলেন আবার।

মৃদু চাপা শব্দের প্রতিধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল। বেশ স্পষ্ট। এখন মনে হচ্ছে যেন একটা স্টার্ট দেওয়া মটর গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। সামান্য দূরেই। ঘর···ঘর···। ক্রমশই একটু একটু করে কাছে আসছে—শব্দটা বাড়ছে।

'শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে বলতে পারিস দাদা ?' উমা শুধোল।

'জানি না ; যে দিক থেকে খুশি আসুক। চুপ কর তুই।' নিখিল ভয়ে উদ্বেগে, অসহিষ্ণু। 'খানিকটা তুলো রেখেছিলাম—কানে গোঁজবার জন্য। কোথায় গেল যে !'

রত্নময়ী উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। 'কোথায় যাচ্ছ ?' সুধা শুধোল। দরজার দিকে যেতে যেতে রত্নময়ী বললেন, 'ডাকি একবার—হারামজাদা ছেলেকে নিয়ে আমার যত জ্বালা। পাপ কোথাকার। পুড়িয়ে মারছে···।' রত্নময়ী বাইরে বারান্দায় চলে গেলেন। হয়ত সিঁড়িতে উঠছেন।

কি যেন হয়ে গেল হঠাৎ—বোঝা গেল না—ক্রমশ স্পষ্ট ঘর্ঘর ধ্বনি যেন পলকের মধ্যে হাওয়ার বেগে মাথার ওপর নেমে এল। গুম্ গুম্ বুক

কাপুনি শব্দ পাক খেয়ে আচমকা তীব্র তীক্ষ্ণ ক্ষিপ্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর আকাশের তলায় ঝলকে উঠল অদ্ভুত এক আলো। ফস্ করে যেন জ্বলে উঠল কতকগুলি আশ্চর্য মশাল। আলোর আভাটা ঘর থেকে চকিতের জন্যে বুঝি দেখতে পেয়েছিল নিখিল। খোলা দরজার বাইরে কেমন একটু রঙ হয়ে গেল না!

রত্নময়ী সিঁড়ির মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মনে হল দূরে কোথায় যেন আগুন ধরে লাল হয়ে উঠেছে। তার আভা এসে পড়ল। কিন্তু থাকল না ত; মিলিয়ে গেল। চতুর্দশীর ধবধবে জ্যোৎস্না টলমল করতে লাগল আবার।

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ক'টা বেয়ে রত্নময়ী ওপরে চলে এলেন। 'কিসের আলো রে, বান্টু?'

'কে জানে মা—!' বান্টু নিজেও অবাক। 'কি জোরসে আলো হল রে বাবা!' বোমা নাকি? বোমা পড়লে তার শব্দ পাওয়া যেত! বান্টু ভাবছিল; অথচ কোনো শব্দ টব্দ হল না। ব্যাপার কি। 'এ শালা সাউণ্ডলেস বোমা নয় ত!'

'ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না তোকে, নীচে চল।' রত্নময়ী বান্টুর হাত ধরে টানলেন।

জবাব দিল না বান্টু। হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। কানের পর্দায় একটা শব্দ কাঁপছে—মনে হচ্ছে একটা প্লেন যেন সোঁ—ও করে ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে কোনো দিক থেকে—তার ঘর্ঘর শব্দটা বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। শব্দটা বাড়ছে, বাড়ছে আরও বাড়ছে।

আবার। আবার সেই আলো। চকিতে ঝলসে উঠল। প্যারাশুট ফ্লেয়ার। একটুর জন্যে যেন আলোর একটা ঢেউ এসে ভেঙে পড়ল দূরে কোথায়। আলোর আভাটুকু মিলিয়ে যেতে যেতেই কেমন এক গম্ভীর ভারি মাটি ফেটে ওঠা শব্দ কানে এল।

'বোমা'! বান্টু অস্ফুট স্বরে বলল।

মুহূর্তের জন্যে রত্নময়ী অসাড়। বুকের ওপর সাংঘাতিক এক ভয় ছোবল

দিল। ধক্ ধক্ ধক্…বুক কাঁপছে। ছেলের হাত ধরে টানতে লাগলেন। 'নীচে চল—শীগ্রি—।'

বাসু তবু নড়বে না। বললে, 'তুমি যাও না—একটু দেখি।'

'হারামজাদা লক্ষীছাড়া কোথাকার—হবে না তোকে দেখতে। চল্—!' রত্নময়ী ধমকে উঠলেন।

'আচ্ছা ঝামেলা ত! আমার যখন যাবার হবে, আমি যাব। তুমি যাও।' বাসু বিরক্ত হয়ে জবাব দিল।

রত্নময়ীর আর সহ্য হল না। ঠাস্ করে এক চড় মারলেন, বাসুর গালেই, 'নচ্ছার ছেলে কোথাকার,—হাড়মাস জ্বালিয়ে খাচ্ছে আমার। মর—মর হতভাগা। বাঁচি আমি।'

চড়টা এত আচমকা যে বাসু হতভম্ব। রত্নময়ীর দিকে বোকা বিহ্বল চোখে তাকিয়ে যেন অর্থটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

ততক্ষণে আকাশ ফেটে পড়েছে। ভীষণ একটা শব্দ গোঁ গোঁ করে পাগলের মতন পাক খাচ্ছে। মাঝে মাঝেই ঝলসে উঠছে আলো। রত্নময়ী শুনতে পেলেন নীচে থেকে ডাকছে আরতি। গলা চিরে ফেলল ডাকতে ডাকতে।

রত্নময়ী সিঁড়ি নামতে লাগলেন। মাথা কেমন ঠাস হয়ে আছে। বুক কাঁপছে। দপ্ দপ্ করছে শিরা। পায়ে জোর নেই।…

ঘরের চৌকাটের কাছে পৌঁছতেই যেন কি হয়ে গেল। মনে হল সমস্ত বাড়িটা হুড়মুড় করে ভেঙে মাথার ওপরে পড়েছে। মাটি কেঁপে উঠল থর থর করে। কানে আর কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। দশটা মেঘ যেন একসঙ্গে ডেকে উঠল। বাজ পড়ার চেয়ে তীব্র ভীষণ একটা শব্দ সমস্ত জায়গাটা কাঁপিয়ে দিল। তারপর গুড় গুড় একটা টানা শব্দ যেন মাটির তলায় কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে ছড়িয়ে ভূগর্ভের কোথায় কোন অতলে তলিয়ে যেতে লাগল। রত্নময়ী যেন মাথা ঘুরে ঘরের মধ্যে ছিটকে এলেন।

মিটমিটে লণ্ঠনটা চেয়ারের ওপর থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেছে। ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার। আরতি ভয়ে আঁতকে উঠে চিৎকার করে উঠল। উমা

কি যেন বলল, কাঠ গলায়। দেওয়ালের গা থেকে ছবিটা ছিটকে পড়ে ঝন্‌-ন্‌-ন করে ভেঙে পড়ল। কাঁচ ছিটকে গেছে। নিখিল পাগলের মতন বকছে। মাথা মুণ্ডু নেই তার প্রলাপের। সুধা ডাকছে, 'মা—ওমা—মা।'

হঠাৎ সব চুপ। মনে হল ঘরের মধ্যে একটা গহন অরণ্যের ভীতিকর স্তব্ধতা নেমে এসেছে। ক'টি মানুষ সেই ভয় আর মৃত্যু আর অপার অন্ধকারের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে। প্রাণ নেই শ্বাস নেই।···মাথার ওপর একটা পাক দিয়ে মেঘের তলায় মেঘ ডাকার শব্দের মতন গুম গুম ধ্বনিটা ভেসে যাচ্ছে।

সুধা হাত বাড়িয়ে কাউকে ছুঁতে পারল না। তার মনে ভয় ভাবনা, আতঙ্ক অস্থিরতা, বাঁচার বাসনা, ভগবান, সুচারু—সব মিলেমিশে একাকার। জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে ক্ষণিকের জন্তে থেমে একবার যেন অতীত আর বর্তমানকে একসঙ্গে দেখে নিল। অস্পষ্ট জটিল এই আছি এই নেই মরীচিকার মতন।

উমা উঠে কোথায় যেন ছুটে যাবার চেষ্টা করছিল। পারে নি। পায়ে কি ফুটে গিয়ে বসে পড়েছে। হয়ত লণ্ঠনের ভাঙা কাঁচ, হয়ত ছবির টুকরো কাঁচ। বুকের তলায় ভয়ের পুঁটলি যেন তাড়াতাড়ি তার চেতনাকে গিঁট দিয়ে বেঁধে ফেলেছে।

নিখিল অসাড়। পাথরের মতন বসে আছে। কানে আঙুল দিয়ে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, নিশ্বাসটা এইবার থেমে যাবে। অসহ্য একটা আক্রোশও মনের তলায় যেন কামড়ে কামড়ে অস্থির করে তুলছে। মাথার ওপরের এই মৃত্যুকে দু'হাতে ঠেলে সরাবার জন্তে অসহায়ের মতন আকুলতা। যেন বিছানা চাপা পড়া কচি শিশুর শ্বাস নেবার চেষ্টা।

আরতি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আশপাশ হাতড়াচ্ছে—হাতড়াচ্ছে। মা, মা, মা কই!

সেই স্তব্ধতার আর শ্বাস বন্ধ গুমোটের মধ্যে কে যেন দৌড়ে এসে হুড়মুড় করে পড়ল। একেবারে উমার গায়ের ওপর। বান্টু। বুক ধক্‌ ধক্‌ করে কাঁপছে। শরীরটা ঠাণ্ডা। বরফ। শ্বাস দ্রুত। 'উরেঃ বাস—! বোমা

পড়েছে। কাছেই—।' বাসু একটা ঢোঁক গিলল। তার উত্তেজনা চোখে পড়ছে না কারুই, গলার শব্দে ধরা পড়ছে। 'কী শব্দ! কানে আমার তালা লেগে গেছে।'

বাসুর কথা থেমে গেল। মাথার ওপর প্লেনের শব্দটা আচমকা যেন আরও দ্রুত ধাবমান মনে হচ্ছে। অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্‌টের মুখ থেকে গোলাগুলো ঝাঁক বেঁধে বেঁধে আকাশে উঠছে। আর একটা বোমা পড়ল। তার শব্দটা তেমন জোর নয়। তারপরই বিশ্রী কর্কশ বাতাস ফুঁড়ে যাওয়া একটা টানা ঘর্ঘর শব্দ ছুটে আসতে লাগল—এদিক পানেই।

সবাই জ্ঞানে অজ্ঞানে উৎকর্ণ। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তটিকে গুণছে। ঝড়ো বাতাসে নিভু নিভু মোমবাতির শিখাটিকে অপলকে দেখার মতনই। অদ্ভুত একটা অচেতনতায় শরীর মন স্নায়ু অসাড়। ভয় আর হতাশা হাহাকার করে উঠেছে। আকাশ থেকে হুহু করে কী যে আতঙ্কের দমকা বয়ে আসছে। ঘরের দেওয়ালে, বাতাসে অন্ধকারে আলুথালু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সেই হাওয়া ; কখন থেকে। এখন যেন সব জমে কঠিন জমাট হয়ে গেছে।

নিশ্বাস নিতে যে কত কষ্ট হয়, কথা বলতে যে কী অসহ যন্ত্রণা সইতে হয় —এ ঘরের ক'টি মানুষ এবার তা অনুভব করছিল। অনুভব করতে পারছিল, তারা কী নিঃসঙ্গ অসহায়। কেউ নেই। কোথাও। শুধু একটা ফাঁকা পারাপারহীন অন্ধকারে নিষ্ঠুরের মতন কেউ তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আর মৃত্যুর একটা থমথমে বাতাস গলার মধ্যে জমে জমে শ্বাস বন্ধ করে ফেলছে।

মাথার ওপর থেকে প্লেনের ভয়ঙ্কর কুৎসিত গর্জনটা সরে যেতে যেতে আর একবার চমকে দিল। বোমা পড়ল। কাছে, খুব কাছে। ঘর দুলে উঠল। কাঁপল থর থর করে। পায়ের তলায় মাটি যেন ফেটে যাচ্ছে মনে হল, মাথার ওপর কড়ি বরগা ভেঙে যাচ্ছে। জানলা দরজা ঠক ঠক করে কেঁপে কেমন এক শব্দ হল। ঠিক যেন ভূমিকম্প হচ্ছে।

নিখিল দৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে যেতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে রত্নময়ী আর সুধার গায়ে ছিটকে পড়ল। আরতি ভয়ে ভীষণ ভাবে চিৎকার করে কেঁদে

উঠেছে আবার। সুধার লেগেছে। প্রাণপণে নিখিলের শরীরটা ঠেলে দিল। রত্নময়ী বিড়বিড় করে মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকছেন। উমা বাসুর হাঁটু আঁকড়ে ধরে মুখ ঠেসে রেখেছে। বাসুর মনে হচ্ছে—কি যেন তার পিঠের ওপর ভেঙে পড়ছে। উমার মাথাটা আরও কাছে টেনে নিয়ে পিঠ পেতে থাকল বাসু। তার হাতের তলায় উমার বুক ধক্ ধক্ করে কাঁপছে। ভয় আর অদ্ভুত এক ভাল লাগার মধ্যে বাসু পিঠটাকে ক্রমেই শক্ত করে তুলতে লাগল।

মুহূর্ত কাটছে। যেন সময় নয়, সমুদ্রের জল—শেষ নেই। শেষ নেই এর। শব্দ দূর থেকে দূরে ভেসে যাচ্ছে। বোমা পড়ার ক্ষীণ শব্দ বার কয়েক ভেসে এল। তারপর সব চুপ, নিস্তব্ধ, নিঃঝুম।

গিরিজাপতি বারান্দায় এসে পায়চারি শুরু করেছেন। খানিকটা চাঁদের আলো নীচের দালানে ছিটকে এসে পড়েছে এতক্ষণে।

সুধা মৃদু গলায় ডাকল, 'মা'। রত্নময়ী অস্পষ্ট স্বরে সাড়া দিলেন। আরতি হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে আসছিল। উমার গায়ে হাত ঠেকতে ডাকল, 'দিদি।' উমা একটু চমকে উঠে আলাদা হয়ে গেল।

এগারো

কলকাতা ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে মানুষ। ঠিক এক বছর আগে, গত শীতে, এই রকম ডিসেম্বর জানুয়ারীতে লোকজন পালিয়েছিল। এবারও পালাচ্ছে।

আর কি থাকা যায় কলকাতায়? ভরসা কি রাখতে পারে মানুষ? না। কখনই না। শোনা কথা, উড়ো গুজব—মিথ্যে আতঙ্ক ত নয়; এ যে চোখে দেখা—নিজেদের কানে রাতের পর রাত জেগে শোনা: বার বার সাইরেন বাজছে, কী বিশ্রী ভাবে ককিয়ে ককিয়ে, জাপানী প্লেন আসছে ঝাঁক বেঁধে, বোমা ফেলছে। সরাসরি শহরের ওপরই পড়ছে বোমাগুলো, বাইরে নয়; মিলিটারী ক্যাম্প—তেলের টাকি, কামান-বন্দুকের আড়ত, এরোড্রোম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তছনছ করে দেবার উদ্দেশ্য ওদের নেই। থাকলে ডালহৌসি, মিশন রো, হাতিবাগান বাজার, ক্যালকাটা ফ্লাওয়ার মিল—এ-সবের ওপর বোমা পড়বে কেন? খিদিরপুর ডকে ত ক'বারই পড়ল। আরও এদিক সেদিক শহরের আনাচে কানাচে। তবু কিসের জোরে বিশ্বাস করবে—কলকাতা শহর জাপানীদের লক্ষ্য নয়! বিশ্বাস করা যায় না। সাতে পাঁচে, লড়াই যুদ্ধে কোনো কিছুর মধ্যে যারা নেই, সাধারণ মানুষ—বাজারের ফড়ে, তরিতরকারি বেচা নিরীহ দোকানদার, কুলি মুটে মজুর—তাদের মাথাও নিরাপদ নেই। বোমার ঘায়ে তারাও মরল। বাজারের চাল উড়ে গেল—শাকসব্জির লরি ঘাড় মুখ গুঁজে কোথায় ছিটকে গেল—রাশ রাশ হাত পা ধড় কাটা মানুষের রক্তমাংস হাড়ে স্তূপীকৃত হল পথ। অথচ চিহ্নটুকু পর্যন্ত রাতারাতি কোথায় যে মিলিয়ে গেল—কেউ জানল না। এমন সর্বনাশ, আতঙ্ক মাথায় নিয়ে মানুষ কি থাকতে পারে?

রোগ শোক দুঃখ উপবাস—সবই পরের কথা। আগে প্রাণ, জীবন

যদি বেঁচে থাকে মানুষ—তবেই না সব। জীবন গোড়ার কথা, ভোগ দুঃখ পরের কথা।

বাঁচার স্পৃহা প্রবল! নিজেকে যেমন করে হোক রক্ষা করার ইচ্ছা কী তীব্র! বাঁচতে হবে—মৃত্যুর এই বীভৎস মুঠো থেকে যেমন করে হোক ফস্কে পালাতে হবে।

পাঁচদিনের বোমায় হাজার পনেরো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পালাল। আর তারপর শুধু পালাও পালাও রব—। মরতে চাও কলকাতায় থেকে? তবে? এখনও কোন ভরসায় বসে আছ? আজই পালাও।

মানুষ পালাচ্ছে। যেমন করে গতবছর পালিয়েছিল। হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদা বলে শুধু নয়—হাওড়া ময়দান, বেলগাছিয়া, কালীঘাট-ফলতা—হাজারে হাজারে মানুষ এসে জড়ো হচ্ছে। গিসগিস ভিড়। মানুষ আর মানুষ। বুড়ো, জোয়ানমদ্দ, বাচ্চা কচি-কাচা মেয়েছেলে—সব। সব রকমের, সব রকমের। কী সাঙ্ঘাতিক ভিড়। স্টেশনের গেট থাকছে না; ভেঙে পড়ছে চাপে, ঠেলায়, ধাক্কা ধাক্কিতে। পুলিসের সাধ্যে কুলোয় না; মিলিটারী তলব করে ভিড় আর স্টেশন সামলাতে হচ্ছে। ট্রেন-ট্রেন-ট্রেন। একটা দুটো স্পেশ্যাল ট্রেনে কি হবে! প্লাটফর্মে ঢুকতে না ঢুকতেই ফুটো-ফাটা নৌকার মতন চোখের পলকে ভিড়ের জলে তলিয়ে যাচ্ছে ট্রেনগুলো। অবাঙালীর সংখ্যাই বেশি। কামরার ভেতরে জায়গা নেই তিলধারণের—পা-দানীতে মানুষ ঝুলছে। মাথার ওপর চড়ে বসেছে। আঁকড়ে ধরে আছে কিছু একটা! কার সাধ্য তাদের নামাবে। নামাতে গেলে হাউমাউ করে কাঁদে, পায়ের তলায় আছাড়ি পিছাড়ি খায়। ন'মাসের পোয়াতী বউকে বাংকের ওপর একপাশে ঠেলে পুঁটলির মতন ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে—পাংশু মুখ অসহ যন্ত্রণা নিয়ে বসে আছে তবু। থুড়থুড়ে বুড়ি—মদ্দ জোয়ান সব ঠাসাঠাসি হয়ে রেল কামরার পায়খানার মধ্যে ঠাসা। বেঞ্চির তলায় মধু লোভী মাছির মতন এঁটে রয়েছে একরাশ মানুষ। না পারে নড়তে—না পারে হাত পা ছড়াতে।...তারই মধ্যে থুতু, বমি, বিড়ির ধোঁয়া, মূত্র। কেউ মূর্ছা যাচ্ছে, যক্ষ্মা রুগী কাশছে একটানা—ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে ছেলে বউ-

হারানো মন্দ জোয়ান। একটা ট্রেন নয়—সব ক'টা প্লাটফর্মে যতগুলো ট্রেন ছাড়ছাড় সব কটারই একই অবস্থা। গাড়ি দাও—আরও গাড়ি—মানুষগুলো চিৎকার করছে, পা ধরছে—ছোটাছুটি করছে, সাধ্যে কুলোলে ঘুষ। মালগাড়ি যাচ্ছে, তার মাথায়ও লেপ কম্বল মুড়ি দিয়ে মানুষ ঠায় সারারাত অসহ্য শীতের ঠাণ্ডা ভোগ করে পালাচ্ছে। ওয়াগানে ওয়াগানে কয়লা কি লোহার শিট্ বোঝাই—তার ওপর চেপে রয়েছে মানুষ। তারা নামবে না। নামানোও যাচ্ছে না।

ট্রেন নেই ত, হাঁটা পথ। কলকাতা শহরের ট্যাক্সি, বাস, ঠেলাগাড়ি, রিকশাবালাদের আর এক মরসুম। তবু ত রিকশাবালাদের অনেকেই পালিয়েছে মজুরী কামাই আর পেটের দায় ভুলে গিয়ে। সারা দিন, সারারাত, ভোর—মানুষ শুধু চলেছে হেঁটে হেঁটেই—মোট ঘাট যতটা সম্ভব ঘাড়ে পিঠে নিয়ে। ফ্যাকাশে মুখ, গর্তে ঢোকা চোখ।

যারা হেঁটে সড়ক ধরে কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে—তাদের নাকি পথের মধ্যে চিঁড়ে গুড় জল বিলোন হচ্ছে সরকারী পয়সায়। সরকারী প্রচার অন্তত তাই। আসলে কিছু না। সব ফক্কা। বর্ধমানে পৌঁছলে কয়েক মুঠো ভিজে ছোলা পাওয়া যায়। কচিকাচার জন্যে জলো দুধ দু' হাতা করে।

বাইরে এই অমানুষিক হুড়োহুড়ি ভিড় ছুটোছুটি—ভেতরের অবস্থা কি? থমথমে। যেন হাসপাতালের বিছানায় পড়ে থাকা এই-যায় সেই-যায় রুগী সব। নিষ্প্রাণ, হতাশ, আতঙ্ক শুষ্ক মুখ। আশা নেই, আস্থা নেই, বিশ্বাস নেই; ভরসাও না। নিয়তি আর ভাগ্য ভরসা। ভগবান সম্বল। উপায় কি তা ছাড়া? দিল্লী থেকে বড়লাট সাহসের প্রশংসা করছে, বাংলার গবর্নর বাহবা দিচ্ছে, কাগজে কাগজে বার বার লিখছে: জাপানী বোমা কলিকাতার জনসাধারণের মনোবল ভাঙিতে পারে নাই—এই প্রশংসা বাহবা মনোবলের ফাঁকা কথায় কতটা সত্য আছে—মানুষ তা জানে। মুটে মজুর গোয়ালা, সব্জিঅলা ঝাড়ুদার মেথর রিকশাবালা ধোপা কোথায় গেল সব? শহরে বাজার বসে যেন হরতালের দিনে দু' পাঁচটা দোকান লুকিয়ে চুরিয়ে বিকিকিনি করছে, বাড়িতে দুধ আসে না, লণ্ড্রীতে কাপড় দিলে কবে পাওয়া যাবে কিছু

ঠিক নেই, গাড়ি ঘোড়ার অসুবিধে, রিক্শা পাওয়া ভার—দিনের পর দিন শহর কলকাতার রাস্তায় একটু জল পড়ছে না, ময়লা উঠছে না রাস্তা থেকে—নোংরা আবর্জনা উড়ছে বাতাসে—ডাক্তাররা ভয় দেখিয়েছে—কলেরা টাইফয়েড বসন্তের টিকে নাও। তবু বলো, মনোবল অটুট আছে!

হ্যাঁ, আছে। কাদের—? যাদের মাস আয়ের ভরসায় খাওয়া পরা রোগ শোক—সব কিছু মেটাতে হয়। আল্প আয়ের কেরানী, খুঁজে খুঁজে মক্কেল ধরা ছোট আদালতের উকিল, দোকানপত্রের কর্মচারী, স্কুলের মাস্টার, কলেজের অধ্যাপক, বড়বাজার কি চিনেবাজারের পটিতে চরকি-ঘোরা ছেঁড়া-জুতো দালাল, টুকটাক ব্যবসা করা ব্যবসায়ী—এমনি সব। এরাই পড়ে আছে। মনোবলের জন্যে নয়, অর্থবলের অভাব বলে। গত বছর হুজুগে পড়ে এরাও পালিয়েছিল। ধার দেনা কর্জে মাথা ডুবিয়ে, গয়না গাটি বেচে কিছুকাল মফস্বলের হাওয়া খেয়ে ফিরে এসেছে, বুঝেছে দু'নৌকা বয়ে যাওয়া তাদের সাধ্যাতীত। ঘা খাওয়া, পিঠ ভাঙা মানুষ আর পা নড়াতে রাজী নয়। উপায় নেই বলেই। তারাই পড়ে আছে, পড়ে থাকবে—জাপানী বোমায় না মরা পর্যন্ত। ভাগ্য ভগবান অদৃষ্ট ভরসা করে এরাই থেকে গেল।

ধনীরা পালিয়েছে নয়, হাওয়া খেতে গেছে। টাকার দিস্তে দিস্তে নোট বালিশের মধ্যে তুলোর আড়ালে ভরে, অ্যাটাচি ভারি করে—গিন্নীদের সোনা দানা ব্যাঙ্কে মজুত দিয়ে দেওঘর কি জামতাড়ার বাড়িতে শীতের হাওয়া খেতে গেছে। অন্য কোনো দুর্ভাবনা নেই···একমাত্র দুশ্চিন্তা কলকাতার বাড়িটা যদি নষ্ট হয় বোমায়। তা আর কি করা যাবে—এ-সব ভগবানের হাত। টাকা গয়নার জন্যে চিন্তা নেই। ব্যাঙ্কের সেফ কাস্টডিতে থাকল। ব্যাঙ্ক যথাস্থানে রাখবে। নষ্ট যদি হয় আবার কড়ায় ক্রান্তিতে মিলিয়ে গুণে ফেরত দিতে হবে। তারপরও যা—তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। অদৃষ্ট।

আবার সেই খাঁ খাঁ কলকাতা। দিনের আলোয় কিছু মানুষের মুখ চোখে পড়ে, সন্ধ্যের অন্ধকার জমতে না জমতেই সব ফাঁকা। দোকানপত্র

বন্ধ হয়ে আসে; আটটার পর আর ট্রাম বাস চলে না, নিঝুম স্তব্ধ ভয়ে-কাঠ কলকাতার রাস্তায় বাড়িতে আকাশ চুইয়ে হিম ঝরে, কুয়াশা ঘন হয়। থমথমে অসাড় মরুভূমির মতন শহরের স্পন্দনহীন পথগুলো ঘুমিয়ে থাকে। কচিকাচা বুড়োবুড়ি নিয়ে কিছু মানুষ ইট-কাঠের তলায় আধোঘুম আধো-জাগরণে রাত কাটায়, উৎকর্ণ থাকে সাইরেন কখন বাজবে! কখন—!

সাইরেন আর বাজে না। দিনের পর দিন যায়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। কৃষ্ণপক্ষ শেষ হয়ে আবার শুক্লপক্ষ। কী আতঙ্ক, কী ভয়, প্রতি মুহূর্তে মনে হয় সাইরেন বুঝি বেজে উঠল। সাইরেন তবু বাজে না। ডক থেকে জাহাজের বাঁশি বেজে যায় রাতকে চমকে দিয়ে, মাথার ওপর এরোপ্লেন পাক খায়, বেলুন ওড়ে এখানে ওখানে। বোমারুরা তবু আসে না। মাঘের খরখরে ঠাণ্ডা হাওয়া কখন একদিন থেমে আসে। একটু উষ্ণতা, একটু আরাম। খানিক স্বস্তি। জীবনের তাপ আবার যেন অনুভব করা যায় সামান্য। বেঁচে আছি! কী আশ্চর্য! এ যে কত বড় বিস্ময় নিজের কাছেই তা যেন অসহ মনে হয়। মনে হয় যেন এই বাঁচা আর-এক জন্ম! নব জন্ম!

বারো

ভয় বড় না ভরসা—সঠিক ভাবে বলা মুশকিল। একটা সময় এসেছিল, যখন মনে হয়েছিল ভয় ছাড়া কিছু নেই। মানুষ আর-কিছুর বাদ বিচার করতে পারছে না। মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্তে পাগলের মতন তারা পালাচ্ছে; আর ফিরবে না। এই পুরানো সুন্দর সাজানো শহরটা দিনে দিনে আরও ফাঁকা হয়ে যাবে। তার সৌধচূড়ার কতক মাটির সঙ্গে মিশবে—কতক দাঁড়িয়ে থাকবে বাজ-পড়া-গাছের মতন সর্বস্বান্ত করুণ চেহারা নিয়ে। রাস্তায় আর ট্রাম বাস চলবে না, আলো হয়ত আর কোনোদিনই জ্বলবে না পথে। মুখর ডালহৌসি ফাঁকা, থমথম করবে চৌরঙ্গি, রাস্তায় রাস্তায় হয়ত ঘুরে বেড়াবে ক'টা দিশি কুকুর, পার্কের গাছগুলো পুড়ে পুড়ে ছাই, ঘাসের চিহ্ন নেই, ফেটেফুটে চৌচির মাটি। ধাপার মাঠ ছেড়ে শকুনিগুলো চলে এসেছে শহরের মধ্যে। সূর্যের আলোর তলায় সারাদিন আকাশ কালো করে উড়ছে। আর—? আর যে কি, মানুষের ভীত কল্পনাতেও ভাল করে তা ফুটে উঠত না। ভেঙে-চুরে ছত্রভঙ্গাকার, ফাঁকা, নিস্তব্ধ—মৃত একটা শহরের ছবিই শুধু মনে আসত।

অথচ, কি আশ্চর্য, পাঁচ ছটা মাস পুরো কাটতে না কাটতে কলকাতা শহরের অবস্থা যা দাঁড়াল—তার সঙ্গে ওই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের কোথাও মিল ঘটল না। জাপানী বোমা পড়ার পর ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘরবাড়ি ছেড়ে স্থান কাল পথ-বিপথ রোগ শোক কিছুর বিচার না করে মানুষ পালিয়েছিল। আধখানা শহরই খালি হয়ে গিয়েছিল চোখের পলকে। তারপর ক'টা দিন—পুরো একটা মাসও কাটল না—দু-দশজন করে ফিরতে শুরু করল আবার কাছাকাছি জায়গা থেকে। যেন উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখছে। মাস দুয়েকের মধ্যে—বাজার হাট রিক্শা খাটাল আবার ভরে উঠতে শুরু করল। এবং শীত গিয়ে, বসন্ত ফুরিয়ে যখন গরম পড়ছে—তখন কলকাতা শহর ভিড়ে ভরে উঠেছে।

পক্ষী চরিত্রের সঙ্গে মনুষ্য চরিত্রের কোথাও মিল না থাকুক এখানে অন্তত আশ্চর্য একটা পশুজ অভ্যাসের মিল আছে। ভয় এলে মুহূর্তে শাখা শূন্য করে পালায়—ভরসা পেলে আবার ফিরে আসে ঝাঁক বেঁধে।

মানুষ ভরসা পেয়েছিল। জাপানীরা আর বোমা ফেলছে না। কেন? ফেনী চট্টগ্রামে যদি বা কদাচিত হানা দিয়ে যাচ্ছে—কলকাতায় আসছে না। কেন? কারণটা কি? অত যাদের শক্তি, ইচ্ছে করলে রাতারাতি কলকাতা বোমা মেশিনগানে ভেঙে-চুরে ফাটিয়ে গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিতে পারে—হঠাৎ তারা থেমে গেল কেন? কোথাও কিছু একটা হয়েছে। হয় ঘাবড়ে গেছে—না হয় মতি বদলেছে।

আর এদিকে দেখ। এই ক'মাসে এ-তরফের হাল বদলে গেছে। রাশি রাশি সৈন্য সামন্ত গোলা বারুদ ট্যাংক গাড়ি এসে জমছে। কাগজের উড়ো খবর, সরকারী স্তোক বাক্য, রেডিয়োর নির্বিকার মিথ্যের ওপর ভরসা বিন্দুমাত্র না রেখেও বোঝা যায় এরা কি ছিল—আর কি হতে চলেছে।

কলকাতা থেকে দু-পাঁচ মাইল দূরে রেললাইনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায়, দিন নেই রাত নেই মিলিটারী স্পেশ্যাল ট্রেন চলেছে। মাল-গাড়ি গুণেও কূল পাওয়া যায় না। রসদ আর তেল আর গুলি-গোলার যোগান। শাস্ত্রী পাহারা। সমস্তটা বাংলা দেশ মিলিটারী ক্যাম্পে ক্যাম্পে ছেয়ে গেছে। কাঁটা তার, বড় বড় ট্রাক, সঙ্গীন উঁচু কালো রুক্ষ মুখ।

শহর কলকাতার চেহারাও কেমন বদলে যাচ্ছে। কত বিচিত্র মানুষ এসে জড়ো হয়েছে এখানে। চৌরঙ্গি এসপ্লানেড গড়ের মাঠে এসে দাঁড়ালে মনে হয় এ এক অন্য শহর। অন্য দেশ। ফোর্ট উইলিয়মের গহ্বর আর আউটরামের জেটি ভেঙে যেন অদ্ভুত এক পঙ্গপাল এসে জুড়ে বসেছে এই ছিমছাম এলাকায়। মিলিটারী—আর্মি যা খুশি বল। থৈ থৈ ভিড় খাকী ট্রাউজার আর শার্টের। দিশে পাওয়া দায়। আগে মনে হত সব এক—গোটা বৃটেনকে যেন এখানে এনে মাল খালাসের মতন কেউ খালাস করে দিয়ে গেছে। চোখ সইয়ে নিতে যতটা দেরি, তারপর আর অজানা থাকে

না। ওরা আমেরিকান—একটু চেকনাই চেহারা আর সাজ পোশাক যাদের। খাকী কোর্তায় বিশ্রী কটকটে রংটা নেই, কাপড়টাও করকরে বুনোনের নয়। বরং ঠিক উলটো, গায়ে ঘিয়ের রঙ খাকী—রেশম রেশম আভা, নরম জমাট বুনোন। চেহারাটাও রুক্ষ নয়। মাথার চুল অল্প। গোড়ালির কাছে ট্রাউজারের ভাঁজ বা পাট নেই। কোমরে বেল্ট। মাথায় মনোহর টুপি। বৃটিশদের সঙ্গে তফাতটা বোঝা যায় আরো সহজে কাঁধের দিকে তাকালে। কিংবা টুপির দিকে। উদ্দিগুলো আলাদা। ক্যানেডিয়ান সোলজারদেরও চিনে ফেলা যায় একটু নজর করলে। অস্ট্রেলিয়ানও কিছু আছে; আর আছে নিগ্রো, চীনে। পলকেই যাদের ঠাওর করে ফেলা যায়।

শুধু কি এই? এখন চোখ সবই দেখেছে—চিনেছে। বলা সহজ, ওরা নেভি, ওরা এয়ার ফোর্স; ওরা আর্টিলারি। এক থেকে অন্যটা আলাদা; সাজে পোশাকে; কাঁধের পিঠের ঝোলানো উদ্দিতে, টুপির ধরনে।

এই কোথা থেকে আসা—কোথায় হারিয়ে যাওয়া ধারার সঙ্গে মিশে গেছে দিশি মিলিটারী—শিখ, জাঠ, মারাঠী। চটকদার বেশভূষা নয়। বরং দৈন্য সাজ। তবু কড়া আদব কায়দায় পথ চলে বুটের ঠোক্কর মেরে। কঠিন আর রুক্ষ মেজাজে।

আগে মানুষ যা দেখেনি—এখন দেখছে। সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ কাঁপিয়ে কনভয় চলছে। একের পর এক মিলিটারী গাঢ় খাকী রঙ বড় বড় ট্রাক। চলছে ত চলছে—শেষ নেই। অগুনতি। একের পর এক। নিগ্রো ড্রাইভার। যমের মতন চেহারা। কনভয়ের মধ্যে কখন সখনও কটা ট্যাংক থাকে। রাস্তায় ভিড় করে লোকে ট্যাংক দেখে। কী অদ্ভুত চেহারা। যেন এক দৈত্য। রাস্তা বাড়ি থর থর করে কাঁপে। কাঁপা মাটির তলায় গুম্ গুম্। মাথার ফুটোর ঢাকনি সরিয়ে লোহার টুপি আঁটা লাল মুখ একটা সোলজার দাঁড়িয়ে থাকে। কখনও বা মসৃণ শব্দ তুলে—ছোট কামানের খাড়া মুখ জাল চাপা দিয়ে চলে যায়। কনভয়ের আগে ছোটে চোখে-ঠুলি-আঁটা মটর-বাইক চাপা মিলিটারী পুলিশ—কনভয়ের শেষে জীপ। খানকয়েক। এ এক অদ্ভুত গাড়ি। পুচকে—কেমন বেয়াড়া চেহারা।

কিন্তু চারটে চাকার ওপর কোন মানুষ সঙ্গে আঁট হয়ে থাকে—পলকে উধাও হয় নাগাল ছাড়িয়ে।

কলকাতার আকাশটাও আর অত শান্ত নয়। মাথার ওপর প্রায় সারাক্ষণই প্লেনের গর্জন। হুস্ করে এক কোণে শব্দ ভেসে ওঠে আচমকা, মুহূর্তে শব্দটা আর এক কোণে মিলিয়ে যায়। আবার কখন অন্য কোনো কোণে আর এক মৃদু গর্জন কাঁপতে থাকে।

মফস্বলও নিরিবিলি অসাড় নিরুপদ্রবে নেই। বন জঙ্গল অজ পল্লীগ্রাম নদীর চর, খাঁ খাঁ মাঠ, ঝোপ ঝাড় গোটা বাঙলা দেশটাই খাকী কোর্তা, হালকা তাঁবু, ইঁট কাঠ টালি, খড়ের ছাউনি—সোলজার ব্যারাকে ভরে আসছে। কোথাও টিনের শেড—লম্বা—আধখানা চাঁদের মত গোল—মাটিতে উদয় বিলয়। কিসের ডিপো—কে জানে! হয়ত গুলি বারুদের। ওরই এ-পাশ ও-পাশে কোথাও অফিস, টেবিল, চেয়ার—কালো বোর্ড—বেঞ্চ। দু দশ পা এগুলে অশ্বত্থ কাঁঠাল নিম গাছের ঘন ছায়ার তলায় মিলিটারী ট্রাকের ডিপো, ইঁটের শক্ত গাঁথুনি দিয়ে সিঁড়ি তোলা। কি হয় ওখানে? গাড়ি সারাই।

চোখ বুজে না থাকলে অল্পতেও এই বিপুল আয়োজন না দেখে পারে না. সে কি শহরে কি শহরের বাইরে গ্রাম গ্রামান্তরে। সারা দিন ভরে যেন বিশ্বকর্মার আর এক রাজত্ব সৃষ্টি হচ্ছে; লরি ভরে ভরে ইঁট, কাঠ, সিমেণ্ট, বাঁশ, টালি, টিন—কোথা থেকে আসছে—কোথায় যাচ্ছে। রাশ রাশ কুলি কামিন। হরেক রকম ঠিকাদার। নানা বেশভূষার লোকদের যাওয়া আসা। রাতারাতি ঝোপ জঙ্গল সাফ হয়, ধু ধু মাঠে কতক লরি আর মানুষ চরে—; দেখতে দেখতে একটা গাঁথুনি দাঁড়িয়ে যায়—লম্বাটে ধরনের; তার গা ঘেঁষে ঘেঁষে আরও কটা টানা লম্বা ব্যারাক। এজমালি পায়খানা—কল ঘরও। ইঁটগুলো লাল রঙ দিয়ে ভরে দেয়, কাঠের গুঁড়িতে আলকাতরা। একপাশে বুঝি রান্না ঘর; ধোপাখানা। তারপর এই নতুন রাজত্বের পত্তন শুরু হয়ে যায়—খাকী কোর্তা দিশী বিদেশী মানুষে। বুটে বেয়নেটে কাঁটা তার আর বারুদ পেট্রলের গন্ধে। যুদ্ধের চেহারা যে এত বড় —এ-দেশের মানুষ এই প্রথম দেখল।

আর কত মানুষ লাগে এক যুদ্ধে? তারও হিসেব নেই। সারা দেশের কথা থাক—এই কলকাতাতেই দেখা যাচ্ছে অমন অসংখ্য রিক্রুটিং অফিস। হেস্টিংসের রাস্তার দুপাশে অমন ঝকঝকে বাহারী বাড়িগুলো সবই প্রায় এখন রিক্রুটিং অফিস। ঝাড়ুদার, মেথর, ড্রাইভার, মটর মেকানিক থেকে মিলিটারী ক্লার্ক—কি না নেওয়া হচ্ছে এখানে! ওদিকে থিয়েটার রোড, মে রোড, পার্ক ষ্ট্রীট। কোথাও সাপ্লাই, অর্ডনান্স, পাইওনিয়র, হসপিটাল, লেডি আর্টিজান, এয়ার ফোর্সের মেকানিক···। রিক্রুটিং অফিসগুলো পত্তন হয়েছে আগেই, তখন দু'দশ জন অনেক কষ্টে পথ চিনে চিনে হাজির হত—এখন সব ঠোঁটের আগায়। সকাল আটটা থেকে রিক্রুটিং অফিসের সামনে ভিড় জমে যায়। স্যুটপ্যান্ট, ধুতি জামা, ময় পাজামা ছেঁড়া শার্ট—হরেক রকম মানুষ, নানা ভাষা। দেখলে মনে হয়—মুঠো মুঠো ছড়ানো দানার উপর অসংখ্য পায়রা এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

একদিন বাসুও এসেছিল এখানে। একা নয়—তার নতুন বন্ধু নন্দীর সঙ্গে। এ-আর-পি' তে ঢুকে নন্দীর সঙ্গে বন্ধুত্ব। বয়েসে নন্দী অনেকটাই বড়। চেহারায় ধরা যায় না। কালো, রোগা; একটু বেঁটে, মুখের একপাশে বড় একটা আঁচিল, চোখে সাদা ফ্রেমের চশমা। ম্যাট্রিক পাশ। বউবাজার পাড়ার ছেলে নয়—যশোর খুলনা কোথায় যেন ছিল আগে—পেটের দায়ে শহরে এসে নানা ঘাটের জল খেয়ে এখানে ভিড়েছে। গিরিবাবু লেনের একটা ঠিকানা দেওয়া আছে—বাসা বাড়ি। আসলে ওর ঘর দোর কিছুই নেই—এ-আর-পির অফিসেই তার ডেরাডাণ্ডা। ভাঙা স্যুটকেসের মধ্যে দু'তিনটে জামা কাপড়—একটা গামছা, সুতীর চাদর। এ-আর-পি অফিসের আলমারির মাথায় স্যুটকেসটা চাপানো থাকে। আর গামছাটা বাইরে দড়ির ওপর। ভাতের হোটেলে এক বেলা খায়, আর এক বেলা উড়ের দোকানে মুড়ি বাতাসা—গিরিবাবু লেনের মুসলমানের দোকানের রুটি গোস্ত—না হয় ময়রা দোকানে দু'চার খানা লুচি—ডাল।

নন্দীর সঙ্গে বাসুর ভাব হয়েছিল বড় অদ্ভুত ভাবে। জাপানী বোমা পড়ার পর—পাড়ায় পাড়ায় এ-আর-পি-র হুজুগটা খুব বেড়ে গেল রাতারাতি। ফটিক দে লেন, হালদার লেন—মলঙ্গা পাড়ায় এ-আর-পি পোস্টের ইনচার্জ হাসান সাহেব পাড়া চক্কর মেরে আরও কিছু ছেলে ছোকরা জোটাবার চেষ্টা করছেন। বাসুর সঙ্গে মুখ চেনা ছিল। নিউ বউবাজার লেনে পাকড়াও করলেন। আলতু ফালতু দু-চারটে কথার পরই আসল কথা পাড়লেন হাসান সাহেব, 'ভট্‌চায এ-আর-পিতে জয়েন কর, আমার ওআর্ডে তোমায় নিয়ে নি। পাড়ার ছেলে—তোমরা যদি না লাগো এ-সময় চলে কি করে ? লেগে পড়—বুঝলে ?'

এ-আর-পি হবার বাসনা যে কখনও না ছিল বাসুর তা নয়, তবে সিভিক গার্ড ছাড়বার সময় পল্টু কাপ্তেনের সঙ্গে যে-রকম ঝগড়া-ঝাটি মারপিট করেছে তার পর পাড়ায় এ-আর-পি তে যে তার জায়গা হবে না এটাই সে জানত। পল্টু শালা খুব মাল লোক। পুলিস থেকে শুরু করে এ-আর পির স্টাফ অফিসার, ফায়ারের ইনচার্জ, সব ক'টার সঙ্গে তার দহরম মহরম। এক বোতলের ইয়ার। পল্টু থাকতে বাসুকে পাড়ার এ-আর-পিতে টিকতে দেবে না। হয়ত শালা স্টাফ অফিসারকেই লাগিয়ে দেবে। কিংবা কণ্ট্রোলারের অফিসে গিয়েই টিপে দিয়ে আসবে। সব করতে পারে পল্টু।

হাসান সাহেবকে কথাটা খোলাখুলি বলল বাসু। জানতেন যেন হাসান সাহেব সব। কান দিলেন না। আচ্ছা—আচ্ছা—সে দেখা যাবে।

পরের দিন সকাল বেলায় নন্দী এসে হাজির। খুঁজে খুঁজে বাসুকে এসে ধরল চায়ের দোকানে। সেখান থেকে টেনে নিয়ে গেল—গুপী বসু লেনের গা-লাগানো সাহেবী স্কুল বাড়িটার এক কোণে—এ-আর-পি পোস্টে। হাসান সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা। নন্দী নিজেই একটা দরখাস্ত লিখল। সই করলে বাসু। দুপুরে নন্দী এসে আবার টেনে নিয়ে চলল এ-আর-পি কণ্ট্রোলারের অফিসে। নাছোড়বান্দা ছেলে। পরের দিন গণেশ অ্যাভিনিউর ওপর স্টাফ অফিসারের এক চিলতে অফিসে হাজির করল। স্টোর থেকে নীল প্যাণ্ট, শার্ট, এক জোড়া শু-জুতো, মায় একটা টুপি পর্যন্ত টেনে বের করে বাসুর

বগলে পুরে দিয়ে বলল, 'ব্যাস্—হাসান সাহেবের পোস্টে এবার একবার করে হাজিরা দেওয়া!'

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বাসুকে বোঝাল, সরকারী পেনসান—তিরিশ টাকা মাসে মাসে। কে ছাড়ে—মশাই! এ-আর-পিকে আমি বলি এনিওয়ানস রয়েল পেনশেন। লড়াইয়ের বাজারে সব বেটা কামিয়ে নিচ্ছে—আমরাই শুধু ফালতু নাকি!

তা ঠিক, তিরিশ টাকা কম নয়। কিন্তু বাসু তখনও চিনির সঙ্গে কণ্ট্রোলের দোকানে চাল টাল ধরছে—এ আর পি-তে আটকে থাকলে লোকসান। মনটা তাই খুঁত খুঁত করছিল।

নন্দী বলল, 'ধ্যাত মশাই—লোকসান আবার কি। আপনাদের পাড়ায় একটা ত কেবল দোকান কণ্ট্রোলের—সারাদিন পাড়ার লোক এঁটে রয়েছে। দু চারটে ও-দিকের কণ্ট্রোলের সঙ্গে খাতির করিয়ে দেব, ধরবেন আপসের তিন পো রোজ। এ-আর-পি হয়ে এটুকুও যদি না হল ত কোন শালা থাকে! টেরিটি বাজারে সেদিন চাল দিল—এ-আর-পিদের—বিলকুল ঝেড়ে দিলাম। ছাগলের নাদির মত গন্ধ—ইয়া মোটা মোটা। তাই পাঁচ সের বিক্রি করে দিলাম ডবল দামে।'

এই নন্দী বেশ কিছুদিন পরে একদিন বাসুকে বলল, 'এই ভট্‌চায—কাল একজায়গায় যাব। যাবে নাকি?'

'কোথায়?'

'গেলেই মালুম হবে। শুনছি দশটা টাকা ঝাড়তে পাড়লে ভাল চাকরি পাওয়া যায়।'

'কিসের চাকরি?'

'মিলিটারী।'

'আই বাপ্—!' বাসু নন্দীর দিকে চেয়ে চক্ষু গোলাকার করলে, 'যুদ্ধে যেতে হবে। না বাবা, বাপের এক ছেলে—যুদ্ধে টুদ্ধে যেতে পারব না।'

'তুমি ত বাপের তবু এক ছেলে, আমি যে আধখানা—হাফ্।'

বাসু বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। কেমন একটু থত মত ভাব।

নন্দী বলল, 'আমি যখন মার পেটে—আমার বাবা মাকে কলা দেখিয়ে পালায়। আচ্ছা চিজ মাইরি। কেত্তন গাইত। ভেগে গেল ত গেলই। পাঁচ বছর আর পাত্তা নেই। মামার বাড়িতে মানুষ হচ্ছি। পাঁচ বছর পরে বাবা ফিরল, আর একটা বউ নিয়ে। মামারা আমাদের যেতে দেবে না, বাবাও ছিনে জোঁকের মতন লেগে থাকল। বলে বউ ছেলে না দিলে আত্মহত্যা করব। মার টান ছিল—, অবাক মাইরি—হিঁদু মেয়েদের রকমই আলাদা। বাবার কাছে এলাম। দু'টো মা। বাবা পটল তুলল। দু মা মিলে রাঁধুনীগিরি করে মুড়ি ভেজে সংসার চালায়। স্কুলে পড়েছি—মাদের পয়সায়। কষ্ট হত, ভাবতাম লাটে তুলে দি পড়াশুনো। মা-রা কুরুক্ষেত্র করত। ম্যাট্রিকটা লেগে গেল। তারপর এক প্রাইমারী স্কুলে পড়াতাম। যুদ্ধ লাগতে উঠে গেল। চাকরি খুঁজতে বেরিয়ে—ঘুরে ঘুরে এখানে। ম্যাট্রিক পাশকে কেউ চাকরি দেয় না মাইরি—এই লড়াইয়ের বাজারেও।'

বাসু চুপ। খানিকটা বিহ্বল। বিস্ময়ও আছে। কি বলবে না বলবে ঠিক করতে পারছিল না। যেন দম নিতে খানিক সময় লাগল। বলল, 'তোমার মা-রা এখন কোথায়?'

'দেশে।'

'আর কোনো ভাই বোন নেই?'

'তবে আর আধখানা বললুম কেন! ভগবান শালা ওই এক জায়গায় বাঁচিয়েছে। থাকলে আরও ঝামেলা বাড়ত।'

রীতি মত ভেবে চিন্তে বাসু এবার বলল, 'তবে তুমি যুদ্ধে যাবে কি করে?'

'কি করে আবার—ভেগে পড়ব। টাকা পত্তর পাঠাবো মাদের। এই তিরিশ টাকায় কিছু হয় না। একবেলা খাই অর্ধেক মাস। কণ্ট্রোলে চাল ফাল ধরতাম—তাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কণ্ট্রোল ত উঠে যাবে।'

'কে বললে?'

'খোদ মালিক সুরাবর্দী। কাগজ পত্র কিছু দেখ না ভট্টচায—বেড়ে আছ। নো কণ্ট্রোল। এবার সাত আটশ দোকান হবে কলকাতায়। রেশন শপ।' নন্দী এক মুহূর্ত থামল, 'হাসান সাহেবের মুখে শোন নি—এ-আর-পিদের

যাচ্ছে পাড়ার ঘরে ঘরে কতজন মানুষ আছে তার হিসেব নেবার ভার চেপেছে।'

বাসুর খেয়াল হল হাসান সাহেব আর তার অ্যাসিস্টেন্ট চৌধুরীবাবু দিস্তে কয়েক খয়রা কাগজ নিয়ে ক'দিন যাবত খুব উঠে পড়ে লেগেছে—বউবাজারের এই পাড়াটার গলি ভাগ করছে—নাম ধাম লিখছে। কন্ট্রোলের সবে ধন নীলমণি দোকান উঠে যদি এ-পাড়াতেই চার পাঁচটা দোকান হয়ে যায়—তবে ত শালা গেল—সব রোজগার খতম। বাসুর এতদিন ধরে এত খাতির জমানো কন্ট্রোলের দোকানটার সঙ্গে—সবই বিলকুল জলে পড়ল।

মনটা বিগড়ে গেল বাসুর। বলল, 'আরে ও সরকারী গুলপট্টি। ছেড়ে দাও শালা। সব করবে বেটারা।'

নন্দী হাসল। হাসিটা সত্যই বড় সুন্দর নন্দীর। কালো মুখ, সাদা সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমা—ছোট ছোট দুই চোখ যেন হাসিতে টইটম্বুর হয়ে ওঠে। নন্দী বললে, 'ভট্টচায, আমি কুইনিন ব্ল্যাক করতাম। সে এক মক্কেল ছিল। দিয়ে যেত। খুঁজে পেতে ঝাড়তাম। একদিন শালা ধরা পড়ে গেলাম, কুইনিন নয়—সেরেফ আটার গুলি চালাচ্ছিল মক্কেল। ওই যে—দত্ত ফার্মেসী। আঃ—শালা ধরে আমায় কী অপমানটাই করল মাইরি—বাপ মা তুলে গালাগাল। নেহাত শালারা ফেঁসে যাবে—তাই আমায় পুলিসে ধরিয়ে দিল না।'

'তুমি ত বেশ চালু ছেলে বাবা।' বাসু হাসল।

'ছিলাম।' ঘাড় নাড়ল নন্দী। 'এখনও চালু থাকতে পারি। এই গুপী বসু লেনের বস্তির খানকিগুলোর কাছে আজকাল সন্ধ্যে থেকে রাত তক দিশি সোলজারগুলো আসে। সব কটার গর্মির রোগ—সিফিলিস—। একটা ওষুধ আছে—খুব কাজে লাগে। পাওয়া যায় না বাজারে। ব্ল্যাক চলছে। নিও সালফার সন্। একটা বিক্রি করতে পারলে ছাঁকা তিন চারটে টাকা থাকে কম-সে-কম। তাও ঝেড়েছি পাঁচ সাতটা। এখন আর সাহস হয় না। পাইও না।' একটু থামল নন্দী; বিড়ি ধরাল—বাসুকেও দিল। বলল আবার, 'এত সব করে মাসে মাদের বিশ পঁচিশটা টাকা পাঠাতাম।

এখন দশটা টাকাও পাঠাতে পারি না। যুদ্ধের একটা মোটামুটি চাকরি পেলে লেগে যাই। ওরা খেতে পরতে দেয়—পোশাক টোশাক সবই। মাইনে থেকে কিছু হাত খরচা রেখে বাকিটা পাঠিয়ে দেব।'

নন্দীর পাল্লায় পড়ে বাসু একদিন এসেছিল রিক্রুটিং অফিসে। কোনো বড় লোকের বাহারী বাড়ি—দিব্যি বাগান টাগান ঘেরা। ভাড়া নিয়ে রিক্রুট অফিস খুলেছে এরা। লোকজন, আশেপাশের অবস্থা দেখে বাসুর মনে হল, ঠিক যেন কোনো কারখানার ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—দুপুরের খাওয়ার ছুটিতে। বিস্তর লোক। কেউ গাছতলায়, কেউ রাস্তায়, কেউ বা ফটকের মধ্যে, বাগানে। ছোট ছোট জটলা, বিড়ি সিগারেট ফোঁকা। এখানেই গুটি দুয়েক তেলেভাজা চা মুড়ির দোকান, পান বিড়ি ফিরি, তোলা-উনুন ঠেলাগাড়ি চায়ের দোকান। জাত ধর্ম বয়স অ-বয়সের বিচার নেই। সাজ পোশাকেরও। ওরই মধ্যে একটা উড়ে গণৎকার এসে বসেছে। খদ্দেরও পাচ্ছে কম না।

নন্দী বললে, 'চল ভট্চায, ভেতরে গিয়ে খোঁজ নি, কোন লাট বেলাটের চাকরি আছে।'

অত বড় বাড়িটার সামনে পিছনে—এ-ঘর সে-ঘরে ছড়ানো ছিটনো লোক। খাকী পোশাক পরা জমাদার থেকে কেরানী, পাগড়ি আঁটা সুবেদার থেকে রাশভারী ক্যাপ্টেন। সিনেমার বিজ্ঞাপনের মতন বড় বড় রঙীন পোস্টার আঁটা এখানে সেখানে। চওড়া বুক সঙ্গীন উঁচু সৈনিক।...নন্দীর সঙ্গে আধ-ঘণ্টাখানেক শুধু ঘুরল বাসু। এর তার কাছে। দরজায় দরজায়।

ঘুরতে ঘুরতে বাসুরও কেমন একটা ঝোঁক চেপে গেল হঠাৎ। যুদ্ধের চাকরি? নয় বা কেন? কি এল গেল তার? এত লোক যদি ভয় ভাবনা খোয়াতে পারে—সে-ই বা নয় কেন? না, ভয় তার নেই। মরা বাঁচার পরোয়া সে করে না। একদিন মরতে হবেই।

নন্দীর সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকের বারান্দা ধরে এগিয়ে চলল বাসু। মনের মধ্যে আচমকা কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব এসেছে। বাবা, মা—দিদি আরতির কথা মনে পড়ছে। আর কি আশ্চর্য, বাসু যেন অনুভব করতে

পারছে—বাড়ির সবাইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেটেকুটে ছিঁড়ে খুঁড়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। বাবা যদি বেঁচে থাকত আজ, বাসু ভাবছিল—সে যুদ্ধের অফিসে এসেছে শুনলে ছুটে আসত। আগলে ধরত তাকে, কি রে যুদ্ধের খাতায় নাম লেখাতে এসেছিস যে বাঁদর, বাড়িতে ভাত জুটছে না। চল—ফিরে চল শীগ্গির।

বাসুর হুঁশ হল—নন্দীর ঠেলা খেয়ে। চমকে উঠে দেখে—নন্দী একটা ছোট ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। ডেস্কের সমান উঁচু জানলার ওপর হাত বাড়িয়ে কি নিচ্ছে যেন। ফর্ম।…নন্দীর হাতে খাকী রং কাগজের ফর্ম দেখে—বাসুও হাত বাড়িয়ে দিল। জানলার ও-পাশ থেকে খাকী রঙের জামা পরা লোকটা কি শুধোল। বাসু শুনতে পেল না; মন ছিল না তার। তবু মনে হল যেন শুধোচ্ছে—লিখতে পার? ইংরাজি হরফ? বাসু মাথা নাড়ল। আন্দাজে। লোকটার চোয়াড়ে ধরনের মুখটাও স্পষ্ট দেখছিল না। সব যেন কেমন ভাসা ভাসা। কি বুঝল লোকটা কে জানে—একটা ফর্ম এগিয়ে দিল। হাত বাড়িয়ে নিল বাসু। সামনে চেয়ে দেখে, নন্দী তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে—কাঁকর ঢালা রাস্তায়।

বাসু পিছু পিছু এল নন্দীর। কম্পাউণ্ডের মধ্যে গাছতলায় জনা কয়েকের জটলা। পোস্টাফিসে মনিঅর্ডার-লেখা-লোকের মতন দোয়াত কলম নিয়ে বসে আছে রোগাটে চেহারার এক বাবু; টুলের ওপর শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে, টেবিল সামনে নিয়ে। তাকে দিয়ে ফর্ম লেখাচ্ছে লুঙ্গি পাজামা পরা জনা চারেক।

'একটা কলম যদি মনে করে আনতাম ভট্চায!' নন্দী বলল, সদুঃখে; 'ওশালার কাছে কে যায়—নিজেই লিখে নিতাম।'

বাসু জবাব দিল না। ফর্মটাও সে দেখে নি। হাতের মধ্যে ভাঁজ হয়ে আছে। ঘামে ভিজছে।

'দাঁড়াও দেখি, ওই ভদ্রলোক যদি কলমটা একবার দেন।' নন্দী ছুটল প্যাণ্টপরা এক ছোকরার পেছনে।

বাসু চুপ করে ছায়ার তলায় দাঁড়িয়ে। আর কি, নন্দী কলম আনলে

—এই কাগজের ওপর কিছু লেখা—নাম ধাম হয়ত। তারপর—? তারপর আর যুদ্ধের চাকরি হতে কতক্ষণ। ওরা যাকে পাচ্ছে লুফে নিচ্ছে। যে আসছে তাকেই। বাসুর আবার এমন তাগড়া শরীর।

যুদ্ধের চাকরি যেন হয়েই গেছে বাসুর। সে এক রকম নিঃসন্দেহ। হঠাৎ এই দুপুরে, গাছতলায় দাঁড়িয়ে বউবাজার ফটিক দে লেনের বাড়ি থেকে নিজেকে সাত তেপান্তরের দূরের মানুষ বলে মনে হতে লাগল। খবরটা যখন মা-র কানে যাবে—কি করবে মা? বাসুর হাত চেপে ধরবে? কাঁদবে ডুকরে ডুকরে? মাথা খুঁড়বে? হয়ত। হয়ত বাসুর ঘরের বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেবে; বলবে, মা মঙ্গলচণ্ডীর নামে দিব্যি কর হতভাগা, তবে তালা খুলবো। ······কিন্তু যদি এমন হয়, মা কিছু না বলে! কিছু না। বাসু যুদ্ধে যাচ্ছে শুনলে খুশীই হয়। একটা চাকরি জুটিয়েছে ছেলে—এতেই খুশী হবে! বাড়িতে টাকা পাঠানোর উপদেশ দেবে বড়জোর! ব্যাস—! কথাগুলো ভাবতেই বাসুর বুক থেকে গলা পর্যন্ত কেমন কনকন করে উঠল।

নন্দী এল। কলম চেয়ে এনেছে। ঘাসের ওপর বসে পড়ল। উবু হয়ে। জুত পাচ্ছে না, কাগজ কেঁপে যাচ্ছে লিখতে গিয়ে। তবু লিখছে। উরুতের ওপর রেখে।

বাসু একটা বিড়ি ধরিয়ে দু-চার-পা এদিক ওদিক করল। রাস্তা দিয়ে বাস যাচ্ছে। হর্ণের আওয়াজ। সামনে, গোল চত্বর মতন উঁচু দালানের ওপর মিলিটারি পোশাকে একটা লোক দাঁড়িয়ে—হাতে কাগজ, হেঁকে ডেকে নাম পড়ছে বোধ হয়। একরাশ লোক তার পায়ের কাছে উঁচু মুখে দাঁড়িয়ে। দালানের খিলানে লতানো গাছে ফুল। বাতাসে দুলছে। বাসুর মনে হল, ওই লোকটা যাদের নাম হাঁকছে—তাদের সব হয়ে গেল—যুদ্ধে তারা ভর্তি হয়ে গেল।

বাসুও। খট্ করে মনে হল বাসুর। যেন শুনতে পেল আরও খানিক পরে—ওই লোকটা তার নাম ধরে ডাকছে—বাসুদেব ভট্টাচার্যি···বাসুদেব ভট্টাচার্যি···। বুকের মধ্যে কেমন একটা মোচড় দিয়ে একটা মোটা শিরা

কেউ টিপে ধরল। অসহ্য কষ্ট বোধ করতে লাগল বাসু। দিদির কথা এবার মনে পড়ল।

দিদি খুব খুশী হবে। খুব। সবচেয়ে বেশি। বাসু চাকরি করত না, দিদি করত। দিদির মাইনের টাকায়—তাদের দু-বেলা কোনো রকমে দুমুঠো জুটত। এতেই দিদির কী দাপট, তেজ, চড়াচড়া কথা। মার সঙ্গে, বাসুর সঙ্গে। বাসুকে ত কুকুরের মতন করে সারাক্ষণ দিদি। যা তা গালাগাল। বাবা বেঁচে থাকলে, এই মেয়ের কি এত তেজ থাকত? বাবা নেই, মা বেচারী মেয়ের হাত ধরা—কাজেই দিদির ওপর আর কে কথা বলে! বাসু চলে গেলে একমাত্র ও খুশী হবে। ভাববে, যাক আপদটা গেছে।

আমি এখন তোমার পয়সায় খাই না—: বাসু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে মনে মনে বলে ফেলল হঠাৎ, দিদিকেই সামনে রেখে, বিশ্রী আক্রোশে: আমার রোজগার আছে। ···দিদি যে গ্রাহ্য করল না! বেঁকা মুখে, ঠোঁট উলটিয়ে হাসল। ···বাসু বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। কী বিশ্রী যে লাগছে তার কী অসম্ভব খারাপ। দিদিকে যাচ্ছেতাই করে কিছু বলবার জন্যে যেন জ্বলে পুড়ে মরছে।

তা ত হবেই—বাসু জোরে জোরে পা ফেলে দূরে কলটার দিকে এগিয়ে চলল, দিদি ত খুশী হবেই। অথচ সেই শালা দিদির ফ্রেণ্ড—হ্যাঁ, লভার—সুচারুবাবু—সে-শালা সেদিন যুদ্ধে যাবে—ইয়া কী নেমন্তন্নর ঘটা—যাবার সময় মুখ শুকনো, চোখ ছলছল, নীচে নেমে আর ফিরে আসে না—। জানা আছে বাবা, সব জানা আছে। লভারের বেলায় দিদির কী টান, বুক ফেটে যাচ্ছিল—আর ভাইয়ের বেলায় গ্রাহ্যও নেই—ফিরেও তাকাল না, যেন রাস্তার লোক—যুদ্ধে যাচ্ছে যাক—মরুক বাঁচুক কিছু যায় আসে না দিদির, শালা দুনিয়াই এমনি, মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়ে—দু-চারটে চুমু খাওয়া লভারই বড়।

বাগানের একপাশে কলটার সামনে এসে দাঁড়াল বাসু। প্যাঁচ কল। খুলে দিল। একটুক্ষণ হাত পেতে থাকল জলের তলায় তারপর; পেট ভরে জল খেয়ে নিল। মুখে চোখে বেশ করে জল ছিটালো। না, বেশ গরম পড়ে

গেছে। জামার হাতায় মুখ মুছে তাকাল বাসু। ঘোরটা যেন কেটে গেছে অনেকটা। গাছগুলো এতক্ষণ কেমন ধোঁয়াটে হয়ে ছিল—এবার স্পষ্ট দেখাচ্ছে—মানুষদের চেহারাও। সবই বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল বাসু।

বিড়ি না, এবার আধ খাওয়া সিগারেটটা ধরিয়ে নিল বাসু। আরতির কথা তার এতক্ষণ মনে হয়নি তেমন করে। আরতিটা নিশ্চয় কেঁদেকুটে একসা হবে বাসু যুদ্ধে যাচ্ছে শুনলে। যা ভীতু আর কাঁদুনে স্বভাব। বাসুকে খুব ভালবাসে। সমস্ত বাড়ির মধ্যে আরতিরই খানিকটা সত্যিকারের টান আছে, এই ভাবনা বাসুর ভাল লাগল, সান্ত্বনার মতন লাগল।

নন্দীর ফর্ম লেখা শেষ। আর একবার ভাল করে পড়ে নিচ্ছে। বাসু এলোমেলো পায়ে হাঁটতে লাগল। নন্দীর মা—নিজের আর সৎ-মা দুজনেই কত ভালবাসে নন্দীকে—অথচ অ্যায়সা খচড়া ছেলে—মাদের কলা দেখিয়ে লুকিয়ে যুদ্ধে পালাচ্ছে। খারাপই লাগছিল বাসুর। কষ্ট হচ্ছিল।

আমার মা দিদি যদি এত ভালবাসত আমায়—! বাসুর মনে একটা ভয়ংকর অভিমান আছড়ে পড়ল। না, কেউ তাকে অমন করে ভালবাসে না।

আমি? : ছোটখাটো বেঁটে ফোলা ফোলা একটা মুখ যেন বড়ই আচমকা বাসুর মনে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। উমা—উমার মুখ। এতক্ষণ সবাইয়ের মুখের সঙ্গে এই মুখটাও কেমন আড়ালে আড়ালে জড়িয়ে ছিল। বাসু ভাসা ভাসা ভাবে বুঝছিল, কিন্তু ধরতে পারছিল না।···উমা তার মুখ মাথা উঁচু করে বাসুর দিকে চেয়ে যেন রাগ করে বললে, আমি?

অল্পক্ষণ বাসু কেমন অদ্ভুত এক অনুভবের রোমাঞ্চে দিশেহারা হয়ে গেল। তার মনে হল, উমা কি তাকে ভালবাসে?

ভাবতে ভাল লাগছিল কথাটা—কিন্তু কোনা কিছুই স্পষ্ট হচ্ছিল না। কেউ কাউকে ভালবাসে কি বাসে না—বোঝা যে কী শক্ত! আচ্ছা, বাসু যদি বাড়িয়ে গিয়ে বলে, যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়ে দিয়ে এসেছি—উমার কি খুব কষ্ট হবে? যেমন দিদির হয়েছিল সুচারুবাবুর বেলায়! উমা কি অমনি শুকনো মুখ, ছলছল চোখ, মন-খারাপ-ভাব নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়াবে। উমা হয়ত কাঁদবে। বলবে, যুদ্ধেটুদ্ধে যাওয়া চলবে না।

উমা যদি এ-সব বলে—বাসুর খুব ভাল লাগবে। ভীষণ ভাল। বাসু ভাবছিল, একবার দেখলে হয়—উমা কি করে! আজই বাড়ি গিয়ে—এক ফাঁকে কথাটা চুপি চুপি আরতিকে দিয়ে বলাতে হবে ওকে।

হাসি পাচ্ছিল বাসুর এবার। খুব খুশী লাগছিল। মনটা ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে। একটা কোকিল ডাকছে গাছে। চারপাশে বেশ চুপচাপ।

ফর্ম লেখা শেষ করে—কলম ফেরত দিয়ে এসেছে নন্দী। কাগজটা এবার জমা দিতে যাচ্ছিল। বাসু বললে, 'ওই কাগজটায় কি লিখলে?'

'আমার নাম, বাপের নাম—ঠিকানা, বয়স, জাত, ধম্ম—শালা এ যেন শ্রাদ্ধের ফর্দ লেখা', নন্দী জবাব দিল।

'চাকরি?'

'যা দেয় তাই। তবে মাইনে তিরিশ চল্লিশ টাকা হলে বয়ে গেছে নিতে।'

'জানবে কি করে?'

'কেন, আজ সেরেফ ফর্ম দিয়ে গেলাম, কাল আসব—ডাক হবে। তখন মোলাকাত করতে হবে কোনো হুলোবালার সঙ্গে। কি দেয় কাজটা দেখি—মাইনেও জেনে নেব—। আমার সঙ্গে খলিফাগিরি চলবে না। তারপর মেডিকেল একজামিন…।' নন্দী একটু থামল, 'তুমি দাঁড়াও ভট্‌চায, ফর্মটা শালাদের হাতে গুঁজে দিয়ে আসি। এরপর আজকে আর নেবে না হয়ত।' নন্দী প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

নন্দী জানত না, বাসুও একটা ফর্ম নিয়ে এসেছে। ফর্মটা বাসুর পকেটে। কখন যেন দুমড়ে ঢুকিয়ে রেখেছে।

একটু পরেই নন্দী ফিরে এল। বলল, 'চল ভট্‌চায—চা খেয়ে কেটে পড়ি।'

রিক্রুটিং অফিসের বাড়ি ছেড়ে বেরুতে বেরুতে বাসু হঠাৎ বললে, 'নন্দী, কাজটা শালা খুব খারাপ হল।'

'কি?'

'এই যুদ্ধে নাম লেখানো।'

'কেন?'

কেন? জবাব পেয়েও যেন পাচ্ছিল না বাসু। কেন—কেন খারাপ

হল। থতমত খেয়ে খানিক চুপ করে থেকে জবাব দিল বাসু, 'যাদের মা বাপ কেউ নেই, লোচ্চা, সে-শালারা যুদ্ধে যায়।'

'আমরাও ত লোচ্চা, ভ্যাগাবাও'—নন্দী বাসুর দিকে চোখ তুলে তাকাল।

বাসু আবার বেকায়দায় পড়ে গেল। কি যেন বলার আছে, মনে আসছে অথচ মুখে আসছে না। নন্দীকে কিছুতেই বুঝিয়ে বলতে পারছে না। খাপছাড়া ভাবে আজেবাজে কতক কথা বলল যার মাথা মুণ্ডু নেই। তারপর সহসা বলল, 'তুমি ত দিব্যি ভেগে পড়ছ, জানতে পারলে তোমার মা ছুটো যে গলায় দড়িকড়ি দিয়ে মরবে—। কি হবে শালা তোমার টাকায়! আর যদি টেঁসে যাও—ব্যাস্—তোমার ছোট-মা বড়-মাকে এ-জন্মে আর ছেলের রোজগারের পয়সা খেতে হবে না।'

নন্দী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাসুর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকল ক'পলক। আস্তে আস্তে সেই কালো মুখ আরও কালো শুকনো হয়ে এল। চোখ চকচকে। তারপর ঝাপসা হয়ে এল। নাকটা ফুলে ফুলে উঠছে। ধরা ভাঙা গলায় নন্দী বলল, 'আমরা শালা কেন যে মার গর্ভে জন্মাই ভটচায!'

আর কোনো কথা হল না। দু-জনেই অন্যমনস্ক।

পরের দিন নন্দী আর গেল না রিক্রুটিং অফিসে।

এর পর কত দিন কেটে গেছে—দেখতে দেখতে; সে-সময়টা বুঝি চৈত্র মাস ছিল—খুব পাতা ঝরছিল গাছে—রিক্রুটিং অফিসের সামনে রাস্তাটা শুকনো পাতার ডাঁই—তাতে কে একজন পাগলাটে লোক আগুন ধরিয়ে দিয়ে ক্ষেপামি করছিল—আজও সেই পোড়া-পাতার গন্ধটা নাকে আসে, মনে পড়লে।

সেই চৈত্র মাস কোথায় পড়ে থাকল। তারপর বৈশাখ এল, গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসও শেষ। এখন আষাঢ়। বৃষ্টি ছিটে ফোঁটা হয়েছে এক-আধ দিন। প্রথম সপ্তাহে আর কত হবে। এখন মাঝামাঝি মাসের।

তেরো

ঘাড় মুখ হেঁট করে কাজ করছিল সুধা। টেবিলের ওপর বুক হুয়ে পড়েছে। এই হিসেব মেলানোর কাজটা বড় বেয়াড়া ধরনের। একজনের করা হিসেব—আর-একজনের ছক-বেঁধে কাগজে সাজানো—সুধাকে তাই মিলিয়ে দেখতে হবে।

মাথার ওপর কালো ফ্যানটা ঘুরছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ, একটানা খানিকক্ষণ—নিস্তেজ শোকের কান্নার মতন। হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়; বেশ খানিক পরে আবার ককিয়ে ওঠে।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার হয়ে আসায় নন্দ বেয়ারা সব কটা বাতি জেলে দিয়ে গেছে। হিসেবের অঙ্ক মেলাতে মেলাতে সুধার চোখও ঝাপসা হয়ে আসছিল। করকর করছিল। আর বার বার চোখ রগড়ে, জল মুছে একটু সইয়ে নিচ্ছিল দৃষ্টিশক্তি।

'কি রে, কাজ করতে করতে যে কুঁজো হয়ে গেলি?'

লাল পেন্সিলের ডগার একটা ফুটকি কাগজের ওপর ফেলে রেখে সুধা মুখ তুলল। অমলাদি পাশে দাঁড়িয়ে।

'অমলাদি!' সুধা অবাকের চেয়ে খুশীই হল বেশি।

'চোখ তুলে ত আর দেখবি না—' অমলা কাছ থেকে টুল টেনে নিয়ে সুধার পাশে বসে পড়ল। 'এ-ঘরে ঢুকেছি—তা অন্তত পাঁচ সাত মিনিট হবে, রেণুকার সঙ্গে কথা বললাম—তারপর সুখলতা রাওলের সাবান মাখার নতুন গল্প—তখন থেকেই দেখছি—মুখ-মাথা আর টেবিল থেকে উঁচু হচ্ছে না। বাবা, এত কি কাজ করছিস?'

'এই দেখো না—' সুধা হাতের কাজগুলো দেখিয়ে হাসল, 'রেট্‌ কোটেশান মেলাচ্ছি। কী যে ছাই মাথামুণ্ডু হিসেব—কিছু বুঝি না।'

'দরকার নেই তোর বুঝে, টিক্ দিয়ে যা,—তোর যা কাজ তাই কর।'

'করছি ত তাই।'

'ভাল করছিস। তোর নিজের হিসেব কি হল বল—আমার বরং তাতে ইনটারেস্ট! মিলল?' টুলটা অমলা আরও একটু এগিয়ে নিল।

'আমার হিসেব?' সুধা বুঝেও না-বোঝার মতন করে চেয়ে থাকল।

'ন্যাকামি করিস না, তোর ও-সব অবুঝ ভাব দেখলে, সত্যি সুধা, এখন আমার গা জ্বালা করে।' অমলা মুখ মুছল রুমালে; কোলের ওপর থেকে ব্যাগটা সরিয়ে সুধার টেবিলে রাখল। 'চিঠি পেলি সুচারুর?'

সুধা আগেই বুঝেছিল সব। বেদনার জায়গায় খোঁচা খেয়ে খেয়ে অনেকটা যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছে আজকাল। খোলাখুলি প্রশ্নে নতুন করে বিস্ময় জাগল না। একটু অপেক্ষা করে শুধু মাথা নাড়ল; না।

অমলা একদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে সুধার চোখ-মুখে কি যেন খুঁজল। তারপর ছোট অথচ গভীর নিশ্বাস ফেলে মনের তখনকার ভাবনা সরিয়ে রাখল। হালকা সুরে বলল, 'চা আনতে দে। তোর জন্যে আজ টিফিনও করিনি; অফিস থেকে সোজা ছুটে আসছি।'

'আবার ফিরে যাবে?'

'বয়ে গেছে!'

সুধা একটু এদিক ওদিক চেয়ে বেয়ারা নন্দকে খুঁজল। চোখাচোখি হতে কাছে ডাকল ইশারায়। নন্দ এল একটু বাদে। অমলাকে দেখে এক মুখ হাসি হাসল। দু-চারটে কথা। কুশল প্রশ্নাদি।

'কি খাবে অমলাদি?' সুধা শুধোল।

'কি খাবো—! না, কিছু খাবো না।'

'টিফিন করো নি বলছিলে যে।...চায়ের সঙ্গে কেক এনো নন্দ।' নন্দ-র চোখের দিকে তাকাল সুধা। দৃষ্টিটা কানে কানে কথা বলার মতন। চোখে চোখে বোঝা পড়া। নন্দ চলে গেল। অমলা সব দেখেও যেন কিছু দেখল না।

'তোর চিঠি সোমবারে পেয়েছি। ভেবেছিলাম বাড়িতেই যাব তোর। হয়ে ওঠে না। আজ তাই অফিস থেকেই চলে আসছি।' অমলা বলল।

'তোমাদের অফিসে কাজকর্ম কিছু থাকে না বুঝি ?' সুধা কৌতুক করে শুধোল।

'এক রকম তা-ই। খালি ফাঁকি দিচ্ছে সব। সিভিল সাপ্লাইয়ের ব্যাপার ত। কি যে করতে হবে, কি না হবে—কেউ জানে না। আজ একটা হুকুম এল এক রকম, কাল অন্য রকম। বেশ আছি আমরা।' অমলা হাসল।

অমলাদি যে বেশ আছে—সুধা তা বুঝতেই পারছিল। মাস খানেক আগে যখন দেখা হয়—তখনই বোঝা গিয়েছিল—মিশন রো-র অফিস ছেড়ে গিয়ে অমলাদি ভালই আছে। আজ মনে হল, আরও ভাল; অনেক ভাল। অমলাদির কথাবার্তায় যতটুকু না—তার চেয়ে অনেক বেশি বোঝা যাচ্ছিল তার পোশাক-আশাকে। বেশ একটা শাড়ি পরনে অমলাদির, রঙটা ঘন বাসন্তী—পাড়ের বাহারও কম নয়; মেরুন রঙের ব্লাউজ, রেশম রেশম ভাব। ঘাড়ের কাছে নতুন ছাঁদের বিনুনী। মুখে স্নো-পাউডারের প্রলেপ-বাহুল্য। চোখের কোণায় সুর্মার টান। অডিকলনের গন্ধও নাকে আসছে। অমলাদির পুরনো চেহারাটা সুধার মনে পড়ল। সাধারণ শাড়ি, মোটা ছিট কাপড়ের ব্লাউজ, সাধারণ খোঁপা, পায়ে সস্তা জুতো কি চটি। সেই অমলাদি আজ চার পাঁচ মাসে কত বদলে গেছে। নতুন চাকরিতে মাইনে-পত্র বেশ বেশিই পায় অমলাদি। অথচ সুধাকে বলেছিল—তেমন কিছু নয় রে—গোটা তিরিশ চল্লিশেক টাকা বেশি।

'আমার কি করলে তুমি, অমলাদি ?' সুধা শুধোল।

চট্ করে কোনো জবাব এল না অমলার মুখে। কিছু ভাবছিল অমলা; সুধার মুখে ফাঁকা চোখে চেয়ে থাকল। খানিক পরে বলল, 'আমি আমার সাধ্য মত চেষ্টা করছি।' একটু চুপ করে থাকল অমলা; আবার রুমালে কপাল মুছল, বলল; 'তুই ভাবিস তোর কথাই বুঝি ভুলে গেছি এ-অফিস ছাড়ার পর।'

'না—না—তা ভাবব কেন!' সুধা সামান্য মাথা নেড়ে জবাব দিল।

'থাক্, বলিস না আর। কি ভাবে চিঠি লিখেছিস, দেখাবো ?' অমলা ব্যাগ থেকে চিঠিটা বের করে এখুনি দেখাতে পারে এমন ভঙ্গি করল।

কাগজের স্তূপ, ব্লটিং, কালি—পিন কুশনের দিকে চেয়ে বসে থাকল সুধা। অল্পক্ষণ। তারপর অমলার মুখের দিকে চেয়ে চোখ সরিয়ে নিল। বলল, 'আর পারছি না অমলাদি! অভাব—অভাব—অভাব। সংসারে অভাব যেন বেড়েই চলেছে। অভাবের মধ্যে গলা ডুবিয়ে বসে আছি।' সুধার গলা বিষণ্ণ হতাশ। মুখে চোখেও অসীম ক্লান্তি।

'তোর একার নয়, সবার সংসারেই তাই।' অমলা বলল, 'কি অবস্থার মধ্যে বেঁচে আছি দেখছিস না! ত্রিশ চল্লিশ টাকা মণের মোটা চাল খেয়ে আমাদের মতন মানুষ বাঁচে কখনও!'

'তুমি তবু খেতে পাচ্ছ অমলাদি; আমাদের সংসারে আজকাল তাও না। চারটে পেট দু-বেলা কি যে খাচ্ছি না-খাচ্ছি—আজকাল আর মনেও থাকে না।'

অমলা অল্প একটু নীরব থাকল। শেষে বলল, 'তোর ভাই আজকাল কি করছিল না?'

'এ আর পি। আর যা করছিল সেটা না বলাই ভাল।'

'কি?'

'কণ্ট্রোলের দোকান থেকে চাল চিনি ধরে বিক্রী। আজকাল বোধ হয় আর সুবিধে করে উঠতে পারছে না।' সুধা ম্লান মুখে তিক্ত হাসি হাসল, 'ভদ্রলোকের ছেলে—কত রকম জোচ্চুরি আর নোঙরামিই শিখেছে! আর আশ্চর্য কি জানো অমলাদি—আমরা সবই দেখছি, জানছি—কিন্তু কিছু বলতে পারছি না। পেট বড় দায়, চুরি জোচ্চুরির পয়সাও খেতে হয়।' সুধা চুপ করে গেল।

চা নিয়ে এল নন্দ। কাগজে মুড়ে কেকও। সুধা আর অমলার জন্যে আলাদা আলাদা গ্লাসে চা দিয়ে চলে গেল।

অমলা একটা কেক তুলে সুধার দিকে এগিয়ে দিল, 'নে, খা—'।

'ওমা, খিদে পেয়েছে তোমার— আর আমি খাব?'

'খা না—; আমাদের সকলেরই পেটে ক্ষিদে; মুখে লজ্জা করে কি লাভ!' অমলা অর্থপূর্ণ গলায় বললে।

চা খেতে খেতে এবার অমলা বলল নীচু স্বরে, 'তোর কাছে পয়সা নেই—তবু আমার খাতির করে এতগুলো কেক আনিয়ে দিলি কেন, সুধা? ভদ্রতা—?'

সুধা বিব্রত বোধ করল। সংকোচ হচ্ছিল। জড়ানো গলায় বললে, 'এত আর কোথায়—দুটো মাত্র।'

'দু-টো এই কেকের দাম চার পাঁচ আনা। চার আনা পয়সাও ফেলনা নয় তোর কাছে।' অমলা একটু রুক্ষ হয়ে উঠল হঠাৎ। সরাসরি সুধার দিকে চেয়ে থাকল।

সুধা নিজেও ভাবেনি, এই সামান্য কথা থেকে প্রসঙ্গটা অন্য পথে চলে যেতে পারে। অথচ কিসের এক জমা ক্ষোভ এবং তিক্ততা তার গলায় ঠেলে উঠল। বলল, 'দুটো কেক ধারে আনতে দিয়েছি—তাতেই তুমি হ্যা-হ্যা করছ অমলাদি! নন্দর কাছে আমি টাকা ধার নি, জানো? কখনও দু-তিন টাকা—কখনও বা চার আনা আট আনা পয়সাও। সারা মাস ধরে ধার নিয়ে যাই।'

অমলা চুপ। ভাঙা কেকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। চায়ের গ্লাস ঠোঁটে ছুঁইয়ে রেখেছে। চুমুক দিতে পারছে না। সুধা নিচু মুখে বসে। লাল পেন্সিলটা ব্লটিং পেপারের ওপর জোরে জোরে ঘষছে। হিজিবিজি রেখা টানছে।

নিজেকে সামলে নিল অমলা। চায়ে চুমুক দিল। মুখে হাসি হাসি ভাব আনল একটু। বলল, 'আমার ওপর তুই রেগেছিস খুব। আমি তোকে ঠোকর দেবার জন্যে কিছু বলিনি সুধা।'

জবাব দিল না সুধা। কথাটা বলার পর নিজেরই তার খারাপ লাগছিল। মুখ তুলে সামনে তাকাল। পার্টিসান ওআলের ওপর ছোট হরফের এক-পাতা ক্যালেণ্ডারটা ঝুলছে। নড়ছে না একটুও। সুধার মনে হল, তার ভাগ্য আর দুঃসময় যেন অমনি—চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে; নড়বে না চড়বে না; অদল বদল কিছু না।

'চা-টা খা—জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।' অমলা বলল।

সুধা চায়ের গ্লাস তুলে নিল।

'একটা কথা খোলাখুলি তবে তোকে জিজ্ঞেস করি, সুধা?' অমলা সুধার দিকে আরও একটু ঘেঁষে এল। খুবই মৃদু গলায় বলল, 'তুই কি চাস—খেয়ে পরে বাঁচতে, না উপোস করে করে শুকিয়ে মরতে?'

বড় অদ্ভুত প্রশ্ন। ছেলেমানুষীর মতন শোনাল সুধার। বিরক্ত হয়েই জবাব দিল, 'উপোস করে কে আবার মরতে চায়?'

'চায়; কেউ কেউ চায়। বোকা, একগুঁয়ে আছে দু-এক জন।' অমলার মুখের আদলে কিসের যেন কালচে একটা আভা। গলার স্বর বড় মৃদু, কিন্তু কেমন বেপরোয়া। 'তাদের সে গোঁ ভাঙে, ভাঙছে। মান সম্মান নিয়ে আর অত ভাবি কেন! সংসারের রথ টানব পঞ্চাশ ষাট টাকায়, এদিকে ভাল মেয়ে হয়েও থাকব, এ-জেদ কেন!'

সুধা অমলার কথা বুঝতে পারছিল না। এলোমেলো অগুছোল মানে-নেই কথার মতন শোনাচ্ছে না, বরং অমলাদি যা বলছে তা কেমন যেন অর্থ-পূর্ণ, জীবন্ত, আতিশয্যহীন আবেগে কঠিন, করুণ। অবাক পলকহীন চোখে সুধা তাকিয়ে থাকল।

'যুদ্ধ চলছে বলে লোকে অশান্তি অশান্তি করছে। আমার—আমাদের মতন যারা, তারা চায় যুদ্ধ যেন না থামে,—চলুক—যত দিন পারে। গোটা জীবনটা হলেই বা ক্ষতি কি।'

সুধা বুঝতে পারছিল, অমলাদি যে-কোনো কারণেই হোক ক্ষেপে উঠেছে। কিন্তু কেন?

অল্প একটু নীরবতা। সুধা বা অমলা কেউ আর কথা বলল না। পরস্পরের দিকে তাকাল না। কেমন একটা গুমোট ভাব জুড়ে বসছিল। সুধার মনে হল, হয়ত দোষটা তার; কি বলতে কি বলে ফেলেছে, অমলাদি তাতেই বোধ হয় চটে উঠেছে। আবহাওয়া লঘু করার জন্যে সুধা এবার একটু হাসি টেনে বলল, 'যুদ্ধটুদ্ধ আমি বুঝি না বাপু—থামলে কি হবে, আর চললেই বা কি—মাথায় ঢোকে না। তবে থামলেই বোধ হয় ভাল—চাল আটা কয়লাটা অন্তত পেতে পারি।'

অমলা সুধার দিকে চোখ তুলে চাইল। আবার করে রুমালে মুখ মুছল। যেন মুখের ওপর থেকে উষ্মা বিরক্তি বিতৃষ্ণা মুছে নেবার চেষ্টা করল। বলল, 'তুই ত চাইবি, তোর যে স্বার্থ আছে।'

'স্বার্থ আছে—মানে?'

'ঘরে গিয়ে মানেটা ভাবিস।' অমলা গালের রেখায় কেমন এক রকম হাসির ভাঁজ তুলে মিলিয়ে ফেলল আবার। 'যাক—আর তোর সঙ্গে বক্‌বক্‌ করার সময় নেই আমার। যা বলতে এসেছিলাম, শোন—। অন্য চাকরি সত্যিই করবি?'

'তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? এক কথা তোমায় হাজার বার করে বলতে হবে নাকি?'

'বেশ। তবে আগামী বুধবার তৈরি থাকিস, তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাব।' অমলা কি ভাবতে ভাবতে বলল।

'কোথায়, তোমাদের অফিসে?' সুধা ক্ষীণ আশা পেয়ে কৌতূহল প্রকাশ করল।

'না। যারা চাকরি দেয়—দিতে পারে—তাদের একজনের কাছে।'

অমলা এবার উঠি উঠি ভাব করল। হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা তুলে নিল সুধার টেবিল থেকে। 'আমি অফিসের ছুটির পর আসব। তুই এখানেই থাকিস।'

মাথা নাড়ল সুধা। থাকবে। অমলা উঠে দাঁড়াল। আচমকা বলল, 'তোর শরীরটা কিন্তু খুব খারাপ হয়ে গেছে সুধা। একটু যত্ন নে। অসুখ-বিসুখে পড়লে মুশকিল হবে।'

'যত্ন আর কি নেব—অমলাদি। এই একরকম আছি।' সুধা একটু থেমে বলল আবার, 'মাথা-টাথা রোজই প্রায় ধরে ওঠে বিকেলে। কেমন গরম গরম লাগে চোখ মুখ। কাশিটাও জ্বালায় মাঝে মাঝে। এত ক্লান্ত লাগে—!'

'মাথা ত ধরবেই, চোখ খারাপ—তার ওপর ওই ভাবে পিঠকুঁজো হয়ে কাজ। চশমাটা নিতে বললাম কবে থেকে—নিলি না। শেষে অন্ধ হয়ে যাবি।'

'হলেই বা ; উপায় কি। টাকা কোথায় চশমা নেবার ! বাড়িঅলা বাইরে থেকে এবার শাসিয়েছে। চার মাসের ভাড়া বাকি। এবার কলকাতার উকিল লাগিয়ে মামলা করবে বলেছে।' সুধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

'চুলোয় যাক্ তোর বাড়িঅলা। শোন্—চশমাটা তুই নিয়ে নে। চাকরি করে খেতে হবে যখন—চোখ হারিয়ে লাভ নেই।...তুই মেডিকেল কলেজে গিয়ে চোখটা দেখিয়ে আন—চশমার ব্যবস্থা একটা হবেখন। আমার চেনাশোনা দোকান আছে।'

সুধা জবাব দিল না। আস্তে করে মাথা নাড়ল।

অমলা চলে যাবার উদ্যোগ করে একটু দাঁড়াল। সুধার প্রায় পিঠের পাশে এসে মাথা নুইয়ে ফিসফিস করে বলল, 'বাড়িতে বোধ হয় পয়সা কড়ি তোর কাছে কিছু নেই ?'

সুধা চুপ। মাথাও নাড়ল না।

অমলা ব্যাগের অন্ধকার হাতড়ে পাঁচটাকার একটা নোট মুঠোয় নিয়ে—সুধার হাতে গুঁজে দিল। বলল, 'রেখে দে—আমার নিজের কাছে যা আছে তাতে চলে যাবে—ক'টা দিন আর !'

সুধা মাথা নাড়ল এবার। 'না অমলাদি, আর ধার নেব না। এমনিতেই তুমি প্রায় আঠারো টাকা পাও আমার কাছে—কত দিন হয়ে গেল শোধ দিতে পারছি না। আগে তবু এখানে ছিলে—মাইনে পেয়ে কিছু শোধ করতে পারতাম—এখন দেখাও হয় না, শোধ করাও নয়।'

সুধার হাত ঠেলে দিল অমলা। বলল, 'থাক না—; তোর কাছে জমা রাখছি। পরে দরকার হলে চেয়ে নেব।'

'সে আর কোনোদিনই পাবে না।'

সুধার কাঁধে আস্তে করে হাত রাখল অমলা। সামান্যক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। হাতের আলতো চাপ থেকে বোঝা যাচ্ছিল সান্ত্বনা, সমবেদনা জানাচ্ছে অমলা। 'নে কাজ কর—আমি চললাম। বুধবার আসব। ভুলিস না যেন।'

সুধা অমলার জুতোর খুটখুট শব্দটুকু মিলিয়ে যেতে শুনল ; তারপর কয়েক

মুহূর্ত যেন সব চুপ। টাইপ রাইটারের দ্রুত মৃদু একটা ধ্বনি কানের পর্দায় এসে লাগল আস্তে আস্তে—, পার্টিশান ওআল টপকে পাশের হলঘরের চাপা গুঞ্জন। টেবিলের ওপর একরাশ কাগজ। গুণ্ডহোল। ব্লটিং পেপারের ওপর নীচু দিকটায় লাল পেন্সিলের দাগে দাগে একটা কিম্ভূতকিমাকার জন্তর চেহারা ফুটে উঠেছে। ওপরের খানিকটা কালি পড়ে কালো। অনেকটা ছড়িয়ে গেছে। চুপসে গেছে।

অন্যমনস্ক ভাবে সুধা এই জন্তু আর কালি পড়া অদ্ভুত দাগের দিকে চেয়ে থাকল। ···পাশের হলঘর থেকে ওআলক্লকের আওয়াজ ভেসে এল। চারটে বাজল।

সুধা নড়ে-চড়ে উঠল। এখনও অনেকগুলো 'শিট্' বাকি। রেট্ কোটেশান মিলিয়ে হরিপদবাবুর টেবিলে পাঠিয়ে দিতে হবে। অমলাদির দিয়ে যাওয়া টাকাটা বুকের ব্লাউজের আড়ালে রেখে দিয়ে কাজে আবার মন দেবার চেষ্টা করল সুধা।

মন আর বসছিল না। একই জিনিস দেখছে ত দেখছেই, কিসের সঙ্গে যে এই হিসেবের সংখ্যা মেলাতে হবে তা মনে পড়ছে না ; যদি বা মনে পড়ল এক দেখতে আর-এক অঙ্কের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলল।

মন যদি এ-ভাবে ছিঁড়ে খুঁড়ে যায়—ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে বাতাসের ঢেউ লাগার মতন ; এলোমেলো হয়ে যদি ভাবনাগুলো ফেনিয়ে কেঁপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে—তবে আর উপায় কি! সুধা বুঝতে পারছিল, আজ আর মনকে সে এই হিসেব মেলানোর কাজে বসাতে পারবে না।

ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে উঠল সুধা। হিসেব মেলানোর কাজটাই বড় বিশ্রী। কাগজের অসংখ্য হরফের দিকে চুপ করে চেয়ে বসে থাকল। বাইরে হয়ত মেঘ করেছে। ঘরের মধ্যে ঘোলাটে আলো। অফিস-ভাঙা-বেলার ক্লান্তি। ক্রমশই সব শান্ত হয়ে আসছে। মাথার ওপর ফ্যানের থেকে-থেকে ঝিমনো শোকের কান্নার মতন সেই শব্দটা।

সুধা কপালে হাত রেখে টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসে থাকল। লাল পেন্সিলের উলটো মুখ—নীল শিসের দিকটা ব্লটিংয়ের ওপর বুলোচ্ছে ; জন্তুর

মতন কিম্ভূতকিমাকার সেই লাল দাগটার পাশে ফুল আঁকছে সুধা। গোল গোল করে, আলপনার মতন।

কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে। হুঁশ নেই। সুধার মন অন্য কোথাও। বাইরের মেঘলা গাঢ় হয়ে এসেছে; মেঘ ডাকছে। নন্দ এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। সুধার ঘোর ভাঙল। হাতের পেন্সিল ফেলে রেখে তাকাল সুধা নন্দর দিকে। দীর্ঘনিশ্বাস চাপা ধরা-গলায় বলল সুধা, 'হরিবাবুকে বলো, কাজ শেষ হয় নি; কাল এসে পাঠিয়ে দেব।'

নন্দ চলে গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে টেবিলটা গুছোতে বসল সুধা। কোটেশান শিটগুলো দায়সারা করে এক পাশে সরিয়ে রাখল। আজ হল না; কাল আবার এগুলো নিয়ে বসতে হবে। সেই হিসেব মেলান। কী বিশ্রী কাজ!

অথচ সুধা দেখছে, স্পষ্টই বুঝতে পারছে—তার হিসেব মিলছে না। আজকাল প্রায়ই সুধা হিসেব মেলাবার চেষ্টা করে। পারে না। কোথায় যেন ভুল থেকে যায়। নয়ত কেন এমন হবে? কেন? মনে মনে যে-যোগফল করে রেখেছিল সুধা—তা ত মিলে যাচ্ছে না। সুচারু চুপ করে গেছে। সেই গত পুজোর পর তার চিঠি এসেছিল—তারপর আর একটা। ছোট ক'লাইনের চিঠি। কোনো সাড়া শব্দ নেই আর। পাঁচ ছ মাস কেটে গেছে। আবার পুজো আসে-আসে, সুচারু চুপ। সুধা দুখানা দিল; জবাব নেই। খোঁজ খবর দিয়ে অন্তত একটা লাইনও কি লিখতে পারে না। কেন লেখে না। কি হল ওর! মন বদলে গেল! স্বভাব পালটে গেল? না কি অন্য খারাপ কিছু—! অন্য কিছুর কথা মনে উঁকি দিলেই সুধা যেন ভয়ে কাঁটা হয়ে দু-হাতে পাগলের মতন তা ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। অন্ধ মন তখন ভগবানকে ডাকে আকুল হয়ে। না না না।…দুশ্চিন্তাটা সুধাকে সহজে ছাড়ে না। আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। কত রাত কাটে ভাবনায় ভাবনায়। অস্থির অসহায় মন। ঘুম আসে না; আসে শুধু কান্না —গলা বুক উপচে, হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে। কি হল মানুষটার? কোথায় আছে, কেমন আছে? কেন এমন করে সব চুকিয়ে দিচ্ছে!

ওআল্ ক্লকে পাঁচটা বাজল। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল সুধার। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। খাঁ খাঁ মন। সমস্ত অনুভূতি কী বিশ্রী ফাঁকা। যেন কোথাও কিছু নেই—মাঠের মধ্যে একটা ঘূর্ণির মতন ঘুরপাক খেতে খেতে সুধা কোথায় চলেছে ধুলো উড়িয়ে।

টেবিল ছেড়ে উঠতে গিয়ে ব্লটিং পেপারের ওপর চোখ পড়ল। সুধা চমকে উঠল। তাকিয়ে থাকল দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে। এ কি করেছে ও! নীল শিস দিয়ে ফুল পাতার মতন দাগ কাটতে কাটতে কেমন করে এই অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেল! গাঢ় কালির চুপসানো বড় দাগটার সঙ্গে লাল আঁচড়ের সেই জন্তু চেহারাটা জুড়ে দিয়েছে। দেখাচ্ছে ঠিক যেন লতাপাতার নীল মালা —না, মালা নয়, দড়ি—দড়ি দিয়ে অদ্ভুত দুই জন্তুকে কেউ বেঁধে রেখেছে।

সুধার বুকের কোথাও যেন কঠিন এক হাতের মুঠো কিছু ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করছিল।

ব্লটিং পেপারটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলল সুধা। কুচি কুচি করে। পাশের ময়লা ফেলা ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

কপালের শিরা দপ্ দপ্ করছিল।

বাইরে আরও ঘন হয়ে আসছিল আকাশ।

চৌদ্দ

গিরিজাপতি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ক'দিন আর প্রেসে যাওয়া হচ্ছে না। মিহির কালও লোক পাঠিয়েছিল খবর নিতে। প্রেসের এখন খুব কাজের চাপ। গত চার পাঁচ মাস ধরে হু হু করে কাজ বেড়েই চলেছে।

গিরিজাপতির অনুপস্থিতিতে মিহির বেশ ঝামেলায় পড়েছে। দু-তরফের প্রেস সামলানো, বাইরে ছুটোছুটি, হিসেবপত্রের ওপর নজর রাখা—সম্ভবও নয় একা মানুষের পক্ষে। নতুন একটি ছেলেকে অবশ্য প্রেসের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্যে নেওয়া হয়েছে, অবনী। ছেলেটি কাজেকর্মে এখনও কাঁচা।

অবনী কাল এসেছিল মিহিরের চিঠি নিয়ে, সন্ধ্যেবেলায়। এবার হয়ত মিহির নিজে এসেই হাজির হবে। খুবই মুশকিলে পড়েছে ওরা।

গিরিজাপতি দেবুকে খবর পাঠিয়েছেন। নিখিল গিয়ে বলে এসেছে আজ। না, অবহেলা করা উচিত হয় নি। দু' তিন দিন আগেই যখন ব্যথাটা বাড়াবাড়ি মনে হল, তখনই দেবুকে খবর পাঠালে হত। নিজে তারা ডিসপেনসারীতে গেলেও পারতেন। দুর্ভোগ তাতে কমত। এই বয়সে আর শরীর নিয়ে অতটা হেলাফেলা করা উচিত নয়। শক্তি কমে আসছে, জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে, দেহ ভাঙছে।

ঠিক সন্ধ্যে নয়—তবে বিকেল শেষ হয়ে আলো মরে যাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে কোথাও কোথাও অন্ধকার জুড়ে রয়েছে, কোথাও একটু ফিকে ছায়ার মতন ভাব। গলি দিয়ে মানুষজন চলছে। তাদের পায়ের শব্দ, গলার স্বর—কানে আসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে আবার। পাড়ার ক'টি ছোট ছেলে টেনিস বল খেলছিল গলিতে—তাদের হুড়োহুড়ি শোনা যাচ্ছে না আর। রিকশা যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। কদাচিৎ সাইকেলের ঘন্টি। জানালার গরাদের

ছায়াগুলো অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেছে। বেশ খানিকটা অন্ধকার টপকে এসে ঢুকেছে জানলা দিয়ে।

উমা ঘরে এসেছিল কি কাজে। অন্ধকার হয়ে গেছে দেখে বাতিটা জ্বালিয়ে দিল।

'আরে উমা, নিখিল ফিরল না এখনও?' গিরিজাপতি শুধোলেন।

'না।' উমা কাকার পাশে এসে দাঁড়াল 'একটু কিছু খাবে কাকা?'

গিরিজাপতি ভাইঝির দিকে ঘাড় ফেরালেন। 'কি খাব?'

'রুটি সেঁকছি; গরম গরম দুটো রুটি খাবে—আলুভাজা দিয়ে?'

'এখন, এই সন্ধ্যেবেলায়?'

'কি হবে খেলে! দুপুরে ভাল করে ভাতও খাও নি।'

'না রে, এখন ভারি জিনিস কিছু না।'

'তবে দু'টি মুড়ি খাও—হাল্‌কা। আলু ভেজে মিশিয়ে দি, গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেব। বেশ লাগবে খেতে।'

'মুড়ি? দে তবে। অল্প করে। আগে জল খাওয়া—খুব ঠাণ্ডা জল— ; বড় তেষ্টা পেয়েছে।'

উমা জল আনতে গেল। গিরিজাপতি হাত বাড়িয়ে বিছানার ওপর থেকে পাখাটা তুলে নিলেন।

জল নিয়ে এল উমা একটু পরেই। গিরিজাপতি পুরো গ্লাস জলই শেষ করলেন। বেশ খানিকটা আরাম পেলেন মনে হল। 'নিখিল কি কলেজ থেকে সোজা দেবুর ডিসপেনসারীতে গেছে নাকি রে? সঙ্গে করে নিয়ে আসবে!'

'কি জানি। আমায় কিছু বলে নি।' উমা জবাব দিল গিরিজাপতির দিকে তাকিয়ে। কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়, মিথ্যেও না। উমা বাস্তবিকই জানে না নিখিল কোথায় গেছে; নিখিল বলেও যায় নি। তবে উমা অনুমান করতে পারে। আজকাল প্রায়ই নিখিল সেখানে যায়। নিখিলের কথা থেকে উমা তা বুঝতে পারে। ওই যে—দাদার সেই বন্ধু মৃণাল—মৃণালের সঙ্গে কোথায় কোথায় যেন। দাদার মুখেই শুনেছে উমা—একটা জায়গা আছে

যেখানে যেতে খুবই পছন্দ করে ওরা। কল্যাণদার কাছে। কে কল্যাণদা উমা জানে না—কিন্তু নিখিলের কাছে শুনে শুনে কল্যাণদার চেহারা একটা মনে মনে গড়ে নিয়েছে। খুব নাকি ভাল লোক, বিরাট পণ্ডিত, দিনরাত বই পড়ে। তার কাছে কত লোক জন আসে দেখা করতে, কথা বলতে। অনেক দিন জেলে ছিলেন—গত বছর ছাড়া পেয়েছেন। এই বয়সেই নাকি মাথার অর্ধেক চুল পেকে গেছে। মোটা মোটা কাচের চশমা চোখে। কত বয়স? চল্লিশও নয় পুরোপুরি।

নিখিল-মৃণাল আর কল্যাণদার কথা ভাবতে ভাবতে উমা চলে গেল রান্নাঘরে।

গিরিজাপতি হাত পাখার বাতাস খেতে খেতে গুমোট গরমটা সইয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন। ভাদ্র মাস। আকাশের কি যে হয়েছে আজ ক'দিন, আর এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। মেঘলা মেঘলা ভাব হয়—মেঘ ডাকে, বিদ্যুৎও চমকায় কখনো সখনো—তারপর সেই গুমোট।

অথচ কিছুদিন আগে শ্রাবণের আকাশ যেন ভেঙে পড়েছিল মাথার ওপর। জল—জল—জল। শেষ নেই। সেই বৃষ্টি আর জলের তোড়ে বন্যা হয়ে গেল। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ। দামোদরের বাঁধ ভেঙে বর্ধমান জেলার অনেকখানি জলের তলায় ডুবে থাকল—আজও বোধ হয় সব জল সরে মাটি ভেসে ওঠে নি। এখনও থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ও-পাশে। কাঁসাই নদীর বাঁধ ভেঙে মেদিনীপুরেরও একই হাল। আড়াই শ' গ্রাম জলে ডুবে রয়েছে। মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণারও কোথাও কোথাও সেই অবস্থা। দুর্দশা—চরম দুর্দশা। ভাদ্রের আউস চাষ করেছিল মানুষে বড় বুক ভরা আশা নিয়ে। অভুক্তের দল—দুটো ধান পাবে বেশি করে, আউস ধান; দু'তিনটে মাস অন্তত আবার দু'মুঠো খেতে পাবে। ভাগ্যের কী কুটিল পরিহাস। জলের তলায় আউসের ফসল পচে হেজে নষ্ট হয়ে গেল।

আর গৃহহীন অন্নহীনের দল ভিটে-মাটি ছেড়ে সরকারী লরিতে চেপে বসছে। ছাগল গরু পাদা। কোথায় যাচ্ছে? সরকারী সাহায্য শিবিরে। অন্নপূর্ণার পদতলে। দু'-দশ দিনেই বোঝা যায় অন্নপূর্ণার ভাঁড়ার বাড়ন্ত, মেজাজ মর্জি

পুলিসের মতন। সরকারী শিবির থেকে বেরিয়ে এবার গিয়ে ভেড়ে বেসরকারী রিলিফ সোসাইটির আস্তানায়। জোয়ার কি বজরার আটা গুড় আর কলসি কলসি জল ঢেলে সিদ্ধি; জোলো খিচুড়ি। দু'পাঁচ দিন হাপুস হাপুস চেটেপুটে তাই খায়। তাও শেষাবধি বন্ধ। রোজই নতুন নতুন চালান আসছে হাভাতে, হাঘরে। পুরনোরা আর নজর পায় না। মড়কও লেগে গেছে। কলেরা আর আমাশা আর টাইফয়েড। বেসরকারী অন্নসত্রের আস্তানা ছেড়ে দলে দলে ওরা শহর-পানে হাঁটা দেয়। চিট এক টুকরো কানিতে পুরুষদের উদরটুকু ঢাকা, গোড়া-কাটা লাউ ডগার মত শুকনো কোঁকড়ানো ঘাড় পিঠ বুক কুঁজো মেয়েছেলে—এক টুকরো ছেঁড়াফাটা বস্ত্রে কায়ক্লেশে লজ্জা নিবারণ তাদের। কাঠির মত সরু, উলঙ্গ শিশু—কাঁধে পিঠে বুকে। গাঁ-গ্রাম, সরকারী তাঁবু বেসরকারী আস্তানা ছেড়ে শহরে চলেছে ওরা।

ফসল না পচে গেলেও এরা আসত। হয়ত একটু কম, হয়ত আরও ক'দিন পরে। সবাই আর জমি জায়গা ফসলের ভরসায় ছিল না। ক্ষেত খামার, ভাগচাষ তাই বা ক'জনের ছিল। আসলে কিছুই ছিল না। কেউ সামান্য সব্জি ফলিয়ে বিক্রি করত, কেউ ঘুঁটে দিত, চাল ছাইত খড়ের, নৌকা বাইত। কুমোর কামার, নাপিত ধোপা, জনমজুর, জেলে, মাহিষ্য, তাঁতি, ডোম বাউরি সবাই হায় হায় করছিল। এরা আসত, না এসে উপায় ছিল না। পেট উপোস করে করে চড়া পড়ে গিয়েছিল। উপোসী পেটে কাঁকরে-বালি রগড়ে দিচ্ছিল কে যেন। দিনের পর দিন। একেই বলে ক্ষুধা। এক আধ বেলার একাদশী অমাবস্যার অরজ্বালার উপবাস নয়, সকাল সন্ধ্যে মাসের পর মাস অভুক্ত থাকা। কচু পাতার, শালুক ডাঁটার হড়হড়ানি খেয়ে ক্ষুধাকে শান্ত করা যায় না, ব্যাঙের ছাতা খুদকণা দিয়ে শতরকে রাখা যায় না। ভাত চাই—পেটভরা ভাত; ব্যঞ্জন না থাক—অন্তত কলাই ডাল আর নুন আর সোয়াদের জন্য কাঁচা লঙ্কা। ভাত কোথায়? পাঁচ ছ'টাকা মণের চাল আজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ—, কোথাও কোথাও চল্লিশে গিয়ে ঠেকেছে। দিন আয় যার চার গণ্ডা পয়সা—কিংবা আট গণ্ডা—মা, বাপ, ট্যাঁ-ভ্যাঁ নিয়ে

কমপক্ষে পাঁচ সাত জন করে পুষ্যি আস্তি—তার কি হবে একসের আধসের চালে! এক কাঁচ্চা করেও ভাগে পড়ে কি পড়ে না। যদি থেকে থাকে জোত জমি গরু ছাগল থালা বাটি, গায়ের সোনা দানা সে-সব আগে ভাগেই গেছে। দেড় দু-বছর ধরে রুখে এসেছে এই ভাবে। আজ আর কিছু নেই—শুধু পেট ছাড়া, পুষ্যি ছাড়া। আর আশাও বুঝি একটু আছে। শহরে গেলে দু-মুঠো হয়ত জুটবে। গতর দেব, শক্তি সামর্থে যা কুলোয় তারও বেশি খাটতে পারি। তার বদলে দুটো ভাত দাও। যেমন তেমন আসি বাসি—গন্ধ পচা ফেলানো ছড়ানো এঁটো কাঁটা দুটো ভাত দাও।

গিরিজাপতির খেয়াল হল উমা যেন কখন এসে মুড়ির বাটি নামিয়ে রেখে চলে গেছে। আর বাইরের জানলায় অন্ধকার-গাঢ় ছায়ার মতন একটা মূর্তি। নড়ছে না। শ্বাস টানছে—আর মাঝে মাঝে বেড়ালের কান্নার মতন একরকম শব্দ করে গরাদের পাশে মুখ ঘষছে।

'কে?' গিরিজাপতি প্রায় চমকে উঠলেন।

সাড়া শব্দ নেই প্রথমটায়। তারপর কান্না কান্না গলায় কি যেন বিড়বিড় করে বলল। গিরিজাপতি নিঃসন্দেহ হলেন—একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে জানলা ঘেঁষে রাস্তায়।

আস্তে করে উঠে—পা টেনে বিছানার কিনারায় গিয়ে বসলেন গিরিজাপতি। এখান থেকে মানুষটার মুখ তবু কিছুটা ভাল করে দেখা যায়। মাথায় জটা ধরেছে, মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল, পোড়া হাঁড়ির মতন কালো রঙ, বয়স কম না, দুটো চোখ গর্তের মধ্যে; নিবু নিবু লণ্ঠনের কাচের মতন একটু যেন জ্বলছে।

লোকটা কি চায়—গিরিজাপতির জানা আছে।

'কোথ থেকে আসছ?'

'ডায়মন হারবার।'

'কাজকর্ম কি করতে?'

কি করত সে কথা আজ আর বলে লাভ কি? পুরনো কথা বলতেও লোকটার যেন ইচ্ছে নেই। কথার চেয়ে কান্নার দাম বেশি হয়ত। হয়ত

লোকটা ভাবছিল, কথা বললে বাবুর দয়ামায়া কমে যেতে পারে। কথা তাই বলল না—জানলার শিকের ওপর মাথা ঠুকতে লাগল।

আজ সারাদিন এই ঘরে বসে বসে অন্তত চার পাঁচজনকে এইভাবে জানলার কাছে আসতে দেখেছেন গিরিজাপতি। বাইরে সদরে কড়া নেড়ে ককিয়ে চেঁচিয়ে আরও ক'জন চলে গেছে কে জানে।

'ভাত ত এখন পাবে না। রুটি দু'চার খানা নিয়ে যাও বুড়ো? কি বল?'

লোকটা তবু একবার আপত্তি জানাবার চেষ্টা করলে। এক মুঠো ভাতও যদি হয়। এঁটোকাঁটা ফেলাছড়া যাই হোক।

উমাকে ডাকলেন গিরিজাপতি। লোকটাকে বোঝালেন। 'কাল দুপুরে যদি আস বুড়ো—দু'মুঠো ভাত থাকবে তোমার জন্যে।'

উমা ঘরে এলে গিরিজাপতি বললেন, 'তোর রুটি সেঁকা হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল উমা।

'ওই বুড়োকে দু'খানা রুটি দিয়ে দে।'

'সন্ধ্যেবেলাতেও এদের জ্বালায় নিস্তার নেই!' গর গর করে উঠল উমা। প্রথমটায় নজর করতে পারে নি; কাকার কথায় দু'পা এগিয়ে এসে জানলার দিকে চাইল। ঠাওর করে দেখল ক'পলক। 'এই বুড়ো কালকেও যে এসেছিল। আগেও এসেছে।'

লোকটা উমার কথা শুনতে পেল কি পেল না, বুঝল কি বুঝল না—কে জানে। চোখের কোণে পিচুটি মুছতে লাগল। গিরিজাপতি বললেন, 'তাই নাকি। তা যা দিয়ে দিগে যা ওকে—।'

উমা আর কিছু বলল না! ঘর থেকে যাবার সময় অন্য কথা ভাবছিল। তাদের নিজেদের সংসারেই আটা কম। কাল পরশু কনট্রোলের দোকানে ছুটতে হবে। আজ ওপর-তলাতেও আটায় টান পড়েছে। আরতি খানিকটা নিতে এসেছিল একটু আগেই। উমা দিতে পারেনি—ও-রকম দু'মুঠো কি আধবাটি আটা দিতে তার খারাপই লাগে। ও বলেছে, এখন আর আটা নিয়ে গিয়ে কি করবি, আমার রুটি হয়ে গেল প্রায়। রুটিই আমি দিয়ে আসব। খান পাঁচ ছয় দিলেই হবে ত?

এখন রাস্তায় ওই বুড়ো ভিখিরিটাকেও যদি রুটি দিতে হয়—ওপর-তলায় কি ছাই দেবে উমা। কাকা ত এ-সব কিছু জানে না। মুখ ফুটে একটা কথা বল্লেই খালাস। উমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল বুড়োটার ওপর।

গিরিজাপতি লোকটার দিকে চেয়ে দেখছিলেন, কি ভাবছিলেন।

'এখানে কতদিন এসেছ বুড়ো?'

'বর্ষায়।' বুড়ো যা মুখে এল বলে দিল। বর্ষা বলতে যা বোঝ, বোঝ।

'একলা লোক?'

মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে বুড়ো। না, একলা মানুষ সে নয়। তার মেয়ে আছে। ডাগর মেয়ে। পোয়াতি মেয়ে।

'তোমার জামাই?' গিরিজাপতি শুধোলেন।

মাথা নাড়ল বুড়ো। আস্তে আস্তে। চোখের পিচুটি মোছবার জন্যে আঙুল রগড়ালো। জামাই নেই। বিয়ে সাদি হয়েছিল বটে, কাসেম আলির সঙ্গে, সে কবে। কাসেমটা বউ ছেড়ে ভেগে গেছে অনেক দিন আগেই। জোবেদা হাসপাতালের সামনে ফটকের কাছটায় বসে ভিক্ষে করত। এখন ব্যারাম হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দেয়।

গিরিজাপতির গলায় আর স্বর ফুটছিল না। জানলার শিকের ওপরে—অন্ধকারের মুকুট পরানো—কালো ভাঙা তোবড়ানো হাড় হাড় একটা মুখ যেন ক্রমশই আরও করুণ আর রহস্যময় হয়ে উঠছিল।

উমা সদরের চৌকাটে দাঁড়িয়ে বুড়োকে ডাকছিল, রুটি নিয়ে যেতে। বুড়ো জানলা ছেড়ে সরে গেল। সদরে। গিরিজাপতি অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন উমা ওকে ধমকাচ্ছে। রোজ রোজ এই বাড়ীতে ভিক্ষে চাইতে আসে বলে।

উমার দোষ নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই ডাক শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছে। দু' একদিন নয়—এ এখন নিত্য, দু'বেলা। আজ ক'দিন গিরিজাপতি স্বচক্ষে দেখলেন, সারাদিনে কত জন আসে যায়। সদরে দাঁড়িয়ে একটানা ডেকে ডেকে সাড়া না পেলে খোলা জানলার সামনে সরে আসে। ভিক্ষে চাওয়ার ভাষাটা প্রায় এক—গলার স্বরে তারতম্য থাকলেও ভঙ্গি আলাদা নয়। হাউ মাউ করে কেউ কাঁদে না, ইনিয়ে বিনিয়ে দুঃখের

কথা কয় না। টেনে টেনে একই সুরে ভিক্ষে চায়—মা, ওমা, দুটি ভাত দাও মা— ; মা—ওমা একটু ফেন দাও মা। এই সুরের মধ্যে অদ্ভুত রকমের চাপা জ্বালা আছে। মিনতির সুরটা তাই অভ্যাস দিয়ে তৈরি করা—আন্তরিক নয়। ভিক্ষাবৃত্তির পেশায় অপটু বলেই, সম্ভ্রমের লাগাম আছে বলেই—ঠিক পারে না, কেমন আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। আগে আরও আড়ষ্ট ছিল—এখন খানিকটা সয়ে গেছে। সয়ে যাবে।

সকালের দিকের সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ল গিরিজাপতির। কাঁকালে বাদুড়ছানার মতন একটা উলঙ্গ ছেলে ঝুলছে। পোড়ামাটির মতন রং গায়ের। রুক্ষ ময়লা মাথা, চিট ছেঁড়া বসন। কপালে খানিকটা ধ্যাবড়া করে যেটে সিঁদুর লেপা। বেমানান। যেন ভিক্ষেয় বেরুবার আগে কোথাও থেকে ওইটুকু যোগাড় করে লেপে নিয়েছে।···মেয়েটার গলায় জোর ছিল। কেঁদে ককিয়ে ডাকার মতন না। ভিক্ষে চাইতে বেরিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিল। সামনের রাস্তায়। অদ্ভুত তার যুক্তি। মিছেই এসেছি, আমাদের গাঁ গেরাম থেকে ধান চাল আনল কে, শহরের বাবুরাই না। তবে ড্যাকরারা ভাত দিবি না কেন ? আমার ভাইয়ের বউটাকে ফুসলে নিলি কেন তোরা,—এই কচি সজনেকাটি কে বাঁচাবে ! বোশেখ মাসের বিধবা চত্তির মাসে সিঁদুর দিয়ে টেঙা কাঁকালে করে বেরিয়েছি। মা না সাজলে হারামজাদারা বলে পরের ছেলে দেখিয়ে ভিক্ষে চাইছে।

মেয়েটা জিতল। তার মুখের চোটের কাছে পাশের বাড়ির গিন্নী বউ টিকতে পারল না। দু-চার জন পাড়ার ছোঁড়াটোড়াও ধারে কাছে জড় হয়েছিল। হাসাহাসি করলে। কিন্তু পারলে না। তার উগ্রতার কাছে এদের মিহি উপেক্ষা টিঁকল না। ভাত, ডাল—দু'চারটে পয়সা নিয়ে মেয়েটা চলে গেল। কে বুঝি একটা ছেঁড়াফাটা জামাও দিল কাঁকালের ছেলেটার জন্যে।

কী বিচিত্র এই নতুন মিছিল !

· ·

সদর থেকে ডাক দিতে দিতে দেবব্রত এসে হাজির। হাতে ব্যাগ।

'এস—এস দেবু। গিরিজাপতি দরজার দিকে তাকিয়ে দেবব্রতকে ডাকলেন। সহাস্যমুখে।

চৌকাটের পাশে জুতো খুলে রেখে দেবব্রত ঘরে ঢুকল। 'আপনার শরীর খারাপ হয় তা হলে?'

আরাম-চেয়ারটা দেখিয়ে গিরিজাপতি হাসিমুখে বললেন, 'বোস।' বিছানার ওপর ভাল করে বসেন নিজে, 'আমার শরীরটা আলাদা মাল-মসলা দিয়ে তৈরি ত নয়!' গিরিজাপতি হাসতে হাসতে বললেন।

'তবে যে সে-দিন আমার সঙ্গে খুব ঝগড়া করলেন?' দেবব্রতও হাসিমুখে বলল।

'ও—। তুমিও বুঝি তাই তারপর থেকে এ-বাড়ি আসা ছেড়ে দিয়েছ?'

'এক রকম তাই।' দিন পনেরোর বেশি এ-বাড়িতে তার আসা হয়নি। দরজার সামনে উমাকে দেখতে পেয়ে দেবব্রত সস্নেহ হাসি হাসল, 'এই যে উমারাণী—জল খাওয়াও,—ঠাণ্ডা জল।'

'এ-বাড়িতে পা দিলেই কি আপনার গলা শুকিয়ে যায়?' উমা খানিকটা কাছে এসে বলল।

'তা ঠিক। এত চেঁচামেচি অন্য কোথাও যে করতে হয় না।' দেবব্রত একবার গিরিজাপতির দিকে চেয়ে নিল।

'চা খাবেন না?' উমা শুধোল।

'খাব; একটু পরে—। আগে তেষ্টাটা মেটাই।'

জল আনতে চলে গেল উমা। দেবব্রত তাকাল গিরিজাপতির দিকে, 'কি হয়েছে আপনার বলুন?'

কোমর থেকে ডান পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ইশারায় দেখালেন গিরিজাপতি। 'দিন তিন চার আগে থেকে এ-পাশটায় খুব ব্যথা, দেবু। কোমর ওঠাতে পারছি না।' ব্যথার বিস্তৃত বর্ণনা দিতে লাগলেন গিরিজাপতি।

'ব্যথাটা তাঁহলে সামান্য নয়—কি বলেন?' সব শুনে দেবব্রত উঠল। জল নিয়ে এসেছে উমা। জলের গ্লাস নিঃশেষ করে দেবব্রত আরামের একটা শব্দ

করল। 'শুয়ে পড়ুন—' গিরিজাপতিকে বিছানায় শুয়ে পড়তে বলে দেবব্রত পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

গিরিজাপতি শুয়ে পড়লেন। দেবব্রত কোমরে ব্যথার জায়গাটায় টেপাটেপি করে দেখতে লাগল। উমা অল্প একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল।

'এ-রকম ব্যথা আগে ক'বার হয়েছে?'

'বার দুই।...অনেক কাল আগে একবার হয়েছিল। তেমন ব্যথাটাথা অবশ্য তখন হয় নি। বছর দুই আগে আর একবার হয়। সেবারে কিছুদিন ভুগিয়েছিল।'

'ডাক্তার দেখান নি?'

'তা দেখিয়েছি বৈকি!'

'কি বলেছিল?'

'লাম্‌বাগো—।'

'হুঁ।' দেবব্রত সায় দেবার মতন শব্দ করল। হাত-ব্যাগ খুলে এক-টুকরো কালো-কাঠ-আঁটা এক হালকা হাতুড়ির মতন যন্ত্র নিল। 'হাঁটু ভেঙে—এই ভাবে—' দেবব্রত গিরিজাপতিকে যেমন-চাই অবস্থায় রেখে—সেই হাতুড়ি পায়ের গাঁটে গাঁটে ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করতে লাগল। লাগে—লাগে না? বেশি লাগে—? সিরসির করে?'...অনেকটা সময় নিয়ে বেশ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল দেবব্রত। হাঁটু সোজা করে বিছানার ওপর ফেলে দিল আবার। এবার একবার পুরো পা-টাই সরাসরি সোজা তুলে কি যেন দেখবার ছিল। ধরতে হবে। কাউকে দরকার।

নিখিল ঠিক সেই সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছিল। হাতে বই, নোট খাতা। এই ফিরছে।

'এই, এদিকে এস।'

কাছে এল নিখিল। দেবব্রত বললে, 'এমনি করে পা-টা তুলে ধরে রাখবে। হ্যাণ্ডস্ আণ্ডার দি অ্যাংক্‌ল্‌...।'

বই নোটখাতা বিছানার ওপর নামিয়ে রেখে দেবব্রতর কথা মতন কাকার ডান পা আধ-শূন্যে তুলে ধরল নিখিল। কয়েক মিনিট লাগল দেবব্রতর পরীক্ষা

করতে। তারপর মাথা নাড়ল। 'ঠিক আছে, ছেড়ে দাও। উঠে বসুন আপনি।'

গিরিজাপতি আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। দেবব্রত মাথা নীচু করে কিছু ভাবছিল। মুখের ভাব গম্ভীর নয়। হঠাৎ কি চোখে পড়তে হাত বাড়াল। গিরিজাপতির কোলের পাশে বিছানার কিনারায় নিখিলের বই কাগজপত্র নোট খাতা পড়ে আছে। লম্বা মতন কাগজটাই তুলে নিল দেবব্রত। "পিপলস্ ওআর।" পাতা উলটে দু' এক পলক দেখল। রেখে দিল। চটি মতন একটা প্যাম্ফলেটও নজর করল।

দেবব্রতর হাত বাড়িয়ে কাগজ নেওয়া, বই নজর করা গিরিজাপতির চোখে পড়ল। তাঁর কোলের পাশেই রয়েছে। তাকিয়ে তাকিয়ে তিনিও কাগজপত্র প্যাম্ফলেট দেখলেন।

নিখিলকে কেমন যেন সঙ্কুচিত আড়ষ্ট মনে হল। মুখের ভাবে অপ্রত্যাশিত-র সামান্য বিহ্বলতা।

'আপনাকে বোধ হয় এবার একটু ভোগাবে।' দেবব্রতর আরাম চেয়ারটায় বসে পড়ল।

'লাম্‌বাগো-ই নাকি দেবু?

'মনে তাই হচ্ছে।' দেবব্রত চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়ল।

নিখিল হাত বাড়িয়ে তার বই, নোট খাতা তুলে নিল।

'চিকিৎসা তবে কাল থেকে শুরু করে দি, কি বলেন?' দেবব্রত তার স্বভাব মতন শান্ত হাসি খুশী গলায় বলল।

'দাও। কিন্তু, প্রেসে আমার না গেলে যে চলবে না দেবু—; তার একটা ব্যবস্থা—'

'আপনার শরীরে যদি কষ্ট না হয় যাবেন। হলে যাবেন না।' দেবব্রতর কথাগুলো এমন হালকা ভাবে বলা যে, মনে হয় না ডাক্তারের দায়িত্ব সে পালন করছে।

'না—না—দেবু, প্রেসে খুবই কাজের চাপ। মিহির একা সামলাতে পারছে না, লোক পাঠাচ্ছে বার বার।' গিরিজাপতির প্রায় অনুনয়ের অবস্থা,

'তুমি তোমার ডাক্তারী চালাও আমার আপত্তি নেই, তবে প্রেসে কয়েক ঘণ্টা যাতে থাকতে পারি—তার একটা ব্যবস্থা করে দাও তাড়াতাড়ি।'

'দেখি।'

উমা চা নিয়ে এসেছে। নিখিল ঘর ছেড়ে চলে গেছে আগেই। দেবব্রত চায়ের পেয়ালা নিয়ে ধীরে সুস্থে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। মুড়ির বাটিটা পড়ে আছে দেখে উমা কাকার দিকে চাইল। অখুশী মনে। 'মুড়ি খাও নি কাকা?'

না। গিরিজাপতি মাথা নাড়লেন আস্তে। ভুলেই গিয়েছিলেন খেতে। বললেন, 'নিয়ে যা, ভাল লাগছে না আর—।'

বেশ রাগই যেন হল উমার। মুড়ির বাটি তুলে নিয়ে চলে গেল। কোনো কথা বললে না।

'বুঝলে দেবু—' গিরিজাপতি খানিক আগের ঘটনাটা অল্প কথায় দেবব্রতকে গুছিয়ে বলতে লাগলেন। বুড়োর কথা শেষ হলে—সকালের মেয়েটির কথা। ওই রকমের আরও দু-একটি ঘটনা।

দেবব্রত শুনল। খুব একটা কৌতূহল বা আগ্রহ তার মুখে ফুটে উঠল না। যেন বিষয়টা সাধারণ, নতুন কিছু নয়।

গিরিজাপতির কথা শেষ হবার পর অল্প সময় কেউ কোনো কথা বলল না। শেষে দেবব্রত কেমন এক অপরিচ্ছন্ন অথচ অজ্ঞতার ভান গলায় নিয়ে বলল, 'আজিজুল হক সাহেব ত বলেছে—একে দুর্ভিক্ষ বলা যায় না!'

'দুর্ভিক্ষ কাকে বলে তা হলে!' গিরিজাপতি আপন মনেই বললেন, একটু অন্যমনস্ক। 'আমার খুবই আশ্চর্য লাগে দেবু, গান্ধীর অনশনে সমস্ত দেশ হায় হায় করে উঠে—অথচ গোটা বাংলা দেশের এই মাসের পর মাস অনশন—এর জন্য কোনো আলোড়ন নেই।'

'কথাটা ঠিক না।' দেবব্রত আপত্তি করল। 'কাগজে পত্রে কিছু কম আলোড়ন হচ্ছে না; নেতা যারা জেলের বাইরে আছেন, তাঁরা—যেমন ধরুন শ্যামাপ্রসাদবাবু কিছু কম লড়াই করছেন না।···আসলে ক্ষমতা ত তাঁদের হাতে নয়।'

গিরিজাপতি এ-রকম নিরীহ সাধারণ জবাবে কান দিলেন না তেমন ভাবে। বললেন, 'ব্যাপারটা একটু তলিয়ে ভেবে দেখ দেবু—কাগজের এডিটোরিয়ালের নাকি কান্না, সেন্সার বাঁচিয়ে সরকারকে গালাগাল, অমুক জায়গায় অত লোক মরেছে—শাক লতা-পাতা খাচ্ছে—ফলাও করে তার খবর ছাপা—খুব সাংঘাতিক কিছু একটা নয়।' গিরিজাপতি দেবব্রতর দিকে ক'পলক চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন, যেন কথাটা বুঝতে সময় দিচ্ছেন। আবার বললেন, 'কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার বুভুক্ষু এসে হাজির হয়েছে, কি করে পথে ঘাটে মরছে—তার দু-চারটে ছবি ছাপাকে তুমি আলোড়ন বলবে? মানুষ কি এ-সব দেখছে না। শহরে গ্রামে সব জায়গায় এর চেয়ে মারাত্মক কষ্টকর ছবি প্রতিদিন সবাই দেখছে।'

দেবব্রত যেন ভাবছিল প্রশ্নটাকে কি ভাবে তর্কের ছুঁচের মধ্যে গলানো যায়। শুধোল, 'আপনি কি করতে বলেন?'

'আমি নেতা নই।'

'কিন্তু, আপনার এই সমস্যার মীমাংসা সম্পর্ক কোনো ধারণা হয়ত আছে—না হলে সমালোচনা করতেন না।'

'না, তাও নেই। তবে আমার মনে হয়, বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক যখন উপোস করে মরছে—তখন তার যোগ্য প্রতিবাদ, আন্দোলন হওয়া উচিত।'

'যেমন—?'

'যেমন—।' গিরিজাপতি দেবব্রতর মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন অল্পক্ষণ—থমকে যাওয়া দৃষ্টিতে। তারপর কেমন এক রকম ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললেন, 'যেমন ধর—দেশের নেতারা—সে কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট বলে নয়—সকলেই, তোমাদের মহাত্মাজী সবাই মিলে আমরণ অনশন শুরু করুন না—। নেতার সংখ্যা সব মিলিয়ে কম হবে না। কয়েক শ।'

গিরিজাপতির উপহাস না বোঝার মতন কারণ ছিল না। দেবব্রত বুঝতে পারল; হয়ত আহত হল। মুখে বিন্দুমাত্র কিছু প্রকাশ করল না। বললে, 'আপনার কি মনে হয় তাতে কিছু লাভ হবে?'

'দেখতে ক্ষতি কি। এখন এ-দেশে অনেক বিদেশী আছে। খবরটা বাইরে ছড়াবে। মরাল প্রেসার বেশ জোরই হবে।'

দেবব্রত ভাবল খানিক। বলল, 'আপনার যুক্তি—মানে প্রস্তাবটা মজার।'

'কেন?'

'দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করার দাবীতে নেতাদের অনশন।'

'না—তা নয়—জনসাধারণকে অন্ন জুগিয়ে দেবার দাবীতে নেতাদের অনশন। দুর্ভিক্ষ ঘোষণার দাবী নয়—অন্নের দাবী।'

'বুঝলাম। আরও কিছু উপবাসীর সংখ্যা মৃত্যুর সংখ্যা আপনি বাড়াতে চান।' দেবব্রত হাসি হাসি মুখে বলল।

'যদি সে-রকম ভাব তবে তাই। বাড়িতে কিংবা জেলে সরু চালের ভাত দুধ মাছ খেয়ে বাইরের সভায় দাঁড়িয়ে দুর্ভিক্ষের কথা ঠিক বলা যায় না দেবু—বোঝাও যায় না। অনাহার অন্য জিনিস। তা বুঝতে ধান চালের হিসেব দরকার হয় না। যারা উপোস করে মরছে তারা ফালতু কথা বলে না। বলে, ভাত দাও।'

'নেতারা কি ফালতু কথা বলেছেন?'

'সে তুমিই ভেবে দেখ।···আমি যতটুকু বুঝি তাতে আমার কথা, মানুষ না খেয়ে মরছে, দু'চার জন নয়—হাজারে হাজারে। আমি নেতা চাই না—সে যত বড় নেতাই হোক,—মানুষগুলো বাঁচুক এইটাই আমি চাই।' গিরিজাপতিকে এবার উত্তেজিত মনে হল।

দেবব্রত একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ঘুরে ফিরে আমরা আবার সেই কথায় এসে পড়েছি, পুরনো কথায়—নেতা বড় না মানুষ বড়?'

'হ্যাঁ, সেই পুরনো কথাতেই।' মাথা নাড়লেন গিরিজাপতি।

'আমি ত আপনাকে আগেই বলেছি, আমি নেতায় বিশ্বাসী। মানুষেও। রেলগাড়ির কামরার নিজের গতি থাকে না; ইঞ্জিন না-লাগা পর্যন্ত। সাধারণকে চালাবার জন্যে নেতার দরকার।' দেবব্রত হাতঘড়ি দেখল। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

'বেশ ত, সেই নেতারা এই মানুষগুলোর একটা ব্যবস্থা করুন।' গিরিজাপতি বললেন।

'তাঁরা প্রায় সকলেই জেলে।'

'জেলে যাবার আগে তাঁদের কি এ-কথা মনে হয়নি—দেশের যা অবস্থা, এই যুদ্ধের যে নৈবিদ্য যোগাতে হবে ভারতবর্ষকে, তাতে অন্নাভাব অনাহার বস্ত্রাভাব হবেই!' গিরিজাপতি অসহিষ্ণু নন, কিন্তু বেদনার্ত। একটু থেমে কথাটা শেষ করলেন, 'মানুষকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়ে, তাদের তোমরা আজ তিন বছর ধরে তিলে তিলে মারলে।'

'এ-সব অত্যন্ত বাজে কথা।' দেবব্রত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, 'আপনি সহজ জিনিসগুলো বেঁকাভাবে দেখলে কে কি করতে পারে। মানুষ না খেয়ে মরছে—বা ধরুন মারা হচ্ছে—হ্যাঁ ইট ইজ এ কিলিং ইটটেনশনালি, পার-পাসলি—তার দায় দায়িত্ব বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের—আর কারুর নয়।' দেবব্রত প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল। সামলে নিল একটু, 'জানেন না আপনি, দেশে দুর্ভিক্ষ তবু টন টন চাল কলকাতার ডক থেকে বিদেশে সৈন্যদের জন্যে চালান হয়ে যায়। তাজ্জব ব্যাপার—! বাংলা দেশ থেকে চাল চলে গেল অথচ বেঙ্গল মিনিস্ট্রির কাউকে কিছু জানান হল না। এই নাম-কা-বাস্তে শাসন দণ্ড ধরিয়ে যা খুশি তাই ত করছে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট। অটোক্র্যাসি আর কাকে বলে?'

'কিন্তু তোমার নেতারা কি করলেন! জেলে গিয়ে বসে থাকলেন। ভোগটা কে ভুগছে দেবু। নেতারা না দেশের সাধারণ মানুষ। কেন? যদি না পারলে এই সংকটকে রুখতে, অন্তত সহ্য সীমার মধ্যে না রাখতে, তবে তোমার নেতাদের দরকারটা কি?' গিরিজাপতি বিরক্ত, ক্লান্ত—বীতশ্রদ্ধ।

দেবব্রত আর কিছু বলল না। রুমালে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল। ব্যাগটা তুলে নিয়ে হেসে বলল, 'তর্কটা আজ মুলতুবী থাক—আমায় আর এক রুগীকে দেখতে যেতে হবে। কাল আসব। কাল থেকে চিকিৎসা শুরু হোক!' দেবব্রত হাসি মুখে চলে গেল।

পনেরো

বাসুর নাইট ডিউটি। এ আর পি পোস্টে। দশটা থেকে শুরু। বাসুর আসতে সাড়ে দশটা বাজল। সন্ধ্যার আড্ডা ভেঙে গেছে। নন্দী একা। তারও নাইট ডিউটি। নন্দী প্রায় গোটা মাসটাই নাইট ডিউটি করে। রাত্রে তাকে যখন থাকতেই হবে এখানে—নাইটটা নিয়ে নেওয়াই ভাল। সারাটা দিন হাতে থাকে। হাসান সাহেব অবশ্য মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে ডিউটি বদলে দেন। বলেন, তুমিও মরবে—আমায়ও ফাঁসাবে।

বাসু এসে দেখল, নন্দী বাইরে বেঞ্চিতে শুয়ে আছে। ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখে নিল বাসু। তারপর বেঞ্চির পাশে বসল। 'কি গরম হে নন্দী!' বাসু বলল সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে।

'গুমোট খুব।' নন্দী বলল, 'একটা বিড়ি খাওয়াও না ভট্‌চায।'

বিড়ি ধরিয়ে দুজনে টানতে লাগল—গাছ আর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে।

গোপী বসু লেনের লাগানো সাহেবী মিশনারী স্কুলটার এক কোণে—ফেলনা ঘরের একটাতে এ-আর-পির অফিস। একদিকে প্রস্রাব আর পায়খানা,—সামনে ঢালাও মাঠ; বিরাট বিরাট গাছ, শিরিস, অশত্থ, নিম। আকাশ আড়াল করে ফেলেছে। স্কুলের এটা বাড়তি জমি, খেলার মাঠ। গোল পোস্ট পোঁতা আছে। শীতকালে ম্যাট পেতে ক্রিকেট খেলত ছেলেগুলো। এখন না ফুটবল না ক্রিকেট। আধখানা মাঠ জুড়ে স্লিট ট্রেঞ্চ কাটা। জলে কাদায় ময়লায় ট্রেঞ্চগুলো অবশ্য আবার ভরে উঠেছে, গরু মোষের মলে ভর্তি। মাঠের পশ্চিমে বড় ফটক। আগে বন্ধই থাকত; এখন এ-আর-পি ছোকরাদের ঘন ঘন যাতায়াতে খোলাই পড়ে থাকে; ছাগল, গরু, মোষ ঢুকে মাঠে চরে বেড়ায়।

এ-আর-পি অফিস-ঘর একটু ছোট। গুটি তিনেক চেয়ার, মস্ত বড় এক টেবিল, খান দুয়েক বেঞ্চ; মোটামুটি এই আসবাব। একটা আলমারিও আছে

একপাশে। এক কোণায় দুটি বালতি আর স্টিরাপ পাম্প। দেওয়ালে বড় বড় গজাল ঠোকা। লোহার টুপি ঝুলছে কোনটাতে, কোনটাতে কালো ওআটারপ্রুফ। আর ঝুলছে বউবাজারের এই এলাকার হাতে আঁকা এক ম্যাপ—সেক্টর ভাগ করা।

টেবিলের একপাশে একটা পুরনো আমলের ফোন। গুটি দুই খাতা। ছোট পোস্টবোর্ডে আঁটা ডিউটি রোস্টার ঝুলছে শেলফের সঙ্গে। গুটি কয়েক প্যাড। রিপোর্ট হলে মেসেজ লিখতে হবে।

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বাসুর বিড়ি শেষ হল। আজ কি অমাবস্যা নাকি? কে জানে! কী ঘুটঘুটে অন্ধকার। সামনের গাছগুলোকে মনে হয় একটা নিকষ কালো মেঘ যেন চোখের সামনে থমথম করছে। অত বড় তেতলা স্কুল বাড়ির সমস্তটা এই অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গেছে। কী স্তব্ধ! একটু শব্দ নেই। আকাশের কোথাও তারা চোখে পড়ে না। মেঘ করেছে। কদাচিত মৃদু একটা গর্জন আকাশের প্রান্তে কেঁপে উঠে মিলিয়ে যায়।

নন্দী নড়ে চড়ে উঠে বসল। বেঞ্চির আলগা পায়ায় শব্দ হল একটু মচ্‌মচ্‌। 'তুমি বসো ভট্‌চায; আমি একপাক ঘুরে আসি।'

'কোথায়?'

'এই কাছ থেকেই। ভীষণ খিদে পেয়েছে। সেই ও-বেলা এই কটি ভাত খেয়েছি—ব্যাস—তারপর আর নাথিং—বার কয় চা শুধু। পেটটা খুব মোচড়াচ্ছে খিদেতে।'

বাসুর কয়েক মুহূর্ত দেরি হল জবাব দিতে। 'তোমার বাতচিত শুনলে মাঝে মাঝে মেজাজ খচে যায়, নন্দী।' বাসু বিরক্ত আর চটে-ওঠা গলায় বললে, 'মাই খাওয়া খোকা নাকি যে পেট না মোচড়ালে বুঝতে পার না খিদে পেয়েছে! কি আটা মাখছিলে এতক্ষণ—দশটা পর্যন্ত?'

নীল রঙের ফুল প্যাণ্ট, শার্ট—নন্দীর রঙটাও কালো—; অন্ধকারে তাকে দেখাই যাচ্ছে না। সে আছে এই পর্যন্ত বোঝা যায়। নন্দীর মুখের চেহারা বাসু দেখতে পেল না; বুঝতেও পারল না।

'ইম্পরটেণ্ট টক্ হচ্ছিল আমাদের—হাসান সাহেব, সরকারদা আর আমি সারাটা সন্ধ্যে এই মাঠে আর পাড়ায় চক্কর মেরেছি।' নন্দীর গলায় বেশ গাম্ভীর্য। 'বুঝলে ভট্‌চায—ফিউচার ইজ ডার্ক—আমাদের আর এই নম্বর ফাইভ পোস্টে চাকরি করে খেতে হবে না। হাসান সাহেবের পেছনে খুব লেগেছে শালা এস-ও। তাড়াবে এখান থেকে। হেয়ার স্ট্রীট ঢুকিয়ে দেবে শুনছি।'

বাসু চুপচাপ কথাগুলো শুনল। কি ভাবল একটু, বলল, 'হাসানসাহেবকে বাম্বুটা দিচ্ছে কে?'

'চৌধুরীবাবু।'

'ঠিক ভেবেছি। ও-শালাকে আমি একদিন অ্যায়সা ম্যাক্ দিয়ে দেব—বাপের জন্মে ভুলতে পারবে না।…জানো নন্দী, আমি নিজের চোখে দেখিছি মাইরি, ওই চৌধুরী-শালা এস-ও,কে ঘরে ঢুকিয়ে—,

'জানি—জানি—সব জানি ভটচায; আমার চেয়ে কি তুমি বেশি জান? দাঁড়াও পেটে কিছু লোড্ মেরে আসি—তোমায় বলছি সব।' নন্দী ঢোলা প্যাণ্ট কোমরের কাছে গুটিয়ে নিল।

বাসুর মেজাজ নরম হয়ে পড়েছিল। বলল, 'এখন রাত এগারোটার সময় কোন দোকান খোলা পাবে?'

'সে-সব ব্যবস্থা আছে। ঠিক করে রাখতে হয়—বুঝলে ভটচায—তোমার মতন ভাতরুটি সাজিয়ে থালা এগিয়ে দেনেবালা আমার কেউ নেই—!'

নন্দী যেন রঙ্গ করে কথা বলছিল, 'এক প্রাণকেষ্টকে বাগিয়ে রেখেছি। ওই যে—ময়রার দোকান, ঝড়তি-পড়তি মাল যা থাকে—লুচি, সিঙ্গাড়া কচুরির আলতু ফালতু—ঝুড়ির তলায় গুঁড়ো-গাঁড়া যা জমে—আলুর দমের কাই, পচা আলু এক আধটা—সব আচ্ছাসে ঘেঁটে মেখে খেয়ে নি। ভেরী চিপ। ছ'পয়সায় একটা ঠোঙার আধখানা ভরে দেয়। ফাইন চিজ্। টেস্ট যা হয় ভটচায—!' নন্দী জুতোটা পায়ে গলিয়ে নিল, 'প্রাণকেষ্টকে আমি একটু বেশি আফিং জুটিয়ে দি।…চারটে পয়সা ছাড় না ভটচায—বিড়িও নিয়ে আসব।'

বাসুর মুখে আর কথা নেই। একটা আনি পকেট হাতড়ে বের করল।

নন্দীকে দিল। 'তাড়াতাড়ি এসো ; একলা রয়েছি—তারপর শালা কোনো ঝামেলা হলে প্যাঁচে পড়ে যাব।'

নন্দী চলে গেল। বড় গেটের দিকে। মাঠের অন্ধকারে মুহূর্তেই যেন উবে গেল। স্কুলের ছোট গেটটা ডান দিকে—এখন বন্ধ।

বাসু ঘুটঘুটে মাঠ আর গাছের জমাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। এই বিরাট বাড়ির একপাশে, কোন এক কোণায়, মাঠ গাছ অন্ধকার আর সাড়া শব্দহীন জায়গায় একা একা বসে থাকতে বাসুর ভাল লাগে না। খারাপ লাগে। ভয় হয় না, তবু যেন কেমন বিশ্রী লাগে। একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না। নন্দীর ওপর কি সাধে চটে যায় বাসু—এই সব ঝামেলা করে বলেই না মেজাজ বিগড়ে যায়।

একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল বাসু। হাসান সাহেব, এস-ও চৌধুরীবাবু—এদের মধ্যে যে গণ্ডগোল, প্যাঁচ খেলা চলছে—তার কথা ভাবতে লাগল।

ব্যাপারটা একেবারেই যে জানেনা বাসু—তা নয়। অনেক কিছু জানে। হাসান সাহেব লোকটা ভাল। বি, এ পাশ। বেশ বড় বাড়ির ছেলে। লোকে ত তাই বলে। অথচ হাসান সাহেব যেন কেমন লোক। সারাদিন ধেনো মদ খায়—আর বদ চেহারার একটা কালো মোটা মেয়ে নিয়ে থাকে। এঁদো ঠাণ্ডা নোংরা ঘর। মাটিতে ময়লা ছেঁড়া চাদর, তুলো ওঠা তোশক আর মাদুরের ওপর একটা বিছানা—তার ওপর বসে সারাদিন মদ খাচ্ছে।

এই হাসান সাহেবের সঙ্গে দোঁ-আশলা এস-ও'টার খুব দহরম মহরম ছিল আগে। এন্তার মদ মারত দুজনে এক সঙ্গে। তারপর কি যে প্যাঁচ খেলল চৌধুরীবাবু—হাসান সাহেবের অ্যাসিসটেণ্ট ওয়ার্ডেন—এস-ও আর হাসান সাহেবের মধ্যে গণ্ডগোল লেগে গেল। বাসু তা জানে—দেখেছে, বুঝতে পারে।

চৌধুরীবাবুকে বাসু নিজে পছন্দ করে না। নন্দী, সরকারদা, ভোলা, সিংহি—এরা এই পোস্টের কেউই নয়। চৌধুরীবাবুর পেয়ারের যারা আছে তাদেরও বাসু চেনে—মণ্ডল মশাই, অমূল্য—এমনি কয়েকটা মাল।···সে যাক। চৌধুরীবাবু লোকটা খুব শাহেনসা। লিকপিকে মরা কাকের মতন চেহারা ;

বুড়ো বুড়ো দেখায়, প্যান্ট পরে যেন চারপাশ থেকে কাপড়গুলো পত্‌পত্‌ করে ঝুলছে; কোমরে একটা ফিতে বাঁধা। পিঠ কুঁজো। গায়ের শার্টটা ঝলঝল করে। হাতে একটা শাড়ির পাড় সেলাই থলে। তার মধ্যে আমলা তেল, কলপ, সুর্মা, দাঁতের মাজন। ও-শালা ওই সব বিক্রি করে লোক ধরে ধরে। হাজার রকম বাকতাল্লা দিয়ে। সব কটা জিনিস বাড়ির তৈরি। বলে, বাড়িতে তিন চারটে অনাথ আত্মীয় দেশ ঘরের মেয়ে এসে পড়েছে—তাদের খাওয়াতে পরাতে হবে—তাই এই সব টুকটাক তৈরি করে বিক্রি করতে হয়। তা করুক বিক্রি—তাতে কারও কিছু যায় আসে না। এই পোস্টের প্রায় সবাইকেই এই রকম কিছু করতে হয়। তিরিশ টাকায় কার চলবে! মণ্ডলমশাই ত ঘুঘনি আলুর দম তৈরি করে বাড়িতে; তার ছেলে রোজ বিকেলে এই অফিসে এনে বিক্রি করে যায়। সরকারদের খুচরো চা বিক্রি আছে। ভোলা কন্‌ট্রোল মারছে, বাসুর মতন। সিংহি চিনে বাজার ঘুরে বেড়ায়—কার্বণ পেপার, কালি জুগিয়ে এনে এদিক ওদিক সাপ্লাই করে। সবাই প্রায় এই রকম।

চৌধুরীবাবু সিনিয়র বলে সত্তর পঁচাত্তর টাকা মাহিনা পায়—তাতেও যেমন কারও গায়ের জ্বালা নেই—তেমনি আমলা তেল, কলপ, দাঁতের মাজন বিক্রি করে বলে কেউ ওকে কাঠি করতে যাচ্ছে না। কিন্তু ও-শালা আসলে যা করছে—এই পোস্টের অনেকেই তা জানে। শালির মেয়ে, ভাগ্নের মাসী, অমুক-তমুক সম্পর্ক বলে যে কয়টা মেয়ে এনে জুটিয়েছে বাড়িতে তাদের দিয়ে চৌধুরীবাবু বিজনেস চালায়। খেতে পরতে না পাওয়া তিনকুল হারানো মেয়ে সব—বাঙাল সব ক'টাই—কি করে যেন এসে জুটেছিল কলকাতায়—চৌধুরীবাবু বাকতাল্লা মেরে নিজের ডেরায় এনে তুলেছে। ও-শালার বউ ত নেই, দুটো বাচ্চা আছে। মেয়েগুলোকে দিয়ে রান্নাবান্না, ছেলে সামলানো থেকে শুরু করে আমলা তেল শুদ্ধ কলপ, দাঁতের মাজন পর্যন্ত বানিয়ে নেয়। আর খচড়াটা ছোঁড়া ধরে ধরে ছুঁড়িগুলোকে লেলায়।

চৌধুরীবাবুর বাড়িতে ওই দো-আঁশলা এস-ও'টার যাওয়া আসা আজকাল

খুব। তাদের পোস্টে এই নিয়ে নানারকম আলোচনা হয়। সিংহি বলে, যা আমলা তেল মাখাচ্ছে ছুঁড়িগুলোর হাত দিয়ে এস-ও না পিছলে যায়।

লোকটাকে দেখলে মনে হয়, নিরীহ। গালে চড় মারলে টুঁ শব্দ করবে না। আসলে বেটা ভিজে বেড়াল। ঘাপটি মেরে থাকে। মিষ্টি মিষ্টি কথা: সব সময় ভাই ভাই। লোকটার মনে অথচ সবসময়ে প্যাঁচ। আর লোভ। হাসান সাহেবকে তাড়িয়ে ও এই পোস্টের চিফ ওয়ার্ডেন হতে চায়।

নিজের একটা দল করে ফেলেছে এখানে। মণ্ডল মশাই, হাবুদা—এমনি ক'টা বুড়ো হাবড়াকে নিয়ে—তার সঙ্গে আছে অমূল্য ফমূল্য। হাসান সাহেব মুসলমান হয়ে মাথায় চড়ে আছে এতেই একে জ্বালা ওদের—তার ওপর চৌধুরীবাবুর ঘোঁট পাকানো। হাসান সাহেবকে ঠেলতে ঠেলতে অ্যায়সা জায়গায় নিয়ে গেছে একেবারে আলসের ধারে—ধাক্কা মেরে ফেললেই হয় এবার।

বাসুর এই দলাদলি, প্যাঁচ, গুজগাজ, ফুসুর ফাসুর ভাল লাগে না। মেয়েছেলেদের মতন ঘোঁটপাকানো আবার কি। লড়তে হয় ত পুরুষ মানুষের মতন লড়ে যা। এ-সবের মধ্যে বাসু ভেড়ে না। এই পোস্টেই কতক্ষণ থাকে! যতটা সম্ভব কম। ফাঁকির ব্যাপারে একেবারে ফার্স্ট। ডিউটির সময়ও প্রায় কেটে পড়ে কোন একটা অছিলা করে। এক নন্দীর সঙ্গে ডিউটি থাকলে আলাদা কথা।

সামনের মাঠে দমকা হাওয়া বয়ে গেল। ধুলোবালির ঝাপটা। গাছের পাতায় সর সর শব্দ। আকাশে চোখ তুলে বাসু আর একটাও তারা দেখতে পেল না। কালো; ঘুটঘুট করছে।

টুপটাপ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল মাঠে। বৃষ্টি নামল। মাটি ভেজা এক ঝলক গন্ধ।...বেঞ্চিটা পিছু ঠেলে দিয়ে বাসু ঘরের মধ্যে চলে এল।

নন্দী এখনও ফিরলো না। এই এখুনি আসছি বলে গিয়ে আধ ঘণ্টা কাবার। ভূতের মতন একলা চুপচাপ বসে থাকে। বাসুর কাছে এ-ভাবে বসে থাকা একেবারে অসহ্য। নন্দীর এই এক ভীষণ দোষ। তোমায় ফাঁসিয়ে দিয়ে শালা কোথায় যে কেটে পড়বে—ব্যাস্—দুঘণ্টা আর পাত্তা নেই।

টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে বাসু আবার একটা বিড়ি ধরাল। মাথার ওপর হলুদ মতন আলো। নীল শার্ট আর প্যান্ট-ই আজ পরে এসেছে। নাইট ডিউটিতে এই পোশাকই ভাল। পরের পয়সার মাল—যত পার রগড়াও। দিনের ডিউটিতে কখনও এই বিদিকিচ্ছিরী পোশাক বাসু পরে না। একটা প্যান্ট করিয়েছে খাকি—ফুল প্যান্ট—সেইটাই পরে। গায়ে অবশ্য যখন যেমন জোটে তেমনি জামা।

আরও একটা প্যান্ট করাতে হবে—খাকি। মাল কড়ি নেই। কন্ট্রোলে আর জুত হচ্ছে না। এক গাদা লোক আজকাল লাইন মারে সকাল থেকে, তাদের টপকে কিছু চাল টাল ধরা বড় হুজ্জুত হামলার।

গৌরাঙ্গর কাছে ক'টা টাকা ধার চেয়েছে বাসু। দেবে বলেছে বেটা—তবু দিচ্ছে না। বেড়ে সুখে আছে গৌরে এখন। তখন শালা ভয়ে একেবারে মূর্ছা যাচ্ছিল—এখন রোজই দু চার টাকার ফসস্ ষ্ট্যাম্প ঝাড়ে। তৈরি হয়ে গেছে মাল। ওর আবার বিয়ের কথা হচ্ছে। গৌরে বলছিল, শোভাবাজারের মেয়ে—নামও শোভা। মেয়েটার নাকি খুব চুল রে মাইরি, হাঁটু পর্যন্ত।

এ-দিকে টু পাইস ইন্‌কাম—ওদিকে শোভা, কী সুখেই আছে গৌরাঙ্গ। আর বাসু?

নিজের কথা ভেবে বাসুর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। এ আর পি-র থারটি রুপিজ ছাড়া আর না হয় এদিক ওদিক থেকে পনেরো বিশ টাকা। কি হয় তাতে? বাড়িতে মা আজকাল খুব চালাক হয়ে গেছে। সব সময়ই হাত পাতছে, একটা টাকা দে—চার আনা পয়সা। রেগে যা আরতির কাছে: আজ তেল আনতে হবে, কাল কয়লা কি কাঠ; না হয় চাল আটা বাড়ন্ত। রোজই মা'র একটা না একটা কিছু আছেই। বাসুর অ্যায়সা রাগ হয়। রাস্তার ভিখিরিগুলোর মতন সব সময় হাত বাড়িয়ে আছে। মা ভাবে কি, বাসুর টাকার গাছ আছে নাকি যে নাড়লেই টাকা ঝরে পড়বে!

ভেবে চিন্তে বাসু দেখছিল, তাদের বাড়ির যা অবস্থা তাতে খাই খাই ছাড়া আর কিছু নেই। মা অন্য কিছু ভাবে না। বিয়ে টিয়ের কথা কেই বা

ভাবছে! দিদি চালাক খুব। ব্যাপার দেখে নিজেই একটা বাগিয়ে নিয়েছিল; সুচারুবাবু যুদ্ধে না গেলে এতদিনে ঠিক ওদের একটা কিছু হয়ে যেত। ভাগ্য খারাপ বেচারীর, গিঁটটা লেগেও খুলে গেল। দিদির জন্তে বাসুর একটু করুণাই হয় এখন।

গৌরাঙ্গর সঙ্গে নিজের তুলনা করে বাসুর একটা নিশ্বাস পড়ল। সুখেই আছে গৌরাঙ্গ! এ-দিকেও টু পাইস কামাচ্ছে—ওদিকেও শোভারাণী তৈরি হচ্ছে। কপাল করে জন্মেছিল শালা!

উমার কথা মনে পড়ছিল বাসুর। মেয়েটা ভাল। বাসুর সঙ্গে চুপি চুপি একটু লভ্‌টভ্‌ও হয়েছে। ঠিক অবশ্য বোঝা যায় না। বড্ড চাপা মেয়েটা। এক এক সময় এক এক রকম করে। চোট আছে উমার। বাসুকেও মাঝে মাঝে অ্যায়সা কড়কে দেয়—অবাক হয়ে যায় বাসু নিজেই। কিন্তু উমা আর বাসু প্রায় সমান বয়সী। মেয়েটাকে দেখতেও যে বড় খারাপ। যদি অতটা বাঁটকুলে বামন না হত, তবু একটা কথা ছিল। মাথায় ওই আড়াই হাত, মোটা, ফ্যাস ফ্যাসে রঙ মেয়েটাকে নিজের মতন সুন্দর চেহারার ছেলের বউ হিসেবে ভাবতে বাসুর ভাল লাগে না। এ-পাড়ায় পরী, কমলা, ইন্দু—কত ত মেয়ে আছে—তাদের কারুর মতন কেন হল না উমা! বাসুর কষ্টই হয় ভাবতে।

নন্দী ফিরল। জুতোর শব্দে চোখ তুলে তাকাল বাসু। আর সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠল, 'এই তোমার এক পাক ঘুরে আসা নন্দী? কোথায় লড়িয়ে এলে এক ঘণ্টা?'

নন্দী টেবিলের ওপর আধশোয়া হয়ে বসল। হাত বাড়াল শেলফের দিকে, 'মেসেজ ফর্মটা দাও ত ভট্‌চায।'

বাসু ফর্মের প্যাড এগিয়ে দিল।

'বুড়োটা বোধ হয় মরেই গেছে। বুঝতে পারলাম না কিছুতেই'। নন্দী মেসেজ লিখতে শুরু করল খস খস করে। মুখে বলল, 'অ্যামবুলেন্সকে ভিড়িয়ে দি, যা হয় করুক শালারা।'

নন্দীর মেসেজ লেখার দিকে তাকিয়ে থেকে বাসু বিরক্তস্বরে বলল, 'সুখে

থাকতে ভুতে কিলোচ্ছিস তোমায়। বেড়ে ছিলাম, আবার এক ঝামেলা নিয়ে এলে?'

'বয়ে গেছে আমার আনতে।' নন্দী জবাব দিল, 'আমি কি সেধে গিয়েছিলাম নাকি। সব বেটাই এখন লাট হয়ে গেছে। ঘরের দরজার কাছে হেগে মুতে মানুষ মরছে,—দরজার সামনে নোংরা—দাও এ-আর-পি-তে খবর।' নন্দী মুখ তুলে বাসুর দিকে তাকাল, 'হেলতে দুলতে কোনো রকমে পোস্টে এসে বাবুরা কেউ খবরটা দিয়ে গেলেন—তারপর তোমার ডিউটি। তুমি শালা এবার ঝামেলা পোহাও।' নন্দী মেসেজ লেখা শেষ করে আবার মাথা নোয়াল, 'হুকুম তামিল না করলে ক্লীন বাম্বু।'

বাসু নন্দীর মেসেজের দিকে ঝুঁকে পড়ল। লেখাটা দেখতে দেখতে বলল, 'তোমায় পাকড়ালো কোথায়?'

'এই ত গেটের কাছে। কার চোখ পড়েছে—দয়া উথলে পড়েছিল, খবর দিতে আসছিল পোস্টে; গেটের সামনে দেখা—। তার সঙ্গে গেলাম আবার দেখতে।' নন্দী ফোন তুলে নিল, বাসুকে বলল, 'সন্ধ্যে থেকে পড়ে আছে লোকটা—তখন নাকি বেঁচে ছিল।···হ্যালো—হ্যালো অ্যামবুলেন্স প্লিজ, অ্যামবুলেন্স···? বউবাজার আর-পি সেক্টর নাম্বার ফাইভ স্পিকিং···হ্যাঁ, বউবাজার। স্যার, আর একটা রিপোর্ট আছে যে,—কি বলছেন—রাত এগারোটা—! এগারোটার সময় খবর পেলুম—আমরা কি করবো? নিয়ে যাবেন না তুলে? চেষ্টা করবেন···? বেঁচে আছে কি না বুঝতে পারলুম না। ডাক্তার নই ত—ও-সব আপনারা বুঝুন।···বলবেন না দাদা, শখ করে কি জ্বালাতন করছি—বড়লোকের বাড়ির দরজার সামনে মরেছে যে—হঠিয়ে না নিলে—কাল বাম্বু করে দেবে। আজ্ঞে হ্যাঁ—দয়া করে একবার গাড়িটা পাঠান। কাইগুলি রাস্তা থেকে তুলে নিন—তারপর যা খুশি আপনাদের—বেহালা হাসপাতাল, নিমতলা, গঙ্গা—আমরা আর কিছু জানি না।—আদার ব্যাপারী স্যার, আমরা জাহাজের খবর রাখি না।···কি? বউবাজার থেকেই সারাদিনে সাতাশটা আজ? ও ত কম স্যার···নাথিং···আমি নিজের চোখে কালকের বাসি মড়া পড়ে থাকতে দেখেছি···আচ্ছা; হ্যাঁ···

লোক থাকবে—ক্যাণ্ডারডাইন লেন দিয়ে ঢুকে একটু ডাইনে এসে বাঁ দিকের মোড়ে। ক্রসিং। হ্যাঁ—ক্রসিংয়ের কাছেই—একদিকে···হ্যাঁ—প্রাইভেট প্রেস—ঘোক্ষম ধরেছেন স্যার তবে একটু এগিয়ে সেটা··· আচ্ছা ···আচ্ছা···।' নন্দী ফোন ছেড়ে দিল।

'কাদের বাড়ি নন্দী?' বাসু শুধোল।

'মুখুজ্যেদের। ওই যে বেশ মন্দিরের মতন চুড়ো করা সদরটা?' নন্দী পকেট থেকে বিড়ি বের করল। বাসুকে দিল একটা; ধরাল। 'কি, তুমি যাবে না আমি যাব ভট্চায? অ্যামবুলেন্স না আসা পর্যন্ত এখন ওখানে গিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। নীল কাচের লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে দিয়ে যাও—অ্যামবুলেন্স শালাদের স্পট ঠিক করতে কতক্ষণ লাগে দেখ।'

বাসুর মেজাজ আরও বিগড়ে গেল। রাত বারোটার সময় রাস্তায় গিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাক। পায়ের কাছে মরা চিম্‌সে বুড়ো। হেগে মুতে ছত্রাকার করে রেখেছে হয়ত।

'বৃষ্টির মধ্যে আমি এখন রাত দুটো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকব একলা একলা? বয়ে গেছে আমার?'

'কোথায় বৃষ্টি! দু'চার ফোঁটা পড়েই চেপে গেছে।' নন্দী টেবিলের ওপর পা তুলে বসল। 'ওয়াটার প্রুফটা নিয়ে যাও—বৃষ্টি যদি আসে—।'

বাসুর যাওয়ার কোনো গরজ নেই। বললে অবশ্য নন্দী যাবে। কিন্তু আবার যদি ফোনে ঝামেলা করতে হয়—বাসু পারবে না।

বিরক্ত অপ্রসন্ন গলায় বাসু গজগজ করতে লাগল। যেন নন্দীই সব কিছুর জন্যে দায়ী। 'খুব শালা চাকরি। সারাদিন রাস্তা থেকে ঘাটের মড়া কুড়িয়ে কুড়িয়ে পাঠাও। কাল—কালকে—ওয়েলিংটন স্ট্রিট থেকে তিনটেকে পাঠিয়েছি দুপুরে একা—তা জানো ভট্চায! একটা মেয়েছেলে ত একেবারে ন্যাংটো, হিক্কা তুলছে। রোজ রোজ দু'বেলা এই ভিখিরি আর মরা পাচার করা। কাঁহাতক মানুষ পারে। আমরা কি মেথর মুদ্দোফরাশ?' বাসু চিৎকার করে কথা বলছিল, ভীষণ অসহিষ্ণু আর উত্তেজিত, 'শালা চোখে পর্যন্ত দেখা যায় না। আগে ঘেন্নায় গা গুলিয়ে বমি আসত। এখন সে-সব

সয়ে গেছে। তা'বলে আমরা নিমতলার ডোম নই! রাস্তা গলি বাড়ির দরজা যেখানে যে-বেটা মুখ গুঁজড়ে পড়ল—অমনি শালা দাঁড়িয়ে পড়লাম!' ...বাসু পায়ের জুতোটার ফিতে বেঁধে নিল, 'হ্যাত—এ-চাকরি ভদ্দরলোকে করে না। ডোম মেথরের চাকরি। ছেড়ে দেব শালা—!'

দেওয়ালে ঝুলনো কালো ওয়াটারপ্রুফটা টেনে নিল বাসু। আরও খানিক গজগজ করল। যাবার আগে বেশ রুক্ষ চড়া গলায় বললে, 'আধঘণ্টার বেশি আমি ওখানে থাকব না নন্দী। তোমার অ্যামবুলেন্সের জন্যে সারা রাত ঠায় আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।'

স্কুলের মাঠ ছাড়িয়ে গলি। অন্ধকার, ঘুটঘুটে। এ-গলিটায় যত রাজ্যের উড়ে মেড়ো, ছাতুবালা, পানবালা কয়লা কাঠের দোকান, গোয়ালাদের যোগানদার। বস্তি বস্তি ঢঙের বাড়ি। দু' এক জন বাইরে শুয়ে রয়েছে, কথাবার্তা বলছে। বাসু গলির ডান দিকে এগুতে লাগল। গোপী বসু লেনের মুখে দাঁড়িয়ে ডান দিকে তাকাল একবার। মোড়ের মুখে একটাও লোক নেই। উলটো দিকের বস্তির মধ্যে সাজগোজ করা থলথলে গা বেশ্যাগুলোর এখন খুব বাজার পড়েছে। এই গলিটা কি ছিল, কি হয়ে গেল! সন্ধ্যের শুরু থেকে গলিটা যেন প্রেমচাঁদ বড়ালের গলি হয়ে ওঠে। খাকি পোশাক চড়ানো দিশি মিলিটারীগুলো ভিড় করতে থাকে। শালাদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। রাস্তার মধ্যে কি যে করে আর না করে।... দিন দশ পনেরো আগের কথা মনে পড়ল বাসুর। ঝিপ ঝিপ বৃষ্টি। রাত বুঝি ন'টা বাজে। পোস্ট থেকে ফিরছিল বাসু। গলির মধ্যে ওই সিগারেট বিড়ির দোকানটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই চক্ষু স্থির। বেহেড একবেটা দাড়িবালা মিলিটারী রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছে—আর এই পট্টির সবচেয়ে টান মেয়েছেলেটা মাতাল হয়ে রাস্তার মধ্যিখানে টলে টলে নাচছে। গায়ে কিছু নেই—কাপড়ের একটা ফালি ছাড়া—; কাপড় কোথায় পড়ে আছে—পরনে শুধু সায়া। সায়াটা ঘাঘরার মতন তুলে ধরে মাতাল মেয়েছেলেটার কী

নাচ। পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দু'চারজন খুব প্রেমসে এই রগড় দেখছে হাতে তালি দিয়ে দিয়ে।

বাসু একবার তাকিয়ে দেখল। গলিটা ফাঁকা। বিড়ি সিগারেটের দোকানটা খোলা রয়েছে মনে হচ্ছে। একটা রিকশা ঢুকল। কার যেন বিশ্রী হাসির টুকরো ছিটকে এসে পড়ল। বস্তির মধ্যে নরক এখন গুলজার। হয়ত তাদের কেউ হাসছে।

ক্যাণ্ডারডাইন লেনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল বাসু—বাঁ হাতি পথ ধরে। অনেকদিন মাল খাওয়া হয় নি। নন্দীকে বলে বলে বাসু হয়রান হয়ে গেছে। নন্দীটা আজ-কাল আজ-কাল করে বাকতাল্লা দিয়ে যাচ্ছে। নাইট ডিউটি থাকতে থাকতে একদিন খেয়ে নিতে হবে। সে-ই বেস্ট। খেয়ে বাড়িতে রাত কাটানো বড় ঝামেলার। দিদি একবার ধরেই ফেলেছিল। ভাগ্যিস কাউকে আর বলেনি। মা জানতে পারলে কেলেঙ্কারী করত। আগেকার দিনের লোকগুলোর বড় শুচিবাই।

হাঁটতে হাঁটতে বাসু ক্যাণ্ডারডাইন লেনের কাছাকাছি এসে বাঁ হাতি গলিটায় ঢুকে পড়ল। মুখুজ্যেদের বাড়ি সামনে। রাস্তায় কিছু চোখে পড়ে না। বেশ খানিকটা দূরে টিমটিমে গ্যাস পোস্ট। পকেট থেকে ছোট টর্চ বের করে জ্বালল বাসু।

পিচের কালো রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে কি একটা পড়ে আছে। বুড়োটা নিশ্চয়। কাছে এসে টর্চ ফেলল বাসু। কাত হয়ে শুয়ে আছে লোকটা। গায়ে কিছু নেই; কোমরের সঙ্গে একহাত কাপড় জড়ানো; খুলে গেছে। বুকের হাড়গুলো খাঁচার শিকের মতন খটখট করছে, পেট তলিয়ে রয়েছে কোথায়, গায়ে কোথাও একটু মাংস নেই। মুখ দেখলে মনে হয় মরে গেছে। বাসু টর্চ ফেলে অনেকক্ষণ ধরে বোঝবার চেষ্টা, করল, লোকটা বেঁচে আছে কি না। চোখের পাতা নড়ছে না; কাঁপছে না—বুকের কোথাও একটু কাঁপুনি নেই। মরেই গেছে। নাকের কাছে আঙুল রাখলে অবশ্য বোঝা যেত—নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না। কিন্তু বাসুর কিছুতেই সে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না।

টর্চ নিভিয়ে একটু দূরে সরে গেল বাসু। বিড়ি ধরাল। তাকিয়ে থাকল হাঁ করে গলির মুখটার দিকে—অ্যামবুলেন্সের গাড়ির অপেক্ষায়।

এই গলিটা একেবারে চুপচাপ। খানিকটা এগিয়ে গেলে দু'চার টুকরো হাসির শব্দ হয়ত শোনা যেতে পারে। মালের গন্ধও নাকে আসতে পারে। তিন চার ঘর নতুন পোশাকি খানকির আড্ডা হয়েছে ওই হলুদ মতন বাড়িটার মধ্যে। তার মধ্যে একটা নেপালী মেয়ে আছে। খড়ম পায়ে বাজার হাটে যায়। আর একটা আছে......

অন্ধকারের মধ্যে একটা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি এগিয়ে আসছিল। ঘোড়ার পায়ের খুরের শব্দ উঠছে খট্ খট্। গাড়ির চাকায় কেমন একটা শব্দ ; মচ্‌মচ্। বাসু তাকিয়ে থাকল। গলির মুখ দিয়ে ঢুকলে এ-দিক পানেই এগিয়ে আসছে।

বাসু বুঝতেই পারল, কোনো শালা হাওয়া খেয়ে রঙ চড়িয়ে ফিরছে। হলুদ-রঙ-বাড়িটার কাছে এসে গাড়িটা থামবে। বাবু সাহেব নামবে, হাত ধরে মেয়েছেলে একটাকে নামাবে। তারপর দু'টোতে ঢুকে পড়বে।

অন্ধকারে অদ্ভুত এক শব্দ তুলছিল ঘোড়ার খুর—গাড়ির চাকা। শব্দটা মিইয়ে আসছিল, থেমে থেমে যাচ্ছিল।

গাড়িটা থামল। এ, আর, পি-র ঘর নীল পোশাক পরা বাসু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব। গাড়িটা মুখুজ্যেদের বাড়ির সদর থেকে হাত দুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অন্ধকারে আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

টর্চ হাতে কে একজন নেমে সদরে গিয়ে আস্তে করে কড়া নাড়ল। লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এল কে। গণেশ মুখুজ্যে। বাসু মুখ না দেখেও চর্বিবালা চেহারাটা আলোয় অনুমান করতে পারল। রাস্তার মধ্যিখানে মড়া বুড়োকে পাশ কাটিয়ে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গণেশ।

কিছু কথাবার্তা হচ্ছিল। বাসু বুঝতে পারলে। গলা শুনতে পেল, কথা বোঝা গেল না। কে যেন টর্চ ফেলল—এ-পাশ ও-পাশ। বাসুর গায়ে

এসে পড়ল। থমকে থাকল আলোটা একটু। তারপর একটা মানুষ এগিয়ে আসতে লাগল টর্চ হাতে।

গণেশ মুখুজ্যে। বাসুর গায়ে মুখে টর্চের আলো ফেলে গণেশ বললে, 'চেনা চেনা মনে হচ্ছে মাস্টারকে!'

'এ আর পি?'

'ও হো, আমাদের এই স্কুল বাড়ির অফিসটার!—মড়াটা তুলতে এসেছ? গণেশ বাসুর কাঁধে হাত রাখল খপ্ করে, 'ন্যাস্টি অ্যাফেয়ার, না মাস্টার! লোকটার বডি পচে যাচ্ছে। কি রকম গন্ধ উঠছে; বুঝতে পারছ না।'

'মরে গেছে—?' মরে গেলে মরা তোলার যে ঝামেলা—পুলিসে খবর দেওয়া দেওয়ি বাসুর সেই ঝামেলার কথা মনে পড়ে বিরক্ত লাগল। তবু একটু নরম গলায় বললে, 'মরে গেছে কি না বুঝতে পারলুম না। অ্যামবুলেন্সে খবর দিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি।'

'দূর দূর, বেঁচে থাকলে এতক্ষণ আ: উ: একটা শব্দ করত। দেখ—তবু দেখ—কি হয়! এই ভিখিরিগুলোর লোহার প্রাণ—মরেও মরে না।' গণেশ মুখুজ্যের গলার স্বরে যেন বিরক্তি আর ঘৃণার একটা তাচ্ছিল্য কেঁপে গেল। লোকটা ঘোড়ার গাড়ির দিকে তাকাল। ডাকল, 'অনুকূল—।'

গণেশ মুখুজ্যের কথা ভাব ভঙ্গির মধ্যে তাড়াতাড়ির একটা ভাব বাসু লক্ষ্য করছিল। আর একটু বেশি রকম হালকাভাব, অন্তরঙ্গতার আতিশয্য। 'তোমরা এ-আর-পি-র লোক মাস্টার—আরে বাব্বা গবর্ণমেন্টের পেয়ারের লোক—' গণেশ মুখুজ্যে বাসুর কাঁধ ধরে বেশ একটু ঝাঁকুনি দিয়ে হাসল 'তোমাদের আমি খুব খাতির করি ভাই!' অনুকূল কাছাকাছি এসেছে, বাসু চেনবার চেষ্টা করল। ততক্ষণে গণেশ মুখুজ্যে আরও একবার কাঁধ নেড়ে দিয়ে বলতে শুরু করেছে—'কিছু চাল আছে মাস্টার···আরে না না ব্ল্যাক মার্কেটের জন্যে নয়, ও-সব চামারগিরি আমরা করি না—আমার বাবা কালিদাস মুখুজ্যে এ-পাড়ায় ফরটি ইয়ার্স কাটিয়েছে—কী নাম ডাক তাঁর—তুমি নিশ্চয় জানো, পাড়ার লোক এখনও নাম শুনলে হাত জোড় করে···ভেরী রেসপেকটেবল্ ফ্যামিলি আমাদের···' অনুকূলের দিকে হাত বাড়াল গণেশ

মুখুজ্যে—'পাঁচটা টাকা দাও অনুকূল—ও হ্যাঁ—হ্যাঁ—শীগ্রি শীগ্রি নামিয়ে ফেল বস্তাগুলো—তোমাদের করছি-করির জন্যে এই ছেলেটি ত ফেঁসে যেতে পারে না—তাড়াতাড়ি কর—এখুনি অ্যামবুলেন্সের গাড়ি এসে পড়বে।'

অনুকূল টাকা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। সদরের পাশে যেন ছায়ার সঙ্গে মিলিয়েছিল বাড়ির চাকর বামুন। ঘোড়ার গাড়ির দরজা খুলে চালের বস্তা নামতে লাগল।

'একটু সস্তায় ক' বোরা চাল পেলাম বুঝলে মাস্টার। বিগ্ ফ্যামিলি আমাদের—আর হার্ড মার্কেট—কয়েক বোরা অনেক কষ্টে আনিয়েছি। যাক গে···সে আমার ফ্যামিলির হোক আর যাই হোক—তুমি একেবারে ফালতু ছেড়ে দিতে পার না।···না···না···পাওনা তোমার একটা হয়। আই ক্যান নট্ চীট্ ইউ।' গণেশ মুখুজ্যে বাসুর পকেটে হাত ঢুকিয়ে কী পুরে দিয়ে হন হন করে পিছু ফিরে গেল।

বাসু থ' হয়ে দাঁড়িয়ে। গণেশ মুখুজ্যে আর অনুকূলরা অন্ধকারের মধ্যে ম্যাজিকের মতন মিলিয়ে গেল। কি যে হয়ে গেল—ভাল বরে বুঝতে না বুঝতেই—গাড়িটা অন্ধকারে নড়ে চড়ে উঠল—শব্দ হল ঘোড়ার খুরের, ঘড় ঘড় একটু—সহিসের বাঁধা বুলি—আর কাশি।

বাসুর পাশ কাটিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল গাড়ি। খট্ খট্···: চাকার গড়ানো শব্দটা এই গলির মধ্যে আরও একটু থাকল। মিলিয়ে গেল একসময়।

গণেশ মুখুজ্যেদের সদর বন্ধ। রাস্তায় একটা লোক নেই। নিস্তব্ধ। সব যেন মরে গেছে। ওপরে আকাশ তেমনি কালো। গুমোটও খুব।

গণেশ মুখুজ্যের গুঁজে দেওয়া টাকাটা পকেট থেকে বের করল বাসু। টর্চ জেলে দেখল। পাঁচ টাকা নয়, দু টাকার একটা নোট। ···শালা হারামির বাচ্চা! বাসু দাঁতে দাঁত চেপে গাল দিল।···তারপর কি ভেবে টর্চটা একবার ঘুরিয়ে ফেলল বুড়োটার দিকে। মড়ার মতনই পড়ে আছে শরীরটা।

অ্যামবুলেন্সের পাত্তা নেই। বাসু টর্চ নিভিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কী অন্ধকার। বাসুর গা যেন কেমন একটু ছমছম করে উঠল।

ষোলো

ভোরের দিকে এক পশলা বৃষ্টিতে আকাশ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। রোদ উঠল; হালকা নীলের তলায় আলো স্বচ্ছ কাচের মতন ঝিকমিক করছিল। ক'টি কাক পাঁচিল থেকে পাঁচিলে ছাদের মাথায় মাথায় উড়ে বেড়াচ্ছিল; আর চড়ুইও এক ঝাঁক। বোঝা যায় না, শরৎ কি এলো না ফুরিয়ে গেল। আরও বেলা বাড়লে, রোদ আরও চ'ড়ে উঠলে—আকাশ আরও নীল হবে, কতক আলসে মেঘ এদিক ওদিক ছিটিয়ে ছড়িয়ে বুক ঝুঁকে থাকবে। যেন তাকিয়ে দেখবে নীচের কাণ্ডকারখানা।

বউবাজার পাড়ার এই অঞ্চলটার অলি গলিতে তখন রোদ আসছি-আসি করে সবে এসেছে। অত্যন্ত কৃপণের মতন, গা পা বাঁচিয়ে, শুচিবাইয়ের পথ চলার মতন টপকে-টাপকে। দোষ কি? ফটিক দে লেন, নিউ বউবাজার, গোপী বসু লেনের মুখে মুখে মোড়ে মোড়ে—পা ফেলতে হাঁটতে-চলতে সাবধান না হয়ে উপায় নেই। সারাটা রাস্তা এখনও জল জল হয়ে রয়েছে, আর পাশ ঘেঁষে মলমূত্র, বমি উচ্ছিষ্ট আবর্জনা, নোংরা, তরকারির খোসা, মরা বেড়াল, নোংরা কাপড়ের টুকরো, সরা, হাঁড়ি মালসা--ইঁট। সকালে এখানেও এক পশলা হয়ে গেছে, বৃষ্টি নয়—ছোট খাটো কুরুক্ষেত্র। রোজই হয়। গঙ্গাজলের মুখ খুলে যখন কর্পোরেশনের লোক পাইপ দিয়ে জল ছাড়ে—রাস্তা ধুতে—তখন লেগে যায়। এরা জলের সবটুকু তোড় পাইপের মুখে এনে ফোয়ারা করে ছুঁড়বে—মল ময়লা জঞ্জাল কোনো গতিকে আশে পাশে ভাসিয়ে দেবে—আর ওরা তা হতে দেবে না। এই নিয়ে ঝগড়া। দোষ এদেরও নয়। সারা রাত ধরে গলির ধার ঘেঁষে বসে থেকেছে কনট্রোলের লাইনে। ইঁট পেতে, পাতা বিছিয়ে, থলি রেখে, নিদেন পক্ষে একটা দাগ টেনে। এপাশে লাইন কনট্রোলের, ওপাশে অলি গলির গায়ে বাড়ির ফাঁক-ফোকর খুঁজে হাঘরেদের রাতের আশ্রয়টুকু খোঁজা। চিরস্থায়ী একটা

অধিকার এনে ফেলেছে বা কেউ কেউ। মাটির সরা, পোড়া হাঁড়ি, টিনের মগ এক ফালি চট আর লেজ খসা বেঙাচির মতন কটা বাচ্চা কাচ্চা ট্যাঁ ট্যাঁ নিয়ে সংসার ফেঁদে ফেলেছে। সদরে যেতে ভয়—পুলিসের গাড়ি ধরে নিয়ে যাবে।

রোজ সকালে এই কনট্রোলের লাইন দেওয়া সারি আর উড়ো পাতার জঞ্জালের মতন এই নতুন আসা মানুষগুলোর সঙ্গে কর্পোরেশনের জল দেওয়া লোকগুলোর লেগে যায়। এদের লাইন ভেঙে যায়, পাতা জলে ভেসে যায়, থলি গিয়ে ঠেকে আরও আস্তাকুঁড়ে—সরা হাঁড়ি টিনের মগ ছত্রখান হয়ে যায়—গা গতর ভিজে যায়—বাচ্চা কাচ্চাগুলো প্রায় নেয়ে উঠে চেল্লাতে থাকে—কাজেই রাগটা দপ্ করে মাথায় উঠে আসে। এই শালা নবাবের বাচ্চা—জল দিবি তো তোর বাপের আবার জন্ম দেখিয়ে দেব। হারামজাদা হচ্চর কোথাকার। অপর পক্ষও ততক্ষণে তৈরি। গঙ্গাজলের প্যাঁচ খোলার সঙ্গে সঙ্গে তারাও মুখ খুলে রেখেছে। না খুলে উপায় নেই। কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার জমাদার সংখ্যায় কমেছে এ-সব অঞ্চলে, তার বদলে দ্বিগুণ কাজ চেপেছে তাদের ঘাড়ে, রাস্তা সাফা করতে সেরেফ জল মারো—অথচ তলবে সেই যে কে সেই, দু পাঁচটাকা 'বাড়তি তলব'—কি হয় তাতে! তিলমাত্র গ্রাহ্যতেও আনেনা এরা—কার ফুটপাথের সংসার ভাঙল কি ভাসল, কার সারা রাত্রি ধরে রাখা লাইনের শাল পাতাটা ভেসে গেল। গালাগালির জবাবে গালাগালি। অশ্লীলতম খেউড় পালা চলে কতক্ষণ। বেপরোয়া গায়ের জ্বালায় আর আক্রোশে জলের ফোয়ারাকে আরও জোর আর দূরে ছুঁড়ে মারতে মারতে এরা চিৎকার করে, ইয়ে তুমলোগকো পাখানা পেশাব কি জাগা হায়, শালে চুতিয়ে লোক?

তা ঠিক। কিন্তু লাভ কি হয় তাতে—গু মুত বমি, কুড়িয়ে আনা আবর্জনা আরও ছয় ছত্রাকার হয়ে গলিতে ছড়িয়ে যায়। কুকুর আর মাছি আর কাক; ঘিনঘিন করতে থাকে। ওরই মধ্যে কোন বাবু নাকে কাপড় চাপা দিয়ে বাজার করে ফেরে। দু' তিনটে ষাঁড় কি গরু গোবর ছড়াতে ছড়াতে চলে যায়।

হঠাৎ একটা উল্লাস যেন গলির মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। চালের কনট্রোলের দোকান খুলে গেছে। লাইনে যেটুকু বা মাছিগলা জায়গা ছিল—সঙ্গে সঙ্গে এঁটে গেল। ও-পাশে একটা কেরোসিনের কনট্রোল। ছেলে দাঁড়িয়েছে চালে, বুড়ো বাপ কেরোসিনে; কিংবা স্বামী চালে, বউ কেরোসিনে। এরই মধ্যে পাড়ার সিভিকগার্ড বাবুরা প্যান্টে বোতাম আঁটতে আঁটতে হাতের লাঠি দিয়ে ঠেলা মারতে শুরু করেছে। জোয়ান মেয়ে দেখলে—লাইন দুরস্ত করার নামে—একটু ধরে ছুঁয়ে সুখ করে নিচ্ছে। চোখে লাগলে চোখ মেরে দিল। যার ভাবার্থ—একটু রয়ে সয়ে যা—দেবোখন খানিকটা। এই ভিড়ের আড়ালে চিনির কনট্রোল কোথায় হারিয়ে গেছে।

এরই মধ্যে যদি একটা রিকশা কি গাড়ি ঢুকে পড়ল, তার মুণ্ডুপাত শুরু হল। রিকশাবালার বাপান্ত—যাত্রীকে শাপ শাপান্ত।

বিচিত্র এই কনট্রোলের লাইন। কোথায় শুরু কোথায় শেষ বোঝা যায় না। একটা অভুক্ত অজগর যেন পাকে পাকে পেঁচিয়ে এঁকে বেঁকে শ্রান্ত প্রায়-মৃত দেহটাকে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যতটুকু যায়, যতক্ষণ পারা যায়।

অদ্ভুত এই মানুষ-মিছিল। জাত নেই, ধর্ম নেই, ছোট বড়, মেয়ে পুরুষ, ছুঁড়ি বুড়ি, বস্তি আর ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দে সব এক। সবাই এখানে সমান। সতী লক্ষ্মী বউ—আর লম্বা চওড়া বিরাট মদ্দর মতন মোদো চেহারার ডাক সাইটে বেশ্যা—এখানে আগু পিছু হয়ে দাঁড়িয়ে, গায়ে গা সেঁটে। সবার চোখে একই জ্বালা, পেটে একই রকমের খিদে।

পুরুষদের লাইনেও কম কি, আট বছরের ছেলে মুঠোয় পয়সা চেপে থলি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, তার আগুতে আশি বছরের কোনো বুড়ো, তেমনি একই ভাবে দাঁড়িয়ে। হয়ত এর বুক পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে, ওর নয়। জোয়ান ছোঁড়া, কেরানীবাবু, বিড়িঅলা, রিকশাবালা যায় পাড়ার মুচিটা পর্যন্ত। এতদিন শুধু পায়ে বুরুশ করেছে, কালি মাখিয়ে চকচকে—আজ পায়ে পা দাবিয়ে নিচ্ছে, গায়ের পাশ থেকে উঁকি দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে চোখ চকচক করে উঠছে তার, নিষ্ঠুর ধারালো আভা।

আর একটানা হল্লা, চেঁচামেচি, ঝগড়া, চিৎকার, খেয়োখেয়ি, সিভিক গার্ডের গুঁতো—বাপ বাপান্ত গালাগাল। মুখ বুজে সহ্য কর। বাধা দিতে গিয়েছ কি—লাইন থেকে সরিয়ে দেবে—যে-লাইনের অধিকারটুকু অটুট রাখতে কম-সে-কম একটা গোটা রাত গেছে এই রাস্তায় না ঘুমিয়ে, দু' এক পশলা বৃষ্টির জল গায়ে শুষে নিয়ে এবং এই নরক আর আবর্জ্জনার গন্ধে অর্ধেক গা ঘিনিয়ে।

মেয়েদের লাইনে আরও ভয়াবহ অবস্থা। তিন নম্বর বাড়ির মধু দত্তর চৌদ্দ বছরের ফ্রক আঁটা মেয়েটার চুলের মুঠি চেপে ধরেছে ওই বাড়িরই হরিহরের পোয়াতি বউ। ন'মাসের ছেলে পড় পড় যন্ত্রণা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘোমটায় সারা মুখ ঢেকে সেই রাত-থাকতে-সকালে। মধুর মেয়ের পায়খানা পেয়েছিল, সামনে পিছনের লোককে সাক্ষী সাবুদ রেখে জায়গা ধার দিয়ে এক ছুটে পেট পরিষ্কার করে আসতে গিয়েছিল। ফিরে এসে ভুল করে হরির বউয়ের দু'-মানুষ আগে গিয়ে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের লাইনে যেন ছুঁচো বাজি ছেড়ে দিলে কেউ। মেয়েটাও জেদি, বোকা। ধাক্কাধাক্কি, গালি গালাজ কানে তুলছে না, তার ওপরে ছোট মুখে বড় কথা। কি বলে ফেলেছিল বেফসকা, রাগের মাথায়। আর যায় কোথায়, হরির বউ ওর চুলের মুঠি চেপে ধরল, ঢেমনি মাগী কোথাকার—পায়খানা পেয়েছিল ত হয়েছিল কি—পেট খসে যাচ্ছিল,—তোর বাপের কন্ট্রোলে যা।... মধুর মেয়ে হরির বউয়ের ঝগড়া থামতে না থামতে—মোক্ষদামণির সঙ্গে এক সিভিক গার্ড ছোঁড়ার লেগে গেল। মোক্ষদামণি ধুলো উড়িয়ে দিল মুখে।

আঁকা বাঁকা দু'টো লাইনই সমান গতিতে এগিয়ে চলেছে, মাথার ওপর থেকে ছাদ পাঁচিল দেওয়ালের গা গড়িয়ে রোদ ত ইক্ষণে গলির ওপর এসে পড়েছে। বাবুরা অফিসে যাচ্ছে—নাকে রুমাল চেপে, ছেলে মেয়ের দল স্কুলে কলেজে। বেশ বেলা হয়েছে। লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তরুলতা ভাবে, ঘরের পুরুষ মানুষটা আজও ভাত না খেয়ে কারখানায় গেল; কচি মেয়েটা মাদুরে পড়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করছে—ওর বাপ ওকে এক চিমটে চিনির সঙ্গে আধবাটি জল গুলে খাইয়ে দিয়েছে কোন সকালে—মেয়েটার পেট এতক্ষণে

শুকিয়ে গেছে। আহা! তরুলতার বুকে দুধ নেই—তবে মাই মুখে দিলে একটু থামত মেয়েটা। কতক্ষণে যে চাল পাবে তরুলতা, বাড়ি ফিরবে, কাঠকুটো দিয়ে উনুন জ্বালবে, শটি ফুটিয়ে মেয়েকে খাওয়াবে—কে জানে। বিভূতি মটরের কলকব্জা সারাইয়ের কারখানায় চাকরি করে। বেলা ন'টার মধ্যে তাকে হাজির হতে হয়। কে কনট্রোলের চাল ধরবে তরু ছাড়া?

এই লাইনেরই একপাশে হেঁটমুখে, শূন্য ক্লান্ত চোখে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি মেয়ে, যশোদা। এই পাড়ারই মেয়ে—বিধবা। বাড়িতে ভাই আছে—ভাইয়ের বউ আছে—বাচ্চা কাচ্চা গুটি দুই। ভাইটা চাকরি করে কোথায় যেন। সাত সকালে বেরিয়ে যায়। যশোদাকে এসে দাঁড়াতে হয় লাইনে। ভাইয়ের বউ ঝেঁটিয়ে বের করে দেয় সাত সকালে চাল ধরতে। যশোদা লাইনের মধ্যে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যশোদার মুখের ঢল নাকি পটের ঠাকুরের মতন—গরীবের মেয়ের মুখের ওই শ্রী দেখে বেশ পয়সাবালা বাড়ির ছেলে বউ করে নিয়ে গিয়েছিল। স্বামী যখন মারা গেল তখনও সে-বাড়িতে পয়সা ছিল—কিন্তু পবিত্রতা ছিল না; ঘরের নোংরামি আর কেলেংকারী যশোদাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছিল। যশোদা তাই চিরকালের মতন শ্বশুরবাড়ি ছাড়ল। সৎ পবিত্র হিন্দু বিধবার সব আচার মেনে সে জীবন কাটাবে। মুখের ঢল আর মনের তল কোথাও তার নোংরা খোলা কিছু জমতে দেবে না।...কিন্তু কি হল? বাবা মারা গেল, মা মারা গেল, বড় ভাই বিদেশে চাকরি করে, চরিত্র নষ্ট করে—ছোটর কাছে থাকে যশোদা। সে গরীব; কিন্তু অমানুষ নয়। ভাইয়ের বউটা ঠিক উলটো। যশোদা তার চক্ষুশূল। রাস্তার এই নোংরা অসভ্য ভিড় আর হাজার চোখের সামনে, অকথ্য অশ্রাব্য কথা আর ইতরতার মধ্যে যশোদাকে ঠেলে দিয়েছে। কনট্রোলের লাইন দেওয়া নয়, যশোদা ভাবে, সারা জীবন যা এড়িয়ে এসেছে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায়—এখন দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার মুখোমুখি চেয়ে থাকা। যশোদা মুখ নীচু করে ঘাড় গুঁজে মাথার ঘোমটায় যতটা সম্ভব মুখের ঢল ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকে—চোখের জলও যেন ফুরিয়ে এসেছে।

এমনিই ত সবাই—পুঁটি, বেন্না, হরির বউ, মোক্ষদামণি, বামুনদিদি,—তার সঙ্গে তরঙ্গ, আলতা, ছানুর মা, বিন্তি।

পুরুষদের লাইনটা লম্বায় শুধু বড় নয়—দুর্ভাগ্যের ইতিহাসে আরও দুঃসহ। ওখানে আছে বিধুভূষণ--নিখাদ কেরানী—সংসারে একা রোজগেরে লোক—পোষ্য স্যাকুল্যে ছ'জন। খোলাবাজারের চাল গম তার আয়ত্তের বাইরে, কনট্রোলে এসে না দাঁড়িয়ে উপায় নেই। অফিসের বেলা কাছাকাছি এসে গেলে নিজে সরে গিয়ে সত্তর বছরের বাপকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়। বিধুর পেছনে কৃষ্ণকমল—পুরুতের ছেলে। যজমানী করে বাপ আর চাল পায় না—তার বদলে মূল্য; ফলে কৃষ্ণকমলকে কনট্রোলে লাইন মারতে হয় রোজ। ওরই গায়ে গা এঁটে ফটিক। স্কুলের পড়ুয়া—তার বাড়িতে বাড়তি লোক নেই, বাবা মা আর ফটিক। বাবার পায়ে গেঁটো বাত, দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—ফটিককে তাই স্কুলের পাট তুলে সকালে লাইন দিতে হয়। এই রকমই সব—স্কুলের মাষ্টার, কলেজের অধ্যাপক, ছুটকো দোকানের কর্মচারী, খবরের কাগজে চাকরি করা সাংবাদিক, তারই গা ঘেঁষে রামভরত, ধনিয়া, ইসমাইল, রঘুয়া। সবাই আজ সব্যসাচী। দু' হাতে দশ কাজকে সামলে যাচ্ছে, চাকরি বাকরি থেকে চালের থলি, হাটবাজার থেকে ডাক্তার হাসপাতাল। সারাটা দিন ঘোড়ার মতন ছুটছে যেন—একটা থেকে একটাতে। কপালের ঘাম কপালে শুকোচ্ছে। চিমসে যাচ্ছে গাল, দুশ্চিন্তা আর অসহায়তার রেখা আরও কুটিল হয়ে ফুটছে, পিঠ বেঁকে নুইয়ে পড়ছে—মনে হয় অসংখ্য ক্রীতদাসের একটা প্রবাহ পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে অদৃশ্য কোনো অন্তিমের কাছে।

এদিকে লাইন, ওদিকে মজুমদারের বাড়ির সামনে খোলা জমিটুকুর মধ্যে ইঁট আর কাদা গেঁথে বড় বড় দুই উনুন পেতে ফেলেছে পাড়ার কজন ছোকরা, ভবানী বাদলের দল। ওরা অনাথ খাওয়াবে। মুখে বলে ভিখিরি। ভিখিরি কথাটার মধ্যে হেলাফেলার ভাব আছে—তা বলে মনের মধ্যে অতটা হেলা-ফেলা নেই। বরং কলকাতার রাস্তায় অলিতে গলিতে এই হতভাগ্য আগন্তুকের জন্যে করুণা আছে ওদের। কিন্তু সাধ্য কতটুকু বেচারীদের।

এর আগে একদফা অনাথ ভোজন করিয়েছে—মাসখানেক আগে। এবার দ্বিতীয় দফা। গতবারে চাঁদটাঁদা যোগাড় করে—পাড়ার মুরুব্বী কাউন্সিলার ধরে তবু কিছু সস্তায় চাল ডাল পেয়েছিল বলে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়াতে পেরেছিল। এবারে না চাঁদা না সুপারিশ। চাঁদা দিতেও মানুষ আর চায় না। কত পারে মানুষ। দশটা পনেরোটা ফাণ্ড'খোলা হয়েছে এর তার নামে, সবাই দাও দাও করছে; তার ওপর রাস্তা ঘাট অফিস সর্বত্রই চাঁদার বই হাতে মানুষ ঘুরছে। তারা লেকচার দেয়: আপনার মা বোন ভাই পথের ধুলোয় অনাহারে শুকিয়ে মরছে—সমস্ত জাতকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান—আপনি বাঙ্গালী। বেশ বলে লোকগুলো। চাঁদাও কিছু পায়—দু-চার আনা থেকে আধুলি টাকাটাও। এর ওপর পাড়ায় যদি অনাথ সেবার জন্যে মাসে মাসে দু' এক টাকা গচ্চা দিতে হয়—পারে মানুষ! আমাদেরই বাড়ন্ত, ত অনাথ। তাছাড়া বললে খারাপ শোনাবে, এই ভিখিরির দল খাওয়ানোর মানে—পাড়ার মধ্যে একটা নরক কাণ্ড করা। কি আশ্চর্য, বাতাসের গন্ধে যেন ওরা সব বুঝতে পারে। বুঝতে পারে ওই পাড়ার—অমুক জায়গায় খাওয়ানো হচ্ছে। আশ পাশ থেকে ঝেঁটিয়ে আসতে শুরু করে সব। উনুনের ধোঁয়া উঠল কি দেখ দু' চার জন করে হাজির হতে আরম্ভ করল। ফাটা কলাইয়ের থালা হাতে, কিংবা কানা-উঁচা টিনের পাত্র, সরা মালশে, মগ, ভাঙা হাঁড়ি। পুরুষ মেয়ে বাচ্চা কাচ্চা সেই যে এসে রান্নার কাছাকাছি জায়গায় আঁট হয়ে বসল, আর নড়ার নাম করে না। দেখাদেখি গন্ধে গন্ধে আরও এসে জুটতে শুরু করে। রান্নার উনুনে হাঁড়ি চাপার আগেই সরু গলিতে হাঁটা চলার পথটুকু বন্ধ। বেলা বাড়লে ত কথাই নাই। গলির রাস্তা পঙ্গপালের মতন কালো আদুল গা বুক পাঁজরা খটখটে কঙ্কালের দলে ছেয়ে গেছে। চেঁচামেচির সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি, চুলোচুলি; গালিগালাজ—খাবলাখাবলি। আর পরিবেশনের পালা শুরু হলে রক্ষে নেই। শকুনির ঝাঁক যেন ছোঁ মেরে গিয়ে পড়ে। ছেলের দলও কাণ্ডজ্ঞান হারায়। এলো পাথাড়ি হাত চালায়, ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় কাউকে—কারুর গায়ে বা জল ঢেলে দেয়। হৈ হট্টগোল সামলাতে অনেকটা সময় কেটে যায়—অন্ন

কাঙালের দল গলির দু-পাশে সারি দিয়ে বসে পড়ে ভাঙা ফুটো থালা মগ সরা পাতা সামনে নিয়ে। চল্লিশ বছরের জোয়ানের পাশে চার বছরের ছোঁড়া, করিমুদ্দিনের পাশে গঙ্গা। নয়নের বুকে বাদুড়-ঝোলা মাইচোষা একটা পুচকে—দু-পাশে আরও দুটো। তাদেরও পুরো দিতে হবে। নয়ন আদায় করে নেবে। আর খায় যেন শতজন্ম উপোসী; রাক্ষসের মতন, লোভীর মতন; পাতার শেষ কণাটি পর্যন্ত কুকুরের মতন চেটে চেটে পরিষ্কার করে ফেলে।

দাতব্য অন্নসত্রের হাঁড়ির তলায় পোড়া-ধোড়া তলানি ছাড়া কিছু নেই, কাঙালীর দল তবু গলি ভরে আঁট হয়ে বসে আছে। ওদের তাড়াতে আবার আর এক দফা চেঁচামেচি, হট্টগোল, গালিগালাজ। কিছু চলে যায়, কিছু আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সন্দেহের চোখে বাবুদের দেখে। তারপর অবস্থা দেখ গলিটার—শালপাতা উড়ছে, কারও ভাঙা মালশের টুকরো, পাতলা খিচুড়ির দাগ পিচের ওপর, কুকুরের দল ঢুকে খেয়োখেয়ি, উচ্ছিষ্ট আবর্জনা সারা গলিতে চড়িয়ে গেছে, কাকের দল ঠুকরে ঠুকরে আরও জঞ্জাল করে ফেলেছে।

পাড়ার মানুষ-জন বিরক্ত, অসহিষ্ণু। এই জঞ্জাল নোংরামির মধ্যে এখন তুমি বসে থাক ঘুমোও। কাল কখন একটা জমাদার পেয়ে তবে সব পরিষ্কার হবে। হারামজাদার দল খাবার বেলা খাবে—যাবার বেলা হাজারবার করে বলে দিলেও পাতাটুকু কুড়িয়ে নিয়ে যাবে না।

কাঙালী খাওয়ানোর জন্যে ভবানী বাদলের দল এবার তাই না পেয়েছে চাঁদা, না সস্তাদরে চাল ডাল। তবু যুবজনের উৎসাহ কম নয়। লঙরখানার কায়দায় তারাও মণ্ড বানাচ্ছে। যত রাজ্যের শাক পাতা, কুমড়োর খোসা, বাড়ি বাড়ি থেকে যোগাড় করা ফেন, খানিকটা নুন, তার মধ্যে সের কয় চাল ছেড়ে দিয়েছে। হাঁড়িতে সেই অপূর্ব সঞ্জীবনী ফুটছে, অদ্ভুত তার গন্ধ, অবাক চেহারা। সবুজ জলগোলা চটচটে একরকমের ভোজ্য বস্তু তৈরি হয়ে উঠেছে। এই সঞ্জীবনীও যত খুশি বিলোবার মতন সামর্থ্য তাদের নেই। জনপ্রতি তিনহাতা, বাচ্চাদের একহাতা।

গলিতে এই সদর ট্রামরাস্তায় আরও বুঝি বীভৎসতা ছড়ানো। কোথায় যাবে তুমি—উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম—যে-রাস্তায় খুশি পা বাড়াও—ফুটপাথের ছুপাশ ঘেঁষে এই হাভাতা হাঘরেদের থৈ থৈ ভিড়। বাজারের সামনে ময়লা ফেলা ডাস্টবীনগুলো ভরে রাস্তায় উপচে পড়ছে আবর্জনা। সেই আবর্জনা খুঁটছে মদ্দমাগি কচি-কাচা সবাই মিলে। যা পায় তাই। পচা গলা, খাদ্য অখাদ্যের বাদ বিচার নেই। সবচেয়ে কুৎসিত ওই মাছের বাজারের ফটকের দিকটা। মস্ত বড় এক কাছিমের পিঠের খোলটুকু পেয়ে গেছে কোন ভাগ্যে ওরা দুজনে—একটি পুরুষ আর একটি মেয়ে। হয়ত বাপ মেয়ে—বোঝবার উপায় নেই। কাছিমের পিঠের খোল চেঁচে চেঁচে খাচ্ছে—এ পাশের রাস্তায় বসে। এতটুকু বিস্বাদ নেই মুখের ভাবে। মাছের আঁশ নাড়িভুঁড়ি তেল কুড়োচ্ছে খুঁটে খুঁটে আর ক'জন। ওদিকে মিষ্টির দোকানগুলোর পাশে খদ্দেরদের পিছু পিছু হাত-পাতার দল। চায়ের দোকানের সামনে সারাক্ষণ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে ছোকরা ছুকরি, কাঁকালে কচি ঝুলোনো মেয়ের দল। সাধ্য কি—রাস্তার সামনে বসে চা-টুকু খাবে। করুণ কান্নার ঢঙে ওদের গলা রেকর্ডের মতন বেজে চলেছে—এক সুর, এক কথা। প্লেট থেকে একটা টোস্ট ছুঁড়ে দিলে রাস্তায় শকুনির মতন অমন পাঁচটা ছেলে মেয়ে মদ্দ ছোঁ দিয়ে পড়ে।

রাস্তার দু-পাশ ভরে এই যাযাবর ভিক্ষুকের বিচিত্র উপনিবেশ। কোথাও কাঠ জ্বালিয়ে হাঁড়িতে খুদ ফুটোচ্ছে কেউ, কোথাও কলেরা হওয়া মানুষটা খাবি খেয়ে খেয়ে মরে পড়ে আছে, মাংসের দোকান থেকে কুকুরের সঙ্গে লড়ে খানিকটা ছাল চর্বি হাড় এনে সেঁকছে কেউ বা ছেঁড়া কাগজ সরু সরু কাঠির আগুনে। আরও আছে; আছে হরিমতীর দল—হারাণ-নারাণের দল। গণি, করিমুদ্দীনের সঙ্গে রাবেয়া জোবেদা। ফুটপাথের কিনারা ঘেঁষে বসে আছে। আজ ওরা যাবে। আসুক সেই ভিখিরি ধরা গাড়ি, আজ আর কেউ ছুটে পালাবে না। হারামজাদাদের গাড়িতে গিয়ে বসবে। শুনেছে, ওরা নাকি গঙ্গার জলে ফেলে দিচ্ছে না—কোথায় যেন ছেড়ে দিয়ে আসছে, সেখানে দুমুঠো পাওয়া যায়। তাই যাবে এরা। কপালে মরণ যদি লেখাই আছে তবে একবার ক্ষতি কি দেখতে।

সোনা কেওট ভিখিরিদের মধ্যে মান্তি লোক। সোনা জাল জুয়োচুরি শিখে পেটটা ভরিয়ে রেখেছে কোনো মতে। সোনার দলে সাত আটটা মেয়ে জনা চারেক বুড়ো-খুড়ো। ওরা একসঙ্গে গায়ে গা এঁটে থাকে নানা জাত নানা জায়গার মানুষ। এখন পাশাপাশি থাকতে থাকতে একটা দল গড়ে নিয়েছে। সোনার গায়ে খোস পাঁচড়া ; মঙ্গলা দল ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেল। মাথায় উকুন আছে—থাক, তাতে অন্ধ গলিতে অল্প একটু এর তার সঙ্গে থেকে দুপয়সা রোজগারে আটকায় না, খোস পাঁচড়া হলে আর ছোঁবে না কেউ। যাবার আগে ফুল্লরাকে চুপি চুপি বলে গেল, ওই ড্যাকরার পাশে আর শুস না লো, ঘা ধরলে সেই করুণাবাবু কিন্তুক নিযে যাবে না।

করুণাবাবুরাও এখানে টোপ ফেলেছে। এই মহোৎসবে তাদের প্রসাদ কেউ কেউ পায়। মেয়েছেলে হলে। একটু যদি হাড় ঢাকা চেহারা হয়, বয়সে কচি বা ছুঁড়ি, করুণাবাবুর দল বাজে পাঁট-পচা-মাল সরিয়ে ঠিক চিনে নেবে। তারপর দু'চার দিন ঘুর ঘুর করবে—মনোহারী কথায ভুলিযে ভালিয়ে ঠিক তুলে নিয়ে যাবে রাস্তা থেকে! তারপর বেশ্যাপাড়া—কলকাতার ত বটেই, আশেপাশের নানা জায়গায়—মিলিটারী ছাউনির কাছাকাছি কোথাও কোনো খুপরি ঘরে।

পঙ্গপালের মতন ছিটকে আসা এই অনাথ অভাগা কাঙালের ভিড়ে জীবনের দু'টি মহৎ কর্ম চমৎকার ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। মৃত্যু যেমন পাওনা তুলে নিচ্ছে, তেমনি জীবন আসছে। ফুটপাতের কোল ঘেঁষে প্রসব ব্যথাতুর জননী। কাটা পাঁঠার মতন ছটফট করছে—পরনের কানি রক্তে ভেসে যাচ্ছে—আবর্জনার মধ্যে একটি মাংসের পুঁটলি আলোর তাপ পেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। মরছে, মরছেও না। কী আশ্চর্য পরমায়ু নিয়ে এসেছে এই নবজাতকের দল। সহস্র চক্ষুর ইতর কৌতূহলের মধ্যে জননী জঠর থেকে দ্বিধাহীন ছাড়পত্র নিয়ে এসে পড়ছে।

আবও দেখ, শশীর হাঁটু আর কোমর ঢাকা শরীরটা পাঁচির বুকে টলে পড়ে আছে, পাঁচি উকুন বেছে দিচ্ছে রুক্ষ জটের জঞ্জাল থেকে। শশীর চোখে একটু আলস্যের তন্দ্রা। ওদিকে বিশু কার যেন একটা বাচ্চাকে কুড়িয়ে-আনা-

বেগুনি খাওয়াচ্ছে হেসে হেসে। ময়না অনেক কাকুতি মিনতি করে আধ মগ ফেন চেয়ে এনেছে, আস্তাকুঁড়ে রেখে যাওয়া ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে। অ্যাই—খা দিকিনি বেড়ালের ছাঁ—সারা রাত ভরে কেঁউ কেঁউ করেছিস—খা এবার।···ছেলে আর খাচ্ছে না। চোখও খুলছে না। রোদের তাতে তাতে গাটুকু তখনও গরম বলে ময়না বুঝতে পারছে না বেড়ালের ছাঁ মরে গেছে কখন।

এই ত কলকাতা। আজকের। ট্রাম চলছে, বাস ছুটছে। রেস্টুরেণ্টে মাটন কাটলেট আর ব্রেন চপ তৈরি হচ্ছে, দুধের লরি ছুটে যাচ্ছে, চালের বস্তা আসছে গ্রেনশপে, শৌখিন বাবুরা সাবান স্নো কিনে রাখছে পাইকিরি দরে, সিনেমার দরজায় অসম্ভব ভিড়, থিয়েটারে নতুন বইয়ের পোস্টার পড়ছে। চৌরঙ্গির ধারে শোভা আর শোভনতার কী ম্যাজিক খেলাই চলছে। আমেরিকান ছোঁড়াগুলো ফটো তুলছে দিনরাত,·নিগ্রোগুলো জুতো পালিশ করিয়ে পয়সা আর চকোলেট বিলোচ্ছে, শিস মারছে দিশী মেয়ের দিকে তাকিয়ে। বৃটিশগুলো তাজ্জবের চেয়ে তাজ্জব। পাবলিক স্কুলের মাস্টার এডওয়ার্ড, খামারের মজুর বিল। এডওয়ার্ড বিলকে শুধোচ্ছে, হ্যাভ ইউ লুক্‌ড্‌ অ্যাট হ্যাট বিল, হ্যাট মেমোরিয়াল? হ্যাভন্‌ট্‌ ইয়েট? দে হ্যাভ মেড্‌ ইট ব্ল্যাক। আওয়ার ভিক্টোরিয়া ওআজ মাচ হোয়াইট!—বিল বুঝতে পারে না, এডওয়ার্ডের কথার রহস্য রহস্যই থেকে যায় তার কাছে। অল্প একটু মাথা নেড়ে বিল বলে, ইট্‌ ইজ সো হট্‌ হিয়ার এড্‌—আই মাস্ট মুভ্‌ সাম্‌ হোয়ার এল্‌স্‌।

বিল গরমে ঘামছিল। ঠিক গরমে নয়—সামনের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে দোতলা বাসের তলায় যে ভিখিরিটা চাপা পড়ল সেই ভিড়ের দিকে তাকিয়ে।

আমেরিকানগুলো ক'টা কলা আর বিস্কুট ছুঁড়ে দিয়েছিল চলন্ত ট্রাক থেকে। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আশ পাশ থেকে একদল ভিখিরি ছুটে যাচ্ছিল ছোঁ মারতে। দোতলা বাস আসছিল দক্ষিণ থেকে। নজর করে নি হয়ত। আচমকা হর্ন ব্রেক আর পথচলতি মানুষদের চিৎকারে জায়গাটা

কেমন চমকে উঠল। ছুটন্ত ভিক্ষুকের দল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাসটা পাশ কাটাবার চেষ্টা করল প্রাণপণ। পারল না; টাল খেতে খেতে সোজা হয়ে গেল—আর ততক্ষণে রোগা লিকলিকে একটা বেপরোয়া মেয়ে চিলের মতন ছোঁ দিয়ে পড়েছে। হরির লুঠের বাতাসার মতন ছড়ানো একটা কি দুটো কলা আর বিস্কুটের টুকরোর ওপর। দু-হাত দিয়ে বুকের কাছে যেন আঁকড়ে ধরছিল সব—। পলকের জন্য সারা রাস্তার চোখ ওই মূর্তি আর ভঙ্গির দিকে ভীতার্তের মতন তাকিয়ে থাকল। দোতলা বাসের সামনের চাকাটায়—আড়াল পড়ে গেল সব। চারপাশ থেকে আর একবার বিহ্বল একটা চিৎকার। অন্য ভিখিরিগুলো পলকে ছুট দিল। উধাও সব।

দৃশ্যটা দেখেছিল নিখিল। স্পষ্ট করে নয়—খানিকটা দেখার পর চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। ভিড় আর চিৎকার থেকে বাকিটা অনুমান করতে সময় লাগল না। রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল, ঝাপসা লাগছিল সব, শরীরটা অবশ আর বুক ধক্ ধক্ করছিল। মৃণালের হাত চেপে ধরল খপ্ করে।

বন্ধুর মুখচোখের দিকে তাকিয়ে মৃণাল আর কথা বলল না। হাত ধরে চৌরঙ্গির রাস্তা ছেড়ে মেট্রোর গলির পাশে ঢুকে পড়ল। খানিক এগিয়ে চায়ের দোকান। দোকানে টেনে এনে বসাল নিখিলকে। বলল, 'জল খাও।'

জলের গ্লাস একচুমুকে নিঃশেষ করল নিখিল। আর এক গ্লাস। বাইরে গিয়ে চোখে মুখে খানিক জল ছিটিয়ে নিল। ধুতির কোঁচা দিয়ে মুছতে যাচ্ছিল, বারণ করলে মৃণাল। মুছো না, জলটা থাক—আরাম লাগবে।

ফ্যানটা খুলিয়ে নিয়েছে আগেই মৃণাল। নিখিল মাথা ধরে বসে থাকল খানিকক্ষণ; একেবারে চুপ, শুকনো মুখ, চোখের দৃষ্টিতে তখনও বিহ্বলতা।

'চা খাবে—!' মৃণাল শুধোল, 'না হয় গরম এক কাপ কিছু খাও—নার্ভাসনেস কেটে যাবে।'

জবাব দিল না নিখিল; এমন ভাবে সামান্য মাথা হেলাল—যার অর্থ, বেশ—আনতে বল।

চা নয়—নিখিলের জন্যে এক কাপ কোকো আনতে বলল মৃণাল, ওভালটিন পেল না। নিজের জন্য চা।…তারপর সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া গিলে খানিকটা সময় নিখিলের দিকে তাকিয়ে থাকল। শেষে বলল, 'তুমি ভীষণ নার্ভাস!'

নিখিল এবার মুখটা মুছে নিল। তার হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে।

চা আর কোকো না আসা পর্যন্ত মৃণাল আর কিছু বলল না। নিজের মনে সিগারেটে টান দিতে লাগল।

পানীয় আসার পর প্রসঙ্গটা আবার টানল মৃণাল। 'এত নার্ভাস হয়ে পড়লে কেন? আফটার অল্ ওটা অ্যাকসিডেণ্ট। এমনিতে রোজই তুমি রাস্তায় মানুষ মর্‌তে দেখছ।'

'না।' মাথা নাড়ল নিখিল। কোকোর পেয়ালায় বার কয়েক ঘন ঘন চুমুক দিল।

'মানে? তুমি কি অন্ধ হয়ে রাস্তায় হাঁটো?' মৃণাল কটাক্ষ করে বলল।

'আমি পারি না, তাকাতে পারি না। রাস্তায় কেউ শুয়ে রয়েছে দেখলে ভয়ে চোখ ফিরিয়ে নি।' নিখিলের গলার স্বরে একটা কষ্ট পাওয়ার সুর ছিল।

মৃণাল চায়ে চুমুক দিয়ে—এই নরম নিরীহ মেজাজের বন্ধুটির দিকে অল্প একটু চেয়ে থাকল। নিখিলের সঙ্গে একটা বছর ঘনিষ্ঠভাবে মিশে বন্ধুর ধাত সে অনেকটা বুঝেছে। কথাটার আক্ষরিক অর্থ ধরল না মৃণাল; তবে বুঝল—নিখিল শোচনীয় দৃশ্যগুলোকে সব সময় চোখ থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। স্বাভাবিক দুর্বলতা মানুষের।

'চোখে না হয় না দেখলে—কিন্তু মন থেকে ত তুমি এই সাজ্ঘাতিক অবস্থাকে সরাতে পারছ না নিখিল।'

'কোথায় আর পারছি। খবরের কাগজে দেখছি না রোজ—।' নিখিল মুখ তুলে মৃণালের দিকে তাকাল, ওর মুখে কেমন যেন অসুস্থতার ভাব, বিরক্তি এবং বিতৃষ্ণারও ছাপ আছে। বলল, 'মরা ফরা এমনিতেই আমার ভাল লাগে না। আর রাস্তা ঘাটে যে সমস্ত জিনিস চোখে পড়ে—তাকিয়ে দেখা যায় না। ঘোস্ট্‌লি। আমি পারি না দেখতে।'

'কেউই পারে না—' মৃণাল সিগারেটে শেষ টান দিয়ে অ্যাশ্‌ট্রের মধ্যে গুঁজে দিল, 'প্রথম প্রথম কেউই পারত না ; এখন মানুষের চোখে সব সয়ে গেছে। এখন বড় আর কার কাউকে মুভড্‌ হতে দেখবে না। রিয়ালিটি এমনই জিনিস।'

নিখিল জবাব দিল না, ঘাড় নুইয়ে পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল।

'একটা সরকারী হিসেব বেরিয়েছে কাগজে, দেখছ?' মৃণাল শুধোল।

'কিসের?'

'কলকাতার রাস্তা আর হাসপাতালে যারা স্টারভেশানে মরছে?'

'দেখেছি ; হাজার চারেক লোক।'

'সরকারী হিসেবে তাই—ষোলই আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে—মানে ধরো দু-মাসে। বারো হাজারের মতন হাসপাতালে রয়েছে।' মৃণাল কাঁধ সোজা করে চেয়ারে পিঠ লাগিয়ে বসল। বলল আবার, 'কর্পোরেশানের হেলথ্‌ অফিসারের স্টেটমেণ্ট দেখেছ নিশ্চয়—তাতে বলেছে সাত হাজার ন'শো কত যেন—মানে আট হাজার। দু' তরফের হিসেবে সময়ের আগু পিছু মাত্র দিন পনেরোর। সরকারী হিসেবটা এর পরও কি আমরা বিশ্বাস করব?'

নিখিল মাথা নাড়ল। না, বিশ্বাস করবে না কেউ।

'কলকাতা শহরে যদি এত—তবে সারা বাংলায় কত? আন্দাজ করতে পার নিখিল? সে-অঙ্ক তোমার মাথায় ঢুকবে না। লাখ টাখের হিসেবে গিয়ে দাঁড়াবে।' মৃণাল আবার একটা সিগারেট ধরাল, 'বাইরে যেখানে চালের মণ সত্তর আশি একশো টাকায় উঠেছে, যেমন ধরো মুন্সীগঞ্জে—সেখানে বেঁচে থাকার মতন লোক আছে—এ আমি বিশ্বাস করি না।'

উত্তেজনা জিনিসটা মাদকতার মতন। অল্পতে নেশা যায় না, একটু একটু করে মাত্রা বেশি হলে নেশাটা চেপে ধরে। তখন আরও চায়। নিখিলের ভয় বিতৃষ্ণা অসহিষ্ণুতার মধ্যে উত্তেজনাও যে খানিকটা ছিল—নিখিল বুঝতে পারে নি। কথায় কথায় ক্রমশই তার টানে এসে পড়ছিল।

'আমরা কি করে বেঁচে আছি—মাঝে মাঝে তাই ভাবি, মৃণাল।' নিখিল বলল হঠাৎ। হাত বাড়িয়ে মৃণালের সিগারেট প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট

বের করে নিল। অনভ্যস্ত হলেও—আজকাল মাঝে মধ্যে এক আধটা সিগারেট খায় ও। সিগারেট ধরিয়ে খুব আস্তে করে টান দিল। বলল, 'আমরা মানুষ না পশু, নাকি সেই বুনো হেড্ হাণ্টারস—আমরা কি—আমি ত বুঝতেই পারি না।'

'চোখ ফিরিয়ে নিলে কি করে বুঝবে তুমি!' মৃণাল জবাব দিল 'অন্ধ হয়ে থাকলে কিছু দেখা যায় না; চেনা যায় না। তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে পশুর রাজত্ব কোনখানে!'

নিখিল চুপ করে সিগারেট টানতে লাগল।

'বাংলার জন্মে পাঞ্জাবের গম কেনা হল দু' কোটি সাড়ে আঠারো হাজার ন,—বাংলা দেশে এল তার মধ্যে মাত্র বাষট্টি হাজার টন। বাকিটা সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট কোথায় ধরে রাখল, কেন ধরে রাখল? আচ্ছা—তারপরও প্রফিটিয়ারিং বিজনেস দেখ বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের—সাড়ে বারো টাকা মণের গম পনেরো টাকা মণে মিলকে বিক্রি করে। ভাঙাই হয়ে সেই আটা উনিশ টাকা মণে কিনে বাজারে কুড়ি টাকা মণে বিক্রি করার কথা। অথচ বাজারে আটা বিক্রি হয় তিরিশ টাকা দরে।' মৃণাল থামল একটু, হিসেবটা নিখিলকে বোঝবার সময় দিল। বলল, 'সাড়ে বারো টাকা মণের গম তিরিশ টাকায় বিক্রি। ঠিক আড়াইগুণ লাভ। এ-লাভ কারা করছে, গভর্নমেণ্ট আর তার পেয়ারের লোকরা, যাদের মিল আছে, আটা কিনে চেপে রেখে বাজারে ছাড়ার মতন টাকা আছে। হোর্ডারস, প্রফিটিয়ারস, ফেবারড্ ক্লাস অভ গভর্নমেণ্ট। এরা কারা?'

'টাকা ওআলারা—আর কারা!' নিখিল সিগারেট নিভিয়ে ফেলল।

'ডেফিনেটলি, ম্যান অফ মানি, মিলস অ্যাণ্ড মর‍্যাল এম্পটিনেস...' মৃণাল অস্থির অধৈর্য ভাবে হাত নেড়ে বলছিল, বিশ্রী এক উত্তেজনায়, ঘৃণায়, 'শুধু গম নয় নিখিল—গম, চাল, কয়লা, কাপড়, তেল—এভরিথিং। সবের ব্যাপারেই এই এক জিনিস, এক নিয়ম। প্রসেসের মধ্যে এতটুকু হেরফের নেই। তুমি চালের হিসেব চাও—তাও আমি দিতে পারি।'

হঠাৎ খানিকটা নীরবতা। নিখিল কি ভাবছে, মৃণালও কি যেন বলার জন্যে অপেক্ষা করছে।

'কল্যাণদা সে দিন ঠিক কথাই বলেছিলেন। বাংলা দেশের লীগ গভর্নমেণ্ট এই যুদ্ধের সুযোগে কিছু মুসলমান ব্যবসায়ী তৈরি করে তুলছে—ইন্‌ডাস্ট্রির লাগাম তুলে দিচ্ছে হাতে···টাকা ধার দিয়ে, চাল-গমের নানারকম কনট্রাক্ট বিলিয়ে।'

'আর এই সরকারী সুযোগের পা ধরে চাকরি বাকরি সুখ সুবিধে পেয়ে একদল মুসলিম মিড্‌লক্লাস তৈরী হচ্ছে, যারা সব সময় পিপ্‌লস রেভলিউশানকে কমজোর করার চেষ্টা করবে।' মৃণাল দ্বিধাহীন গলায় বলল।

আবার একটু নীরবতা। নিখিল চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। মাথার চুল টানল, ক্লান্ত করুণ মুখে। বলল, 'আমি শেষ পর্যন্ত একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি মৃণাল। এ-সব কিছু নয়—এই ভুয়ো স্বাধীনতার নাম করে চেঁচান। সমাজের একটা ছোট অংশ তাদের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, কারখানা, মিল, ফাট্‌কা বাজার আর সরকারী সুনজরের আওতায় যতদিন আছে—ততদিন আমাদের অবস্থা এই-রকমই থাকবে। উনিশ বিশ অদলবদল হওয়া কিছু নয়।

'ব্যাপারটা তাই। দুর্ভিক্ষ হবে কেন? এত লোক মরবে কেন, তুমি ভেবে দেখ—? যদি মানুষ বাঁচানোর যন্ত্র হত এই সিস্টেম অফ গভর্ণমেণ্ট তবে চালের ব্ল্যাকমার্কেট হবার উপায় ছিল না। রাশিয়ায় ব্ল্যাকমার্কেট হয় না কেন? কোটিপতিরা কলকাতায় অন্ন বিলোচ্ছে! কেন? টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে বলে নয়, দয়ার সাগরও কেউ নয়, একমাত্র কারণ, হয় এই ফাঁকে চাল কেড়ে করে গুদোমে পুরছে, না হয় লক্ষ লক্ষ মণ চাল গম চিনির ব্ল্যাক মার্কেটিয়াররা আজ দয়ালু সমাজ সেবক সেজে চোখে ধুলো দিচ্ছে।

'আমি আগে বিশ্বাস করতাম ধনীরা গরীবদের ট্রাস্টি হতে পারে—তাদের সুখ দুঃখের ওপর নজর রাখতে পারে—এখন আর তা বিশ্বাস করি না। এই ব্ল্যাকমার্কেট, হোর্ডিং···আমার চোখ খুলে দিয়েছে।' নিখিল থেমে থেমে হতাশ বিষণ্ণ গলায় বলল।

অন্যমনস্ক চোখে খানিকক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল নিখিল। মেট্রো সিনেমায় লাইন লাগছে। ফুরফুরে ছোঁড়া আর বাবুরা জমছে। এদের কাছে দেশে দুর্ভিক্ষ নেই, ব্ল্যাকমার্কেট নেই, মুমূর্ষু নরনারী নেই। ক্লার্ক গেবল আর রবিনসন আর মিরনা লয়, সুসেন হেওআর্ড। কিংবা হয়ত সবই আছে, অন্নাভাব বস্ত্রাভাব কনট্রোল—সবই। তবু সিনেমায় দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। অসহ্য জীবনকে ভুলতে, ক্লান্তিকে চুবিয়ে নিতে, অথবা উড়তি পয়সাকে উড়িয়ে দিতে। কে জানে!

'চলো, উঠি।' নিখিল বলল।

'চলো।' মৃণালও উঠে দাঁড়াল। পয়সা আগেই চুকিয়ে রেখেছিল। প্যাকেটের শেষ সিগারেট ধরিয়ে নিল মৃণাল। যেতে যেতে বলল, 'তুমি তা হলে বাড়ি যাও, আমি স্টাডি ক্লাস থেকে ঘুরে যাই।'

রাস্তায় এসে দাঁড়াল দুজন। সিনেমার লাইনে বেশ ভিড় লেগেছে। ওরই মধ্যে কাকে যেন পিছন থেকে দেখে চমকে উঠল নিখিল। লাইনের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। মুখ দেখা গেল না। মনে হল সুধা, ট্রাউজার আর শার্ট পরা এক ভদ্রলোক পাশে। পাশাপাশি হেঁটে দুটি মূর্তি লাইনের আড়ালে পড়ল। সোজা চৌরঙ্গির দিকে চলে গেল যেন।

সতেরো

নিখিল ভুল দেখেছিল। সুধা নয় ; সুধার মতন অনেকটা আর কেউ হবে। হয়ত গড়নের কোনও রকম মিলের জন্যে, হয়ত হাঁটার ভঙ্গির সাদৃশ্যের জন্যে ; কিংবা হতে পারে শাড়ির জন্যে।

সুধা আজকাল হালকা-নীল আকাশী রঙের শাড়ি প্রায়ই পরে ; খুব আঁটোসাঁটো ভাবে। মাড়ে খস খস করে। মনে হয় যেন খুব পাতলা কাচের ভাঁজ পড়ে আছে। সুধাকে এই রঙটা ভাল মানায়। আর ভাল মানায় কমলা লাল শাড়িটায়। রেশম রেশম সেই জংলী ছিটের শাড়িটা সব চেয়ে সেরা ; ঘন সবুজ ব্লাউজের সঙ্গে, চমৎকার দেখায়। একটা ব্যাগও কিনেছে সুধা। স্ট্র্যাপ্ দেওয়া। কোমরের কাছে ঝুলতে থাকে। এবং জুতো। বেঁটে হিলের পা ঢাকা সাদা ধবধবে জুতো। আর চশমাও সোনালী ফ্রেমের।

রত্নময়ী মেয়ের পোশাক-আশাকের বদলটা আজ কিছুদিন ধরে দেখছেন। শুধু পোশাকের নয়, ব্যবহারেরও। অফিসের বেলা বয়ে যায়—তবু সুধার ঠিক মতন চুলের বিনুনি কিংবা খোঁপা বাঁধা না হলে ভাতের থালায় এসে বসবে না। মুখের ধবধবে ভাবটা ফোটাবার জন্যে এখন সুধার রীতিমত সময় লাগে। সুর্মাও যেন একটু ছুঁইয়ে দেওয়া চাই চোখের কোলে। হাতের দু'গাছা ফিনফিনে বালা আগেই গিয়েছিল, গলার হারও। সোনা বলতে বাড়িতে ছিল—আরতির এক ভরির হারটা, বাকসে তোলা। একদিন সেই হার চেয়ে নিয়ে গলায় পরল সুধা। আর খুলল না।

নতুন চাকরিটা পেয়ে সুধা প্রথমেই বলেছিল, 'মা, আমার দু' চারটে মোটামুটি ভাল শাড়ি জামা না করলে আর চলবে না। এ-অফিসের সবাই এত ফিটফাট থাকে, তাদের পাশে গিয়ে এ-ভাবে বসতে কাজ করতে আমার লজ্জা করে।'

রত্নময়ী বুঝেছিলেন। এই শহরের হালচাল যতটুকু দেখেছেন তাতে বুঝেছেন, টাকার সঙ্গে সাজসজ্জারও একটা সম্পর্ক আছে। ভাল জায়গায় চাকরি করতে হলে ভিখিরির বেশ চলে না। সব কিছুরই মানান সই বলে একটা কথা আছে। মেয়েটা এতদিন যেখানে চাকরি করে এসেছে—সেখানে সত্যিই ভিখিরির বেশে কাটিয়েছে। না একটা ভাল শাড়ি, জামা, জুতো। তখন ওর হাতের বালা আর হার দুই-ই ছিল—কত সাধ্য সাধনা করেছেন রত্নময়ী, আইবুড়ো মেয়ে—বাইরে বেরোস—পর ওইটুকু সোনা। সুধা কি পরত! ওই কালে ভদ্রে। সংসার সে-টুকু সোনা খেয়ে ফেলল। আজ যখন কিছু নেই, তখন আরতির গলার ওই সুতোর মতন হারটুকু দিয়েই চলছে।

খেয়ে না-খেয়ে প্রথম মাসেই ঝপ্ করে দুখানা শাড়ি কিনল সুধা। আজকের বাজারে যদিও সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা দামের নয়, তবু আঠারো বিশ টাকা গায়ে লাগল বইকি। তার সঙ্গে ব্লাউজের কাপড়। দর্জিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নিতে হল। রত্নময়ীর আবার এতটা পছন্দ হয় নি; এ যেন বড় বেশি। রয়ে সয়ে মাসে একখানা করে কিনলে কি ক্ষতি ছিল! আরও একটু কম দামের হলেই বা কোন অন্যায় হত! ভালো লাগে নি ব্যাপারটা—তবু মেয়েকে মুখ ফুটে কিছু বলেন নি।

পরের মাসে জুতো হল, চশমা হল এবং আরও একটা শাড়ি। এটার আরও দাম। রত্নময়ীর মনে পড়ে না, তিনি জীবনে কখনও এত দাম দিয়ে কোনো শাড়ি পরেছেন বলে। মেয়েকে কথাটা না বলে পারেন নি। 'এত দাম দিয়ে পোশাকি শাড়ি কিনলি পরবি কখন?' ...সুধা মার প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন বিরক্তি বুঝতে পেরেছিল। জবাবও দিল তেমনি বাঁকা বিশ্রী সুরে, 'যখন চিতায় উঠব তখন।' ...রত্নময়ী মেয়ের জবাব আর মুখের ভাব দেখে অত্যন্ত আহত হয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মনে মনে, আর কখনও—কখনও মেয়ের পোশাক আশাকের কথা মুখে আনবেন না।

অথচ যা ভাবা যায়, প্রতিজ্ঞাও করা যায় মনে মনে তাই কি সব সময় রাখতে পারে মানুষ! পারে না। সংসারে—যেখানে হাজার রকম মন

ঠোকাঠুকি, মান অভিমান নিয়ে দিন চলে, সেখানে আজকের রাগ বা মুখভার কাল মানুষ ভুলে যায়, মনে রাখে না।

আবার একদিন কি কথায় বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, 'এই আলোচালের ভাত—শুকিয়ে গেলে কড়কড়ে হয়ে যাবে খেতে পারবি না, ডাকছি কখন থেকে —করছিস কি?'

'এক মাথা চুল উঠল যে আঁচড়াতে গিয়ে—দেখ না। আবার করে মাথা পরিষ্কার করলাম।' সদ্য বাঁধা বিনুনিটি ঘাড়ের পাশ দিয়ে বুকের কাছে টেনে পিঁড়িতে বসল সুধা। চকচক করছিল বিনুনী; গন্ধ তেলের সুবাসও উঠছিল।

অল্প একটু নীল পাড়ের সাদা মোটা শাড়ি; স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ—সেই টুঁটো কাপড় পরেই খেতে বসেছে সুধা। এমনিতেই গোড়ালির এক বিঘত ওপর—বসলে আর পায়ের অর্ধেকটায় কাপড় থাকে না। তাই উবু হয়ে বসেছে। ব্লাউজটা অবশ্য পরে নিয়েছে অফিসে যাবার। খেয়ে দেয়ে এই শাড়ি ছেড়ে ভালটা পরে অফিস বেরিয়ে যাবে।

'চুলের অত আহার-বাহার করলে অমনিই হয়।'

'আহার-বাহারের কি দেখলে তুমি?' সুধা খেতে খেতে বলল, মুখ না তুলেই। আর খাচ্ছিল যেন কোনো রকমে ভাতের ডেলা কটা মুখে গলায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

রত্নময়ীর চোখে এই ঘোড়দৌড়ের মতন খাওয়াটা আরও বিশ্রী লাগল। এই অলুক্ষণে লক্ষ্মীছাড়ার মতন খাওয়া। কেন, চুলের মুখের ফ্যাশান করতে অত সময় না কাটিয়ে পাঁচ মিনিট আগে খেতে এলে কি হয়! রোজ রোজ বলছেন—তবু মেয়ের গ্রাহ্যই নেই।

'আহার-বাহার আর কি—নিজেই জানো তুমি। এই ত গেল বুধবারেই এক শিশি গন্ধ তেল আনলে; তলানিটুকু পড়ে আছে। কি হয় ওই সব ছাই ভস্ম গন্ধ তেল মেখে! অযথা পয়সা নষ্ট।'

এবার সুধা মুখ তুলল। রত্নময়ী সেই মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হলেন। খেয়ালই করতে পারেন নি, মুখ নামিয়ে রাখলেও সুধা প্রথম কথাতেই চটে উঠেছিল।

'মিথ্যে কথা বলো না, মা। গেল বুধবারে নয়, তার আগের বুধবারে। তেল এখনও যা আছে—আমি একা মাখলে চার পাঁচদিন চলে যাবে।' সুধার মুখে আঁচ ঝলসে উঠেছিল। চিবুক আর গাল হঠাৎ যেন বড় শক্ত দেখাচ্ছে। চোখ ঝক ঝক করছে। গলার স্বরটাও রুক্ষ। সুধার দাঁতগুলোও যেন ধারাল দেখাল। এঁটো হাত ঝপ করে জলের গ্লাসে ডুবিয়ে দিল সুধা। বলল, 'মিথ্যে মিথ্যে গালাগাল দিতে তোমার লজ্জা করা উচিত ছিল।'

রত্নময়ী কাঠ। বিস্ময়ে আঘাতে, শাসানিতে, মেয়ের কঠোরতায়। মিথ্যেবাদী—! সুধা তাঁকে মিথ্যেবাদী বলল। চোখ রাঙিয়ে সে-কথা বলছে। অনেক দিনের পুরনো রত্নময়ী হঠাৎ যেন এই ভাঙা হেরে-যাওয়া রত্নময়ীকে ফস্ করে জ্বালিয়ে দিল। মাথা আগুন হয়ে উঠল। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে অনেক বেশি কঠিন, অনেক ধারাল, রুক্ষ, তিক্ত হয়ে উঠল মায়ের মুখ। 'আমি মিথ্যেবাদী! তুমি আমায় দু-বেলা দুমুঠো গেলাচ্ছ বলে আমার মাথা কিনে নিয়েছ, সুধা।' মনে হল রত্নময়ী বুঝি এখুনি একটা কুরুক্ষেত্র করে বসবেন, তাঁর পায়ের তলায় বঁটিটা খোলা পড়ে আছে। আর যে-ভাবে নিজের পিঁড়ি সরালেন তাতে সুধা চমকে উঠল। ...... রত্নময়ীর হাত কাঁপছিল। বুক কাঁপছিল। গলার কাছটা থর থর করছিল। 'আমার মুখের একটা ভুল হয়েছে বলে আমি মিথ্যেবাদী হলাম। আর তুমি? কি করছ তুমি? কিসের চাকরি তোমার যে অত তেল সাবান পমেটম মেখে, বাহারি শাড়ি পরে যেতে হয়! তোমার রূপ দেখাবার জন্য যে চাকরি—আমি তাতে ঝেঁটা মারি।'

'মা!' সুধার গলা চিরে যেন ভীষণ ধারাল একটা শব্দ এসে রত্নময়ীকে বিঁধলো।

'মা-টা আমি বুঝি না। এই সাজগোজ, এই বেহায়াগিরি করবার জন্যে তুমি কি চাকরি পেয়েছ? কেমন চাকরি সেটা।' ......রত্নময়ীর হাত লেগে ঘটিটা পড়ল, জলে জায়গাটা একাকার হল। 'আমার লজ্জার কথা, না তোমার লজ্জার কথা—, বাড়িতে মা বোন ছেঁড়া ময়লা সেলাই করা কাপড় পরছে, তোমার বিশ ত্রিশ টাকার শাড়ি এল; আমরা কেউ মাথায় দেবার

তেল পাই না এক কৌটা—এমন দাম তেলের—আরতির মাথা ভরে জট প'ড়ে যাচ্ছে, মরা খুসকি—। আর তুমি—?' রত্নময়ী কথাটা শেষ করতে পারলেন না। বুকের কাছে এত কাঁপছিল, এত কষ্ট হচ্ছিল নিশ্বাস নিতে।

সুধা জলের গ্লাসটা ভাতের থালার ওপর ছিটকে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ল। তার পা কাঁপছে, মাথার মাঝখানে কোন শিরা যেন ফেটে যাবে। আক্রোশে গলা বসে গেছে। তবু শেষ কটা কথা বুকের মধ্যে থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল, 'ছি ছি—মা হয়ে নিজের পেটের মেয়েকে এই সব কথা বলছ! বেশ, বল। আমি মুখে রক্ত তুলে পয়সা আনি। সে-পয়সায় শাড়ি তেল আমার যা খুশি কিনবো—কারুর তাতে চোখ দেবার দরকার নেই।' সুধার চলে যেতে গিয়ে কপাটে মাথা ঠুকল। গ্রাহ্য করল না।

'তোমার পয়সার অন্ন আর যেন বেশিদিন আমায় মুখে তুলতে না হয়। মা মঙ্গলচণ্ডী করুন—তাড়াতাড়ি আমি মরি! আজই—।' রত্নময়ী চিৎকার করে বললেন। সুধা আঁচাতে আঁচাতে শুনল কথাটা।

মেয়ে ঘরে গিয়ে ঝর ঝর করে কাঁদল; মা রান্নাঘরে বসে চোখের জলে মুখ ভাসালেন।

আরতি নীচে থেকে মা-দিদির গলা পেয়ে ছুটে এসেছিল। রান্নাঘরে একবার মাকে, ও-ঘরে একবার দিদিকে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেল না; কিছুই বুঝল না। অনেকক্ষণ বোকার মতন দাঁড়িয়ে থেকে শেষে পাঁচিলের কাছে সরে গিয়ে নিজেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সেদিন সুধার অফিস যেতে বেশ দেরিই হল। কিন্তু কী আশ্চর্য, ভয়ংকর জেদে সুধা তার বেশবাস আরও প্রখর করে রোদের আভা গায়ে নিয়ে চলে গেল। কারও সঙ্গে একটা কথা বলল না। এমন কি যাবার সময় মাকে বলে যায় রোজ, আসি মা; আজ সেটুকু পর্যন্ত নয়।

রত্নময়ীও তেমনই জেদী। বেলা চড়ে গেল। স্নান না, খাওয়া না। আরতি একবার সাধ্য সাধনা করতে এসেছিল—ঠাস করে এক চড় মারলেন তার গালে। বাসু এল; আরতি তাকে ভাত বেড়ে দিল। বাড়িটা হঠাৎ

এমন ঠাণ্ডা মেরে গেল কেন—কিছুই বুঝতে পারল না। আরতি আড়ালে সাবধান করে দিলে দাদাকে। বাসু তাজ্জব। 'যা বাব্বা, হল-টা কি?' মাথা নাড়ল আরতি, সে জানে না। দিদির সঙ্গে ঝগড়া, আর কি। বাসু খেতে খেতে কি ভাবল, বলল, 'তোরা তিনজনে দিনরাত্রি এই কামড়া-কামড়ি করে মর। মেয়েছেলে একেই বলে। আমার কি, ঝামেলা বেশি দেখলে—একদিন কেটে পড়ব।'

সারাটা বেলা, দুপুর আর দুপুরের মধ্যে রত্নময়ীর মন একটু নরম হল না, রাগ পড়ল না। কখনও ঘরে, কখনও ঢাকা বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে কত কি যে ভাবলেন! মার এমন উদাস, বিষাদ, স্তব্ধ মূর্তি আগে আরতি আর কখনও দেখেছে বলে মনে হল না। তার কাছে মা অন্য মানুষের মতন লাগছিল। আরতির দেখা এবং বোঝার চোখ তখন এত স্পষ্ট নয়, তবু আজ মার চেহারা দেখে সেই সব দিনের কথা খুব ভাসা ভাসা ভাবে মনে হচ্ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর যেন এই রকম বোবা হয়েছিল মা, এমনই শক্ত। আর তখনও ঠিক এমন ভাবে মা বসে থাকত, এখানে ওখানে, চোখে জল জমে জমে টস টস করে গাল বেয়ে পড়ত, শুকিয়ে যেত।

আরতিকে কিছু বলতে হল না; নিজে নিজেই সব কাজ সারল সংসারের, সকালের হেঁশেল তুলল, রান্নাঘর ধুল; বাসনপত্র মেজে রাখল। কাপড় কেচে শুকোতে দিল। এক সময় উমার কাছে গিয়ে বসল নীচে। উমা অনেক আগেই জানতে পেরেছিল, ওপর তলায় কিছু একটা হয়েছে। অনুমানও করতে পেরেছিল। আরতি যখন নীচে বাসন মাজতে, কাপড় চোপড় কাচতে নামল—তখন কয়েকবার শুধিয়েছে তাকে, কি রে, মাসিমা চান করবে না? ভাত খাবে না?……আরতির ছোট্ট জবাব, মার শরীর খারাপ। ……দুপুরে উমার কাছে এসে সত্যি কথাটা বলতে হল আরতিকে, 'দিদির সঙ্গে রাগারাগি করে মা আজ মুখে কুটোটি কাটল না, উমাদি। পরশু একাদশী করে—কাল দুটি ভাত খেয়েছিল; আবার আজকে—।'

'ওমা, তা তুই কি করছিলি এতক্ষণ, মাসিমার রাগ ভাঙাতে পারলি না!'

'না।' মাথা নাড়ল আরতি, 'একবার জিজ্ঞেস করতে গিয়ে মার খেয়েছি।'

একটু ভেবে মা শুধোল, 'তোর দাদা?'

'খেয়ে দেয়ে তিনি ঘুমোচ্ছেন, ; আর-একটু পরে উঠে বেরিয়ে যাবে।'

উমা অল্পক্ষণ আর কথা বলল না। নীচে থেকে সুধাদি আর মাসিমার ঝগড়ার দু-চারটে কথা তার কানে গিয়েছিল সেই সকালেই। তারপর ওপর তলার হাবভাব দেখে মোটামুটি সে বুঝেছিল সবই। ইচ্ছে হয়েছিল ওপরে গিয়ে মাসিমার কাছে বসে, দুটো কথা বলে রাগটা ভাঙিয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু যেতে পা ওঠেনি। মা-মেয়ের মন কষাকষির মধ্যে তার যাওয়া হয়ত ভাল হবে না, মাসিমা হয়ত ভাববেন—তাঁদের সংসারের কথায় মাথা গলাতে এসেছে উমা। ব্যাপারটা সঙ্কোচের, অস্বস্তির—উমা তাই শেষ পর্যন্ত ওপরে যেতে পারল না। এমন কি, প্রায় রোজই দুপুরে মাসিমার কাছে গিয়ে বসে ; ওরা তিনজনে কত রকম গল্প করে, এটা সেটা বোনে—আজ তাও যেতে পা উঠল না।

'তুই এক কাজ কর, আরতি'—উমা ভেবে চিন্তে বলল, 'তুই গিয়ে মাসিমার জন্যে একটু সরবত কর গে যা। আমাদের তরকারির ঝুড়িতে পাতি লেবু আছে, নিগে যা।'

'অযথা ; মা খাবে না।' আরতি বিরস মুখে জবাব দিল।

'তুই করগে যা না—আমি যাচ্ছি। দেখি খায় কি না খায়।'

আরতি অগত্যা উঠল। চলে যাচ্ছে, উমা ডাকল আবার, 'এই শোন—তোর দাদাকে একবার পাঠিয়ে দে ত, দরকার আছে একটু।' শেষের কথাগুলো বলতে উমার সামান্য অস্বস্তি বোধ হল। কিন্তু এমন হেলা-ফেলা ভাবে বললে, যেন কোনো কাজটাজের দরকারে ডেকে পাঠাচ্ছে।

আরতি চলে গেল। উমা চুপ করে বসে থাকল একটা গল্পের বই হাতে করে। কাকার ঘর বাইরে থেকে খিল তোলা ; কাকা প্রেসে। এ-ঘরে জানলা দিয়ে প্রথম শীতের একটু রোদ ঘরে ঢুকেছে। দুপুরের আগে ঘরের মধ্যে রোদ আসতে পায় না, জানলা দিয়ে টপকে পালায়। এই যা এসেছে এও বা কতক্ষণ, আধঘণ্টাও থাকবে না। গলিটা শান্ত। ঝিমোনো ভাব। কুচো কাঠের হাঁক পেড়ে কাঠওয়ালী মেয়েটা দূরে চলে গেছে। কিছু কাক

আর চড়ুই ডাকছে। ডাকটা দুপুরের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশে গেছে; হঠাৎ আলাদা করে কানে পড়ে কখনো কখনো।

নিখিলের বিছানার ওপরই বসে ছিল উমা—হঠাৎ মনে হল—! না, দাদা নয়—দাদা কলেজে; বাসু এসে দাঁড়িয়েছে। উমা চোখ তুলে বাসুর মুখ একটু নজর করে দেখল। না, ঘুমোয়নি বাসু, চোখে মুখে কোথাও ঘুমের ভাব নেই। তবে চুলগুলো একটু এলোমেলো হয়ে রয়েছে।

'ডিউটি কখন?' উমা শুধোল, পা সোজা করে বসে।

'চারটে থেকে।' বাসু হাই তুলল।

'এত ঘুমিয়েও হাই উঠছে?' উমা একটু বিদ্রূপের সুরে বলল।

'ঘুমোইনি; শুয়েছিলাম।' বাসু দু'পা এগিয়ে এসে নিখিলের চেয়ারে একটা হাত রেখে সামান্য বেঁকে দাঁড়াল। 'পয়সা পকেটে থাকলে কি বাড়িতে শুয়ে শুয়ে রগড়াই। প্যারাডাইসে লীলা চিটনিসের একটা ফাস্ট কেলাস বই চলছে, দেখে আসতুম।·· একটা টাকা ধার হয়ে যাক্ না।' বাসু হাসল।

'তা বই কি! চার টাকা পাই।'

'ও, যেন লাখ চারেক—: কাবলীবালাও মাইরি এমন তাগাদা মারে না।'

'আবার মাইরি!' উমা ধমকে উঠল।

'মাইরিটা খারাপ কিসের—। ও আমাদের মুখে এসে যায়।'

'যেমন মুখ।' উমা ভ্রূকুটি করলে।

'খারাপ নাকি? একেবারে রাজপুত্তুর। দুর্গাদাস প্যাটারন্।' বাসু হাসল।

'আহা, কী আমার রাজপুত্তুর—।' উমা চোখে ঠোঁটে পরিহাস করল।

'তোমার চেয়ে ত ভাল।'

উমা ক'পলক বাসুর দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ নামিয়ে নিল। কটকটে ফরসা গোল মুখটায় কেমন এক খুশীর ভাব ছিল এতক্ষণ সেটা কেটে গেল। হয়তো খানিক কঠিন হয়ে এল মুখের ভাব। সামান্যক্ষণ আর কথা বলল না উমা। তারপর রূঢ় স্বরে বলল আচমকা, 'মুখ ভাল হলেই ত আর ভাল হওয়া যায় না।'

'মানে, আমি খারাপ নাকি?' বাসু তখন কিছু বুঝতে না পেরে সহজ গলায় বলছে।

'ভালর গুণ দেখতেই পাচ্ছে সকলে।' উমা শক্ত গলায় বলল, 'নিজের বিধবা মা না খেয়ে উপোস করে পড়ে আছে, পরন্তু একাদশী করে—আর ছেলে দিব্যি খেয়ে দেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন! কি বাহার ছেলের—!'

বাসু থতমত খেয়ে গেল; হকচকিয়ে গেল। এই নিরবিলি দুপুরে কোথায় একটু হাসি-খুশী রগড়-রসের কথা হবে, লভটভের ইশারা-আভাস—তাই ভেবে নীচে নেমে এসেছিল—তা না একেবারে পালটা সুর। ইস্ এ যে খুব মেজাজ নিয়ে কথা বলছে!

'মা খায় নি যার খুশি; আমি কি করব!' বাসু থতমত অবস্থার মধ্যে বলে ফেলল।

'তাই ত; নিজের খাওয়াটা হলেই হল! স্বার্থপর—!'

'যা বাব্বা! তা সাপের মতন ফুঁসছ কেন?' বাসু আরও একটু এগিয়ে উমার হাত থেকে বইটা টেনে নিতে যাচ্ছিল—কিংবা হতে পারে মুখটা দেখবার চেষ্টা করছিল উমার।

'অসভ্যতা করো না'—উমা ছিটকে খাটের পাশে সরে গেল, 'মাসিমা যে দুঃখ করে বলে—ঠিক বলে। মা উপোস করে মরছে আর উনি লীলা চিটনীস দেখতে যাচ্ছেন, লজ্জাও করে না!'

'অ্যাই, লেকচার মের না।' বাসুর রাগটা এবার দপ্ করে মাথায় চড়ে উঠল। রুক্ষ ধমকটা ঘরের মধ্যে আরও কর্কশ শোনাল, 'সবাই দেখছি দিদির মতন লেকচার মারতে শিখেছে।'

বাসুর চোখে চোখে তাকিয়ে উমার মনে হল, সত্যি একটা নিষ্ঠুর পশুর দিকে তাকিয়ে আছে ও, লোভী নোংরা বদমাশ ছেলের দিকে। উমা বুঝতে পারল না, কেন কি জন্যে তার সাঙ্ঘাতিক একটা আক্রোশ জাগছে বাসুর ওপর, এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা ঠেলে গলার কাছে এসে পড়ছে। অসহ্য লাগল উমার। আচমকা বলল, 'মানুষকে কেউ লেকচার দেয় না, অমানুষকে দেয়; ঘোড়া গাধাদের।'

বাসুর গা জ্বলে গেল কথা শুনে। মাথার মধ্যে ঝাঁঝটা আরও বেড়ে সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। প্রায় লাফ মেরে বিছানার ওপর পড়ল বাসু। উমার হাত চেপে ধরল খপ্ করে শক্ত মুঠোয়। 'খুব যে চ্যাটাং চ্যাটাং বাত হচ্ছে—তোমার ওই মেয়েছেলেদের মতন ল্যালা ক্যাবলা ভাই পেয়েছ নাকি আমায়—এক থাপ্পড়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব, আর একটা যদি কথা বল।' উমার হাতটা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল বাসু, যেন একটু মুচড়ে দিল। একটু থেমে উমার মুখের দিকে চেয়ে কদর্য গলায় বিদ্রূপ করল, 'উ-ওঃ—খুব কর্তামি ফলাতে এসেছে—কোথাকার কে আমার লাট রে! মেয়েছেলের মুখে লম্বা লম্বা বাত—!' উমার হাত ছেড়ে দিল বাসু, 'আমার মা খায় না-খায় আমরা বুঝব তোমার কি—ছেলের বউ নাকি তুমি?···তাও যদি একটু ভদ্দরলোকের মতন চেহারা হত।' বাসু লুঙ্গির খসখসে আওয়াজ তুলে ঘরের বাইরে চলে গেল।

উমা যেন এই ঘরের কোথাও আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না; সব আছে—অথচ কেমন খটখটে কাঠের মতন। উমার সঙ্গে এই ঘরের নিবিড় বন্ধনটা কেমন করে কেটে গেছে। মাথার ওপরকার ছাদ ছায়ায় কাল; দেওয়ালের কোণে কোণে কিম্ভুতকিমাকার এক রকম ধোঁয়া-জমা-অন্ধকার। নিখিলের বইয়ের টেবিল যেন উমার মাথায় মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে, আলনায় টাঙ্গানো জামা-কাপড়গুলো যেন উঁচুতে ঝুলে ঝুলে ছি ছি করছে। বাকস তোরঙ্গ বিছানা-মাদুর—সবই এখন উমার কাছে থেকে দূরে সরে গিয়ে তাকে দেখছে।

বিহ্বলতার ভাব কাটতে খানিকটা সময় লাগল উমার। আস্তে আস্তে ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে নিজের মধ্যে ফিরে আসতে শুরু করল উমা। কি বলল ও, ছেলের বউ নাকি তুমি···আমার মা আমরা বুঝব, তোমার অত কি···। উমা দরজার দিকে চাইল—ফাঁকা, উঠোনে ক'টা চড়ুই কিচকিচ করছে। কি বলল ও,···তাও যদি ভদ্দর লোকের মতন চেহারা হত···।

উমা জানলার কাছে সরে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে গলির দিকে তাকিয়ে থাকল। একটু শুধু দেখা যায়, এবড়ো খেবড়ো খানিকটা পিচ জমে আছে

এক জায়গায়—একটা বেড়াল মাছের কাঁটা চিবুতে গিয়ে গলায় লাগিয়ে মাথা মুখ বেঁকিয়ে কাঁটাটা বের করে ফেলার চেষ্টা করছে।

এখনকার ঘটনাটা পুরো মনে করবার চেষ্টা করল উমা। সবটাই তার মনে আসছে না। বাসুর সেই হঠাৎ চড়াও হওয়া, জানোয়ারের মতন লাফিয়ে ধরা, মারমুখো ভাব, বিশ্রী ইতর মুখচোখের ভঙ্গি আর কদর্য গালাগালগুলো মনে পড়ছিল; একের সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে জড়িয়ে বারবার করে।

বেড়ালটাকে দেখতে দেখতে উমার দুচোখ ঝাপসা হয়ে এল জল ভরে। নাক কপাল চোখ কিসের অসহ্য যন্ত্রণায় যেন ফেটে যাচ্ছিল। বুকের মধ্যে পাক দিয়ে দিয়ে কান্না গলায় ঠেলে আসছিল আর বাতাসের সেই পুঁটলির মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে আসছিল।

উমা দাদার বিছানায় এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কান্নার আবেগটা কমে এলে উমা ভাবছিল, সে কি অন্যায় কিছু করেছে? ওপরে মাসিমা উপোস করে মরছেন রাগ করে, তার জন্যে মাসিমার ছেলেকে কিছু বলা কি খারাপ কাজ হয়েছে! ওদের মা বলে ওরাই সব কিছুর মালিক? এই যে দেড় বছর ধরে এত আলাপ-পরিচয় অন্তরঙ্গতা—মাসিমাও ত তাকে স্নেহ করেন, জ্বর জ্বালায় মাথার কাছে এসে বসেন—সেই মাসিমার জন্যে তারও কি একটা সামান্য কথা বলার থাকতে পারে না!

কর্তামি ফলাতে গিয়েছিল; বাসুকে ডেকে পাঠিয়ে অত লেকচার দেবার তার কি অধিকার আছে? ছেলে মার ব্যাপার তারা বুঝবে, যেমন খুশি তেমনি করবে, কিন্তু তুমি কে কথা বলার?

বাসুর ওপর এই অদ্ভুত অধিকার কি করে পেয়েছে উমা, কবে, কি ভাবে? এখন আর তা ভেবে ঠিক করতে পারল না। এইটেই সব চেয়ে শক্ত জানা, সবচেয়ে আশ্চর্যের, হয়ত কেমন এক আনন্দের—কিন্তু কবে-র কথা জানা না থাকলেও, অধিকার পাওয়াটা সে বুঝছিল। অনুভব করেছিল। বিশ্বাস

হয়ে গিয়েছিল। এতখানি জোর, তাই মনে হয় নি কর্তৃত্ব, মনে হয় নি অন্যায়। বরং কী ভালই তখন লাগছিল।

'উমাদি।' আরতি ডাকল।

উপুড় হয়ে দু'হাত জড়িয়ে মুখ ঢাকা ভঙ্গিতে শুয়ে ছিল উমা, আরতির ডাকে চমকে উঠল। মাথা তুলল না। ডান হাতটার ওপর আরও মাথাটা গড়িয়ে দিয়ে চোখের শেষ জলটুকু মুছে নেবার চেষ্টা করল।

'ওমা। ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?'

কথা বলতে ভয় হচ্ছিল উমার। গলার ভাঙ্গা স্বরে যদি বুঝে যায় আরতি।

'মা সরবতটুকু খেয়েছে।' আরতি বলল।

উমা এবার মুখমোছার ভান করে আঁচলে চোখ গাল রগড়াতে লাগল মাথা তুলে।

'দাদা গিয়ে আবার এক দফা হম্বিতম্বি করলে। কি সব বলল—কে জানে—দাদার কথায় সরবতটুকু খেল মা।'

উমা মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে তাকাল। আচমকা একটা খুশী আসতে আসতে থেমে গেল, হঠাৎ শুখিয়ে উঠল মুখ। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে যেন। 'কি বলল?'

'কি আবার—রাগারাগি করল, বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবে বলল—এই সব যত।' আরতি একটু হাসল। 'আমি দেখেছি উমাদি—দাদাকে ভেতরে ভেতরে মা যত ভালবাসে, তত ভয় পায়।'

উমা গায়ে কাপড়টা ঠিক করে নিল। কপালের চুলগুলো সরিয়ে সিঁথির পাশে ঠেলে দিল।

বলি কি না-বলি মুখ করে একটুক্ষণ কি ভাবল আরতি, শেষে বলল, 'দাদাকে পাশে বসিয়ে মা অনেক দুঃখ করছে, উমাদি; শুনলাম। বকা ঝকাও করছে।...বলতে নেই আমার দিদি হয়, কিন্তু দিদি আজ মার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। খুব খারাপ।' আরতি একটু থেমে ম্লান বিষণ্ণ মুখে বলল, 'দাদাকে বলছিল মা, তুই যদি আমায় না খাওয়াতে পারিস আমি উপোস করেই মরব—তুমি জানো না উমাদি, মার খুব রাগ আর জেদ। সত্যি

যদি জেদ চাপে—মাকে ভাঙানো যাবে না।' আরতি মুঠোয় করে কাঁটা ফিতে নিয়ে এসেছে, চুল বাঁধবে। উমা বেঁধে দেবে। তারপর পালটা আরতি বাঁধবে উমার। মুঠো খুলে কাঁটা ফিতে চেয়ারের ওপর রেখে চিরুনি আয়না আনতে গেল আরতি শেলফের দিকে।

আয়না পাড়তে পাড়তে আরতি আবার বললে, 'আমাদের বাড়িটা কেমন যেন হয়ে গেছে উমাদি।'

উমা উঠল। কোমরের কাছে শাড়িটা ঠিক করে নিল। আস্তে গলায় বলল, 'বস—মুখে চোখে একটু জল দিয়ে আসি।'

কলঘর থেকে বেরিয়ে আসছে উমা—সিঁড়ি দিয়ে টপকে টপকে নামছে বাসু। খাকি ফুল প্যান্ট, নীল শার্ট। ডিউটিতে যাচ্ছে।

উমা সঙ্গে সঙ্গে মুখ নীচু করে উঠোন থেকে বারান্দায় উঠে এল, তাড়াতাড়ি পায়ে। রাজপুত্র যাচ্ছে—তার সামনে নিজের কদাকার অভদ্র চেহারাটা রাখতে উমার আর ইচ্ছে নেই।

আঠারো

সুধা বাড়ি ফিরল রাত করে। শীতের সন্ধ্যে ; মনে হাচ্ছল অনেক রাত হয়ে গেছে। ঘড়িতে সময়ের কাঁটা সাতটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। ধোঁয়া আর অল্প কুয়াশা জমেছে গলির মধ্যে, মিটমিটে গ্যাসের আলোর পাশে কতক পোকা উড়ছিল।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে সুধা একবার রান্নাঘরের দিকে তাকাল। বাতি জ্বলছে। উঠোন পেরিয়ে যাবার সময় আর কোনো দিকে চাইল না। ঘরের কাছে চৌকাটের সামনে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে জুতো খুলল—পায়ে করে ঠেলে একপাশে সরিয়ে রেখে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ঘর অন্ধকার ; সুইচ টিপে বাতি জ্বালল সুধা। কাঁধে ঝোলান ব্যাগটা রাখল। বেশ শীত শীত করছে। হাতের আঙুলগুলো ঠাণ্ডা।

কান পেতে সুধা এই বাড়ির কোথাও থেকে একটু শব্দ বা কথার প্রত্যাশা করল। না, সব চুপচাপ। থমথম করছে। সদরে পা দিয়ে নীচের তলাতেও সাড়া-শব্দ পায় নি।

ঘরের মাঝখানে অল্পক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল সুধা। বুক-ঠেলে-ওঠা নিশ্বাস পড়ল। নিজের কানেই সেই শব্দ কেমন যেন শোনাল।

কাপড় জামা ছাড়তে লাগল সুধা। চশমা রাখল। শাড়িটা ছাড়বার সময় আবার করে মার কথাগুলো মনে পড়ল।

নীচে কলঘরে এসে ঠাণ্ডা জলে সাবানে অনেকক্ষণ ধরে হাত মুখ ধুল সুধা ; চোখে কপালে ঘাড়ে বেশি করে জল দিল। পায়ে মগ মগ জল ঢালল। তারপর গলার টাগরা যখন খুস্ খুস্ করছে মনে হল, নাক সর সর করছে ঠাণ্ডায়—সুধা কলঘর থেকে বাইরে এল। আরতি বা উমার গলার শব্দ নেই। ওরা এ-সময় নিখিলের ঘরে মেঝেয় বসে পড়াশোনা করে। বাতি

জ্বলছে নিখিলের ঘরে ; হয়ত ওরা আছে। কাকাবাবু এখনও ফেরেন নি, তাঁর ফিরতে আরও রাত হয়।

সুধা ওপরে উঠে এল। জানলার পাশে বাইরে সাবানটা রাখল, গামছায় হাত পা মুছল। ঠাণ্ডা জল ঘেঁটে আরও যেন শীতটা বেশি করছে।

রান্নাঘরের দিকে গেল না সুধা অন্তদিনের মতন, চা ছুমুঠো মুড়ি বা শুকনো রুটি খেতে, মার সঙ্গে বসে ক'টা কথা বলতে, রান্না বান্নায় টুকটাক হাত লাগাতে।...ঘরে এসে আবার একটু দাঁড়াল, ছেঁড়া চাদর টেনে গায়ে জড়াল ; শীত শীত করছে। বিছানার দিকেই যাচ্ছিল—হঠাৎ কি ভেবে দাঁড়াল একটু। পা পা করে এগিয়ে ঝাপসা আয়নাটার সামনে এগিয়ে এল। মুখ দেখল। চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল নিজেরই। ভাল করে এখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। খুবই ঝাপসা, আলো আসছে না, কাচটাও ময়লা।

আয়নার কাছ থেকে সরে এসে তক্তপোশের ওপর পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ল সুধা। ভেজান জানলা আর দেওয়ালের দিকে মুখ করে, কাৎ হয়ে, মাথার দিকে এলানো ডান হাতে মুখ আড়াল করে।

শুয়ে শুয়ে প্রথমেই যে-সব কথা মনে মনে তৈরি করছিল সুধা, তার ভাষা খুব ঝকঝকে, ধারাল, সংক্ষিপ্ত আর স্বার্থপরের মতন। এত দেরি করে বাড়ি ফেরার জন্যে যদি মা এখন কিংবা পরে কোনো প্রশ্ন করে—সুধা জবাবে যা বলবে তা ঠিক করে নিচ্ছিল। সুধা কোথায় গিয়েছিল, কার সঙ্গে—কি করছিল এতক্ষণ, স্পষ্ট করেই বলবে সব। তাতে মা কি ভাববে, কি বলবে, কতটা চিৎকার করবে—সুধার তাতে যায় আসে না। কেনই বা আসবে যাবে? মা হয়েছ বলে আমি তোমার কাছে বিকিয়ে যাই নি, আমারও একটা আলাদা জীবন আছে।

'দিদি, তোমার চা।' আরতির গলা।

সুধার মন এমন বিক্ষিপ্ত ছিল যে আরতির পায়ের শব্দ কানে যায় নি। আরতিও যেন আজ এই বাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে মিল করে সাড়া-শব্দ না তুলে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকেছিল। আরতির গলার স্বরে সুধা তাই

সামান্য চমকে গেল। মার জেদ আর আড়াআড়ি ভাবটাও বুঝতে পারল সুধা। মেয়েকে না ডেকে—ঘটা করে আরতিকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিয়েছে।

'চা খাব না ; নিয়ে যা।' সুধা মুখ না তুলে সম্পূর্ণ উপেক্ষার সুরে বলল।

'করলাম যে!' আরতি হয়ত দিদির মন একটু নরম করবার জন্যে খুব নরম আর অন্তরঙ্গ গলায় বলল।

'নদ্দমায় ফেলে দি গে।' সুধা বিরক্ত।

আরতি তবু দাঁড়িয়ে থাকল। অপেক্ষা করল সামান্য। বলল আবার, 'একখানা রুটি খাও, বেগুন ভেজে এনেছি। সকালে ভাত খাও নি।'

'দেখ্ আরতি—' সুধা প্রায় ছিটকে বিছানায় উঠে বসল, চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে, 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোকে আদিখ্যেপনা করতে হবে না। টান মেরে সব ছুঁড়ে ফেলে দেব! কত্তামি করতে এসেছে!'

দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে আরতি আর কিছু বলার সাহস করল না। কী বিশ্রী আর রুক্ষ দেখাচ্ছে দিদিকে! যেন ঠাস করে একটা চড় মারতে কি গরম চায়ের পেয়ালাটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে দিতে ওর বাধবে না।

ধমক আর তাড়া খেয়ে আরতি মুখ কাল ভার করে আস্তে আস্তে চলে গেল। চোখ দুটোও ছলছলিয়ে উঠেছিল। যেতে যেতে ভাবছিল আরতি, এ-সংসারে যার যত লাথি ঝাঁটা চোখ রাঙানি হজম করার জন্যেই ও আছে।

সুধা অল্পক্ষণ সেই ভাবে বসে থাকল। মাথার মধ্যে আবার দপদপানিটা অনুভব করতে পারছিল। গলার মধ্যে জ্বালাটা বেড়েছে। নাকের ভেতর সর সর করছে। ঠাণ্ডা জল অতটা ঘাঁটার পর এই অবস্থা যে হবে তাতে আর বিচিত্র কি! শীত পড়েছে বেশ—ঠাণ্ডাও ত লাগল আজ। সুতির জামায় শেষ অগ্রহায়ণের সন্ধ্যের কনকনানিকে রোখা যায় না। কাশিটা আর বাদ থাকে কেন, শুরু হোক! সুধা মনে মনে ভীষণ বিরক্ত আর বীতস্পৃহ হয়ে ভাবল।

আরতি গিয়ে মার কাছে এতক্ষণে কাঁদুনী গাওয়া শেষ করেছে। আর

মা নিশ্চয় কথার ওপর কথা ফেনিয়ে গজ গজ করেছে আবার আসবে নিজে। জ্বালাতন।

সুধা বিছানা ছেড়ে উঠল। বাতিটা নিভিয়ে দিল। অন্ধকার এসে ঘর ভাসিয়ে দিল মুহূর্তে। সুধা বাঁচল। ভাল লাগল তার। কাকটা তার মনের সঙ্গে মিল খেয়ে গেল বেশ।

বিছানায় ফিরে এসে এবার কুঁকড়ে, গায়ের চাদরে পা থেকে গলা অবধি ঢেকে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে আজকের কথাই ভাবছিল সুধা। এই সংসার যে কত স্বার্থপর—কত ইতর—আজ তা বুঝতে পেরেছে সুধা। আগেও যে না বুঝেছিল তা নয়। কখনও কখনও মনে হত, এই সংসার শুধু জিনিস আর লেনদেন নিয়ে আছে। অমলাদি যা বলত, তাই : তাদের আদর ততটুকু ততক্ষণ যতক্ষণ গরু হয়ে দুধ দিতে পারছে। তোমায় শুধু শুষে নেবার জন্যে ওরা। এই সংসার তাই—আখমাড়াই কল, তুমি আখ ; কলে পিষে শুষে তোমার রস বের করে নিচ্ছে তারপর ছিবড়ে বের করে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

মাড়াই হওয়া জঞ্জালে ফেলে দেওয়া আখের চেহারাটা সুধা কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, দেখতে পাচ্ছিল বিশ্রী চেহারার দাঁত তোলা কলটা কে যেন ঘুরোচ্ছে।

আজ সারাটা দিন সুধা এই কথাই ভেবেছে। ভেবেছে, তার নিজের বলতে আর কি কিছু আছে? কিছু না, কিছুই নয়। সুখ শান্তি আরাম আয়াস ইচ্ছে মন—সব—তার সবই এই সংসার একটা নিষ্ঠুর পাওনাদারের মতন কেড়ে নিয়েছে ; নিচ্ছে এখনও। নিজের জন্যে একটি বিন্দুও কিছু রাখতে দেবে না। এই বাড়ির মেয়ে তুমি—তোমার বিধবা মা আছে, বোন আছে ভাই আছে—কাজেই আর কথা কিসের—সারাদিন তোমার সবটুকু রক্ত জল করে এদের খাওয়াও পরাও, বাড়ির ভাড়া যোগাও, যার যা চাহিদা মেটাও। শুধু মিটিয়ে যাও। এদের মুখ রাক্ষসের হাঁ নিয়ে আছে, হাতগুলো দাও দাও করছে, চোখগুলো সব সময় লোভে হিংসায় ঈর্ষায় চকচক করছে। এরা রাক্ষস, এরা পশু, এরা ভিখিরি, ইতর, স্বার্থপর, আত্মসুখী।

আমি কি সাধ্যমতন আমার সব তোমাদের দিই নি, মা? সুধা মনে মনে রত্নময়ীকে শুধোল—তীব্র ব্যাকুল গলায়, বিষ চোখে চেয়ে: বলো, ভগবানের নামে দিব্যি করে বলো তুমি। বাবা মারা যাবার পর—এই সংসার যখন ফুটো হয়ে ডুবতে বসেছিল, না খেয়ে মরছিলে সব—তখন এই সুধা রাস্তায় বের হয়ে স্কুলের চাকরি জুটিয়েছিল, টিউশানি করেছিল দু-বেলা; সে-টাকায় এই দুর্দিনে কুলোচ্ছিল না বলে অফিসের চাকরি। বিকেল পর্যন্ত মুখের রক্ত উঠিয়ে চাকরি করেছি, সন্ধ্যেয় টিউশনি। সব টাকা এনে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি, একটা পয়সাও নিজের জন্য নিই নি কোনোদিন। দু মুঠো ভাত ডাল চচ্চড়ি শুকনো রুটি গুড় চালভাজা—এর বেশি কোনোদিন খাইনি; না এক ফোঁটা দুধ-সর, না ঘি। গায়ের জামা, শাড়ি সায়া—যা জুটেছে তাই; ছেঁড়া পেঁজা ময়লা আধভিজে শাড়ি জামা পরে দিনের পর দিন কাটিয়েছি, একটা চামড়া-ক্ষয়ে-যাওয়া পেরেক-সর্বস্ব চটি পায়ে রাস্তা-অফিস করে বেড়িয়েছি। কোনোদিন কি দেখেছ নিজের জন্যে কিছু করেছি, এনেছি? শখ বল, ইচ্ছে বল, আমোদ-আহ্লাদ বল, সুধা কোনওদিন তা মেটাতে যায় নি। ......অথচ আজ তুমি মা হয়ে মেয়েকে এত কথা বললে! ছি ছি ছি।

সকালের কথাগুলো ফুলকির মতন জ্বলে জ্বলে সুধার মাথায় আর বুকে ছিটকে ছিটকে পড়ছিল; জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছিল—ছ্যাঁকা দিয়ে ফোস্কা পড়িয়ে ছাড়ছিল। আর বিছানার মধ্যে অন্ধকারে ছটফট করছিল সুধা। কপালের শিরা ফেটে পড়ছিল, চেতনা ঘোর হয়ে ছিল।

কি করে বললে মা তুমি অমন কথা? কি করে বললে. আশ্চর্য! একগাদা পয়সা খরচ করে গন্ধ তেল মাখি চুলের বাহার করতে, স্নো পাউডার কিনে এনে মেজে ঘষে রূপসী সাজি অফিসে গিয়ে দেখাতে, বাহারে দামী শাড়ি পরি ফ্যাশানের জন্যে? আর তোমরা মাথায় মাখতে তেল পাও না—পরতে কাপড় পাও না—?

সুধা অন্ধকারে শরীরটা ধনুকের ছিলার মত টান করে দিয়ে পড়ে থাকল খানিক। তারপর যেন সাংঘাতিক একটা তীর ছিলায় দিয়ে টানল. জোর—যত

জোর আছে মনের সব—সমস্তটুকু নিঃশেষ করে। তার পর ছুঁড়ে দিল সেই তীর।

তবে শোন মা, চার মাসের বাকি বাড়িভাড়া পাঁচ মাসে গিয়ে ঠেকেছে, উকিলের চিঠি এসেছে—মামলা করছে বাড়িঅলা, এরপর আমাদের ভাঙা বাক্স, ছেঁড়া বিছানা বালিশ, হাঁড়ি কুঁড়ি নিয়ে রাস্তায় গিয়ে বসতে হবে ওই ভিখিরিদের মতন। এখন বাজারে পঞ্চাশ টাকা মণ মোটা চাল, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা মণ আটা, এক টাকা সের চিনি, কয়লা আর কাঠ সের দরে ধর্ণা দিয়ে কিনতে হয়, বাজারে আগুন জ্বলছে। এমন রাক্ষুসে দিনেও আমাদের বাঁচতে হবে। একটা পেট নয়, চারটে পেট, দু-বেলা কোনো গতিকে ভরা চাই, আদুল উদাম গা ঢাকতে আমাদের চটের মতন কাপড় জামা তাও চাই, ছাদের তলায় মাথা বাঁচাতে বাড়িটুকু রাখতে হবে। টাকা চাই—টাকা—! তোমার ছেলে মাসান্তে তিরিশ চল্লিশটা টাকা আনে—তার থেকে তার চা বিড়ি সিনেমা ফূর্তির পর—কটা পয়সা সত্যি আসে সংসারে! কিছুই না। তারপর এত তেষ্টা কার আনা কলসির জল থেকে গড়িয়ে খেয়ে মেটাচ্ছ?

আমার। হ্যাঁ, আমার। সুধা অসহ্য উত্তেজনা আর আবেগে যেন চিৎকার করে বলে উঠল। ......আমার, আমার চাকরির পয়সার অন্ন তুমি যদি না খাও, রাস্তার ভিখিরিদের মতন মরবে। তুমি, আরতি, বাসু—সবাই।

বিছানার খসখসে ময়লা-গন্ধ চাদরে মুখ মাথা রগড়াতে লাগল সুধা। অসহ্য এক অস্বস্তি আর আক্রোশে। ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে মার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে এই সত্য কথাগুলো আজ খোলাখুলি স্পষ্ট করে বলে।

সুধা কত মাইনে আনছে, কোন শাড়ির দাম কত এ-সব জানতে, গন্ধ তেলের স্নো পাউডারের হিসেব রাখতে খোঁজ রাখতে যদি মার উৎসাহের অভাব না থেকে থাকে—সব কথা জানতেই বা কেন আপত্তি থাকবে! মার জানা উচিত—আজ প্রায় তিনমাস সুধা নতুন কি চাকরি করছে, কি তার কাজ! ...কই তার বেলায় ত মার তাগিদ দেখি নি।

তেমন পুরনো কথা নয়—মনে হয় সবই যেন কাল কি পরশু ঘটে গেছে। সুধার মনে এখনও সেই ছবিগুলো অটুট। একটুও ঝাপসা হয়নি। ...মনে পড়ে দিন দিন কী সাংঘাতিক হয়ে এসেছিল তাদের অবস্থা, বাড়ির ভাড়া মাসের পর মাস বাকি পড়ছে, লাফ দিয়ে দিয়ে চালের আটার বাজার চড়েছে—কনট্রোলের দয়ায় কুলোয় না, চল্লিশ টাকা চালের মণ, হাতে পায়ে ধরে কিনে আনতে হয়; একখানা মোটা যেমন-তেমন কাপড়ের দাম ছ সাত টাকা—বাড়িতে অর্ধেক দিন উনুন ধরে ঘরের পুরনো কাঠকুটো ভেঙে, হ্যাংলার মতন ঘুঁটে কয়লা চেয়ে এনে, মোটা দুর্গন্ধ একমুঠো ভাতের সঙ্গে জোয়ারের দুখানা রুটি খেয়ে পেট ভরাতে হয়, কোনো কোনোদিন আধপেটাও জোটে না—যেমন তেমন দু এক গরাস পেটে ফেলে জল খেতে হয় সবাইকে—মার গায়ে ছেঁড়া শতচ্ছিন্ন থান, আরতিকে কোন্ কালের শালুর কাপড় কেটে সায়া করে পরতে হচ্ছে, গায়ে দেবার জামা নেই—দুটি ছাড়া সুধারও অবস্থা তাই। মিশন রো-র অফিসে নব্বই টাকা মাইনে—তাও ধার বাবদ আট দশটাকা কাটা যায়। বাকি আশিটা টাকায় এই রাক্ষুসে দিনে চারটে পেটের সংসার আর চলে না। ঘরে নেই-নেই আর মুখ ভার, উপোস আর রাগারাগি; জন্তুর মতন আঁচড়া আঁচড়ি কামড়া কামড়ি। সুধা অমলাদিকে চিঠি লিখে উত্যক্ত করে তুলেছিল, আমার একটা বেশি মাইনের চাকরি যেমন করে হোক করিয়ে দাও অমলাদি, নয়ত আমরা আর পারছি না, সবাই এবার মরব।

অমলাদির সঙ্গে সেই চন্দ্র সাহেবের কামরায় গিয়ে দেখা করার কথা আজও মনে পড়ে। অমলাদির কী দুঃসাহস! অমন কড়া বিশ্রী মেজাজের পাকা সাহেবের খাস কামরায় হুট্ করে ঢুকে পড়ল সুধাকে নিয়ে। সুধার মনে হয়েছিল একটা ভুল কামরায় সে ঢুকে পড়েছে। সেই ঘরের ছিমছাম মেহগনি-পালিশের মতন মসৃণ চেহারা, অল্প অথচ দামী আসবাব, শ্বাসরুদ্ধ আবহাওয়া, থমথমে গাম্ভীর্যে সুধার বুক ফেটে পড়ার অবস্থা, কী ভয় সুধার—মনে হচ্ছিল এখুনি ধমক দিয়ে এই নোংরা ভিখিরবেশ মেয়েটাকে চন্দ্র সাহেব তাড়িয়ে দেবেন। গাঢ় রঙের কার্পেটের ওপর ময়লা চটির ধুলো

লাগছে বলে সুধা পায়ে ভাল করে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত সাহস করে নি। গলায় আর কপালে ঘাম জমে উঠেছিল ভয়ে, গলা কাঠ।

চন্দ্র সাহেব তাকালেন কি তাকালেন না সুধা বুঝতে পারল না। কি একটা কথা বললেন ইংরিজীতে। অমলাদি তার জবাব দিল। জবাবের পর সুধা বুঝতে পারলে—অমলাদি চন্দ্র সাহেবকে তার কথা আগেই বলে রেখেছে। ফিটফাট, নিখুঁত নিটোল এক ভদ্রলোক বসে আছেন। বয়স বেশি নয়। কিন্তু এই বিরাট ঘর, ওই সাহেবী সাজ পোশাক, উর্দি পরা খাস বেয়ারা, ডবল টেলিফোন, সাজানো পরিষ্কার টেবিল—সব মিলিয়ে চন্দ্র সাহেবকে বিরাট বড় কিছু একটা দেখাচ্ছিল—অনেক উঁচু ধাপের মানুষ যাকে সুধার মতন মেয়েরা ছুঁতে পর্যন্ত নাগাল পায় না।

চন্দ্র সাহেব মাত্র একটি কথা বলেছিলেন সুধাকে। 'সো সিকৃলি। অসুখ বিসুখ কিছু আছে?'

'আজ্ঞে—না।' সুধা ভয়ে আর বিহ্বল হয়ে মাথা নেড়ে জবাব দিয়েছিল।

'আচ্ছা, আপনি যান।'

চাকরি না হোক্—এখন এই ঘর থেকে বেরুতে পারলে সুধা বাঁচে। কোনো রকমে একটা নমস্কার সেরে পালিয়ে এল। পা কাঁপছে তখনও।

অমলাদি এল আরও কয়েক মিনিট পরে। বাইরে এসে সুধাকে নিয়ে লিফটে করে সোজা একতলা। একটু ফাঁকায় এসে বলল, 'একখানা ভাল শাড়ি পর্যন্ত তুই পরে আসতে পারিস নি?'

সঙ্গে সঙ্গে সুধার বুকে হু হু করে যেন এক রাশ কনকনে জল ঢুকে গেল। মনের কোথায় যে একটু আশা ছিল—থমথমে অন্ধকার মাঠে ভাঙা লণ্ঠনের আলোর মতন—তাও নিভে গেল দপ্ করে।

'হল না ত!' সুধা কান্নার গলায় বলল।

'হত না; কিন্তু হবে শেষ পর্যন্ত।'

সুধার বুক থেকে কনকনে জল হস্ করে বেরিয়ে গেল। কেমন একটা আচমকা আঁচ এসে লাগল। ভাঙা লণ্ঠনের শিখা দপ্ করে জ্বলে উঠল।

'সত্যি অমলাদি—?' সুধা অমলার হাত চেপে ধরল।

'শোন, চাকরিটা ওই তোর আগের অফিসের মতন খাতায় টিক দেওয়া আর ফাইল পত্র গুছিয়ে রাখা নয়—এটা অন্য রকমের—খুব আরামের রে।'

'কি রকম অমলাদি?' সুধা ছটফট করছিল জানতে।

'কিচ্ছুনা, দিব্যি পটের ঠাকুর সেজে বসে থাকা।' অমলা হাসল, 'এই অফিসটা কিসের জানিস ত, পেইন্টস-এর—রঙ, রঙ-বেরঙের কাজ এখানে—যত রাজ্যের রঙ নিয়ে ব্যবসা। যুদ্ধের চোটে এদের ব্যবসা বিশগুণ ফেঁপে উঠেছে, গাদা গাদা রঙ বিক্রি করছে—। খুব দরকারী জিনিস রে রঙ আজকাল; মিলিটারী সাপ্লাই শুধু যে কত।' অমলা সুধাকে টেনে হলঘরের মতন জায়গাটার এক কোণায় নিয়ে গেল, 'দেখ তাকিয়ে—।'

সুধা আগেও দেখেছিল, অফিসে ঢুকতে গিয়ে—আবার করে চেয়ে দেখল। দেওয়াল ভর্তি ছবি, শুধু রঙের, কোনোটা গাঢ় লাল, কোনোটা গাঢ় সবুজ; নানা রকম বাড়ি ঘর-দোরের ছবি, তাতে বাহারী করে রঙ লাগানো। কাঁচে বাঁধানো ছবি ছাড়াও, রঙের ঝিলিক তোলা ছাপা বোর্ডও এদিক ওদিক রাখা হয়েছে। ফিটফাট ছিমছাম সাজানো সব।

'ওই যে দেখছিস না—এক কোণে ওরা দুটি মেয়ে বসে আছে—তোকে অমনি ভাবে বসে থাকতে হবে।' অমলা বলল।

সুধা তাকাল। এক পাশে চাঁদের মতন বাঁকানো, চকচকে কাঠের কাউণ্টারের আড়ালে দুটি মেয়ে। বুকের ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে, বাকিটা আড়ালে; সর্বাঙ্গে ওদের একটা ঝলমলে ভাব। বসে আছে যেন তোমার মুখের কথাটি খসবার আগেই ফিসফিস করে উঠবে ওর গলা। কী বিনীত নম্র অথচ শালীন। তাদের একপাশে ছোট্ট একটি কাঠের বোর্ড। সাদা রঙে লেখা: এনকোয়ারী। ফর অল পারপাস।

'কি রে—?' অমলাদি সুধার হাত ধরে টানল, 'বেশ আরামের চাকরি, না? সারাদিন বসে বসে নানা রকমের লোক দেখবি। কেউ কিছু জানতে চাইলে—কারুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, দু-চার কথায় জবাব না হয় স্লিপ আর বেয়ারাকে দিয়ে জায়গা মতন পাঠিয়ে দেওয়া। ব্যাস্!'

সুধা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। বললে, 'বা, এই শুধু?'

'হ্যাঁ, তা ছাড়া আর হাতি ঘোড়া কি? রিসেপশান করা শুধু, ভদ্র ভাবে কথা আর মিষ্টি একটু হাসি মুখ।'

বাইরে এসে সুধা শুধোল, 'চন্দ্র সাহেব সত্যি চাকরি আমায় দেবে বলেছেন?'

'দেবে। কিন্তু এ-ভাবে এই বেশভূষা করে এলে তোমার চাকরি থাকবে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে হবে বাপু তোমায়—স্মার্ট অ্যাণ্ড বিউটিফুল। হ্যাতা-গোবরা হয়ে থাকলে চলবে না।' অমলা ফরফরে গলায় বলল, 'এত ঝকঝকে রঙের মধ্যে আপ্যায়ন অভ্যর্থনাটা চন্দ্রর মতন বাহারী হওয়া চাই। বুঝলি?'

সুধা বুঝেছিল কি না-বুঝেছিল কে জানে; জবাব দিল না। শুধোল, 'মাইনে কত অমলাদি?'

'একশো; প্লাস্ ডিয়ারনেস—গোটা বিশেক টাকা বোধ হয়; এনক্লোজারের মেয়েরা আরও দশ টাকা বেশি পায় সাজগোজের জন্যে, লণ্ড্রি খরচ আর কি। তাছাড়া বিনি পয়সায় টিফিন পাবি।'

সুধার সবই কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছিল। বলল, 'বাব্বা! এদের ত খুব ভাল ব্যবস্থা।'

'আধা-বিলিতী কোম্পানী যে। বিয়ে করলে দেখ না তোকে একটা ম্যারেজ অ্যালাউন্স দেয় কি না।' অমলা হেসে উঠল।

রাস্তায় এই পাগলের মতন হাসিতে সুধা যেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠল। 'কি ঠাট্টা করছ অমলাদি!'

দু-পাঁচ পা এগিয়ে এসে অমলা নিজের থেকেই বললে, 'ভাল করে যদি কাজ করিস—মন লাগিয়ে—বেশ ভাল মাইনে পাবি পরে।'

সুধা তারপর দরকারী আরও দু-পাঁচটা কথা জেনে নিল। শেষে জিজ্ঞেস করল, 'চন্দ্র সাহেবের সঙ্গে তোমার আলাপ হল কি করে?'

চট্ করে অমলা কোনো জবাব দিল না। কি ভাবছিল। শেষে বলল, 'হয়েছে। খুব বেশিদিন নয়।'

'ওপরে অত কড়া মেজাজের হলেও লোকটি ভাল, না অমলাদি ?'

'হ্যাঁ, ভাল।' অমলা আস্তে মাথা নাড়ল।

এর দিন পনেরো পরে সুধার নতুন চাকরি হয়ে গেল। হ্যাঁ, হল। কিন্তু অমলাদি যে বলেছিল, হবে শেষ পর্যন্ত—তাই। শেষ পর্যন্ত অমলাকে আরও কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। সুধাকে চন্দ্রসাহেবের পার্ক সার্কাসের বাড়ির ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে একদিন ভিখিরির মতন।

চাকরির দিনটার এবং পরের সব কথা বেশ খুঁটিয়ে আজ, এখন মনে হল সুধার। অন্ধকারের মধ্যে চোখের পাতায় সিনেমার ছবির মতন পর পর দৃশ্যগুলো এল আর মিলিয়ে গেল।

সুধা এখন ভাবছিল, কই মা ত খুঁটিয়ে এ-সব কথা জানতে চায় নি কোনোদিন। টাকার হিসেবটা সব জেনেছে, কিন্তু চাকরি—! কি করে হল? কেমন করে? কেমন চাকরি, কি করতে হয় না হয়?

আমি কেন শাড়ি কিনেছি, কেন জুতো কিনেছি, কেন একটু সস্তা গন্ধ-তেল মাথায় দি, পাঁচ আনা কৌটোর পাউডার আর বাজে স্নো মাখি—এ-সবই বুঝতে যদি আমার ওপর তোমার মায়া মমতা স্নেহ কৌতূহল অতখানি থাকত, মা। কোনোদিন মনে হত তোমার, কি করে মেয়েটা অফিসে, কি তার কাজ, তাতে কতখানি স্বস্তি শান্তি আছে, কতখানি অস্বস্তি অশান্তি, পীড়ন! বাড়িতে খাটো করকরে কণ্ট্রোল ক্লথ, সোডা সাবানে কাচা—, ছাতার কাপড়ের ব্লাউজ, বাইরে পাঁচ ছ' ঘণ্টার জন্যে মনোহারী সাজা।

সুধার চোখ জলে ভরে উঠে গড়িয়ে গালে মাখামাখি হচ্ছে, বুঝতে পারছিল ও; যন্ত্রণাদায়ক টনটনে একটা ফোঁপানি নাকের কাছে ফুলে ফুলে উঠছিল। গলার কাছে বাতাস পুঁটলির মতন পাক খেয়ে খেয়ে শক্ত জমাট হয়ে গেছে।

আস্তে মুখটা হাঁ করল সুধা। ফোঁপানির যন্ত্রণা তাতে কমল একটু আর শব্দটা চাপা পড়ল, গলা দিয়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস বইতে লাগল।

আমার যে চাকরি মা, তাতে রূপ আর শোভা মাজতেই হবে। ঝকঝকে

করে রাখতে হবে নিজেকে, নিকেলের ফুলদানির মতন, ময়লা ধরলে সরিয়ে দেবে, ফেলে দেবে, বাতিল করবে।—অথচ এই চাকরি না নিলে আজ যাও বা মোটা গন্ধ বিশ্রী চালের দুমুঠো ভাত, দুখানা রুটি গলা দিয়ে যাচ্ছে—তা যেত না। দু'মাসের বাড়ি ভাড়া শোধ করতে পারতুম না, বাড়িতে উনুন ধরত না, বাতি জ্বলত না, এই শীতে আমরা ছাদের তলায় মাথা গুঁজতে পেতাম না। রাস্তায় কাঙালদের মতন থালা বাটি হাতে ফেন চেয়ে বেড়াতে হত বাড়ি বাড়ি।

আমার এই রোজগারের অন্ন যদি তুমি আজ মুখে না তোলো, তুলো না। রূপ দেখিয়ে নোংরামি করে আমি পয়সা আনি নি, ক'ঘণ্টার থিয়েটারী পরী সাজছি। পরীই বা কেন—তাও না। খুব সাধারণ মামুলি পরিচ্ছন্ন একটি মেয়ে। যা সাজার সামান্য ইচ্ছা অধিকার সকলেরই আছে অথচ যা সাজবার মতন সামর্থ্য আমার নেই; হবেও না কোনোদিন।

সুধা চোখ গাল মুছল। দাঁত দিয়ে চাদর কামড়ে থাকল খানিকটা। ভাবনায় চিন্তায় অভাবে অনটনে ক্ষুধায় ব্যর্থতায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাওয়া শরীর আর রূপের ছবিটা আজ দেখতে পাচ্ছিল নিজেই। মুখের ফ্যাকাসে ভাবটা নিজেও আজকাল আয়নায় দেখতে পায় সুধা. সাদা পাণ্ডুর রুক্ষ মুখ; চোখ দুটো তলিয়ে কোথায় নেমে গেছে—কালি ধরেছে গর্তে. গালের হাড় ঠেলে উঠছে দিন দিন, কপালে রেখা পড়ছে, গলার কণ্ঠা খট্ খট্ করে। এই ত চেহারা, রূপ—! নিজেই জানে সুধা, তার রূপ মরেছে, জীবন্ত মানুষের মতন কোথাও একটু স্বাভাবিক লালিত্য নেই; স্বাস্থ্য সৌন্দর্য দুই-ই গেছে। বয়সও বাড়ছে। ভীষণ ভয় হয় সুধার। ভয়, এই ভাঙা মরচে ধরা খাঁচা কিংবা নিকেল ওঠা ফুলদানির রূপটা কোনদিন চন্দ্র সাহেবের চোখে ধরা পড়ে যাবে। তখন নেমে আসতে হবে সোজা রাস্তায়—!

মাঝে মাঝে মনে হয় তার পুরনো অফিসই ভাল ছিল। সেখানে অন্তত এই সর্বক্ষণের ভয়, নিকেল উঠে যাওয়ার ভয় ছিল না। কিন্তু আজ আর সেখানে ফিরে যাওয়া যায় না। সে-দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। চল্লিশ-পঞ্চাশটা বেশি টাকার মোহ তাকে এ কোথায় এনেছে? সুধা ভাবে, অথচ এ-কথাও

বোঝে, এই চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা না এলে মরা সংসার তখনি মরে যেত—এ-পর্যন্ত ঠেলে আসতে হত না। নতুন অফিসের ক্রেডিট সোসাইটি থেকে তবু ত সত্তর টাকা ধার নিয়ে ফেলেছে সুধা এর মধ্যেই। রবীনবাবুর পরামর্শ মতন। নয়ত—।

এ-সব কথা ভাবলে গা শিউরে ওঠে; ভবিষ্যত আর কল্পনাও করা যায় না। সুধা তাই ভাবে না, ভাবতে চায় না আর, কি হবে কি হতে পারে পরে। বর্তমানটাই তার কাছে বড়; তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। মরে যাওয়া রঙ সস্তা স্নো পাউডার দিয়ে ঘষে ঘষে মেজে তুলছে রোজ, চোখের কালি ঢাকছে চশমায়, মরা মাছের মতন নিষ্প্রভ চোখের তারায় জলুস আনতে সুধা আজ কাজল পরছে। যেন চুনসুরকি খসা, নোনা ধরা বাড়িতে চুণকাম করে আর তাপ্পি দিয়ে দিয়ে যতক্ষণ পারা যায় ভাড়াটে ধরে রাখার চেষ্টা।

সুধা জানে, জীবনটা তার ফুরিয়ে গেছে। পোকা ধরার মতন সে মরছে ডাল পালা শুকিয়ে, বিশ্রী কদাকার।

সংসার তাকে শুষে নিয়েছে, নেবে। ভালবাসা তাকে বঞ্চনা করেছে, করবে। সুচারু আর আসবে না। আসছি বলে বসিয়ে রেখে সে চলে গেছে। বরাবরের মতন।

সুধা আজ অফিস থেকে বেরিয়ে এই প্রথম তাদের অফিসের রবীন মজুমদারের সঙ্গে অযথা খানিকটা সময় ঘুরেছে। কেমন একটা জেদ চেপে গিয়েছিল। রোষ। বাড়ি ফিরতে মন চাইছিল না। সেখানে অশান্তি। তবু দু দণ্ড ভুলে থাকি। তার সঙ্গে চা খেয়েছে রেস্টুরেণ্টে; ঘুরেছে। ভাল লাগল না, বরং খারাপই লাগছিল। সুচারুর কথা মনে পড়ছিল বার বার। সত্যিই খারাপ লাগছিল সুধার।

ঘরের বাতিটা জ্বলে উঠল দপ্ করে। সুধা অন্ধকারের একাত্ম নির্জনতা থেকে আবার সংসারের আলোয় এসে পড়ল। ছটফটে ভাবটা হঠাৎ শান্ত হল। সুধা কাঠ হয়ে পড়ে থাকল, নড়ল চড়ল না একটুও। যেন সে অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধা শুনতে পাচ্ছিল, পানের বাটা টেনে কে যেন পান সাজতে বসলো।
মা—না আরতি? মা কি এসেছে এ-ঘরে!

কথা নেই কোনো। পানের বাটা সরিয়ে রেখে এবার ঘরের মেঝে ঝাট দিয়ে বিছানা পাতা হচ্ছিল। সুধা তার শব্দও শুনতে পাচ্ছে। মা বিছানা পাতছে নাকি—না আরতি?

কোনো কথা নেই। ঘরের মধ্যে যেন পরিচয়হীন, সম্পূর্ণ অজানা, অজ্ঞাত দুটি মানুষ পরস্পরকে উপেক্ষা করে নিজেদের মতন কাজ করে যাচ্ছে।

সুধা ঠোঁট কামড়ে চোখের জল সামলে নিজেকে আরও শক্ত কাঠ করে তুলছিল।

উনিশ

মাথার ওপর সূর্য উঠে এসেছে; রোদটুকু এখন নীচের তলায় ফাঁকা উঠোনে। পাঁচিল ঘেঁসে একপাশে এঁটো-কাঁটা বাসনপত্র; একটা কাক সেই ভাত খুঁটছে লাফিয়ে লাফিয়ে, ফর ফর করে উড়ে যাচ্ছে দোতলায়, আবার আসছে, ডাকছে কা-কা। বাড়িটা বেশ চুপ চাপ। বেলা বোধ হয় বারোটা বাজে—কি বেজে গেছে। গিরিজাপতি প্রেসে চলে গেছেন; নিখিল কলেজে, বাসু এখনও ফেরেনি।

রত্নময়ী কলঘরে। স্নান করছেন। আরতি রোদে পিঠ দিয়ে বসে; তার আর দিদির শাড়ি-জামা ফুটিয়েছিল সোডা-সাবান দিয়ে—আছড়ে আছড়ে কাচছে সেগুলো। ময়লা জল গড়িয়ে যাচ্ছে নালির দিকে।

আরতির ক'হাত দূরে বসে উমা, তেল মাখছে গায়ে হাতে; শাড়ি আড়াল দিয়ে বুকে-পিঠে। পৌষের খর-খরে শীতে খুব গা-হাত-পা ফেটেছে উমার। খসখস করে।

আরতি কাপড় কাচতে কাচতে আর উমা তেল মাখতে মাখতে তাদের অভ্যেসমতন গল্প করছিল। উমার গোড়ালি আর পা কি ভাবে ফেটেছে—রক্ত বেরোয়, জ্বালা আর ব্যথা করে কি রকম—উমা আরতিকে সে কথা বলছিল—আর তেল বুলোচ্ছিল ফাটায়।

'আমার পা ফাটে না—কিন্তু ঠোঁট একেবারে চিরুনীর মতন হয়ে যায় উমাদি। কর-কর করে, চামড়া খুঁটে খুঁটে দেখ না—কি হয়েছে! তেমনি গাল, ভীষণ ফাটে।'

'একটু করে নারকেলের তেল দিয়ে শুবি রাত্রে। চান করবার সময় সাবানের ফেনার সঙ্গে নারকেল তেল মিশিয়ে মাখলেও ফাটা কমে।' উমা বলল।

ওদিকে কলঘরে রত্নময়ীর স্নানের শব্দ। জল পড়ছে ছড় ছড়।

বাইরে কড়া নড়ে উঠল খটখট। উমা খালি গায়ের ওপর শাড়িটা আরও ঘন করে জড়িয়ে গলার পাশ দিয়ে টেনে নিল। বাসু—বাসু ফিরল। আরতি কাপড় খোবড়ানো বন্ধ করলে একটু।···দরজায় কড়া নাড়ার শব্দের সঙ্গে এবার একটা হাঁক ভেসে এল: চিঠি—চিঠি নিয়ে যান।

উমা উঠল। আরতি কাপড় কাচতে শুরু করল আবার। চিঠি মানে উমা-দিদের চিঠি। তাদের নয়। উমা-দিদের খুব চিঠি আসে। তাদের চিঠিপত্র ছ'মাসে বছরে একখানা যদি আসে। তাও আজকাল আর নয়।

আরতি কাপড়গুলো এবার চেপে নিঙড়োতে লাগল—ময়লা-কাটা জল গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল নালির দিকে।

উমা সদর খুলে চিঠি নিয়ে ফিরে আসছে। উঠোনের রোদে আসতে আসতে উমা বলল, 'তোদের চিঠি আরতি।'

আরতি মুখ তুলল। ডান হাতে একটা পোস্টকার্ড উমার।

'আমাদের—!' আরতির প্রথমেই মনে হল সুচারুদার কথা। সুচারুদা তাদের কত দিন আর চিঠি দেয় নি। কিন্তু সুচারুদার চিঠি ত অমন হয় না। 'দিদির চিঠি বুঝি উমাদি?'

'না; মাসিমার নাম লেখা।'

'মা-র চিঠি!' আরতি অবাক। এই প্রথম শুনছে সে জীবনে—মার নামে চিঠি এসেছে। তাড়াতাড়ি আঁচলে হাত মুছে ফেলল আরতি, 'কই দেখি।'

আরতির হাতে চিঠি দিয়ে উমা আবার রোদে বসল। বেশ লাগছে এই শীতের রোদটুকু। শিশি থেকে নারকেল তেল হাতে ঢেলে উমা মাথার চুলে ঘষতে লাগল।

আরতি বাস্তবিকই খুব অবাক। ঠিকানায় মার নাম লেখা: পরমকল্যাণীয়া শ্রীযুক্তা রত্নময়ী দেবী। ঠিকানাটাও এ-বাড়ির। আরতি উলটে-পালটে চিঠিটা দেখল। যেখান থেকে আসছে, যে লিখেছে তার নাম-ধাম সবই আছে—কিন্তু একটারও মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারল না আরতি।

'ও মা, তোমার নামে চিঠি এসেছে।' আরতি বিস্ময়ে আর বিহ্বলতায়

সুরে বলল। অপ্রত্যাশিত অসম্ভব ব্যাপারটা খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না তখনও।

'আমার নামে—?' কলঘর থেকে রত্নময়ী অবিশ্বাসের সুরে বললেন। মেয়েদের কথা আগে অতটা তাঁর কানে যায় নি।

'হ্যাঁ মা ; কত লিখেছে আবার—পরম কল্যাণীয়া শ্রীযুক্তা রত্নময়ী দেবী—' আরতি এবার মজা পেয়ে হাসছিল। লেখার ছাঁদটাও কেমনতর।

'দূর—! আমায় আবার কে লিখবে?' রত্নময়ী তবু বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, 'কোথা থেকে আসছে দেখ ত?'

পোস্টকার্ডের পিঠ উলটে আরতি জায়গার নামটা দেখল। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এত ক্ষুদে ক্ষুদে লেখা!

'কতনপুকুর ; থানা খণ্ড—খণ্ডঘোষ না ঘোষ লিখছে যেন বাবা, বুঝতে পারছি না ছাই। কি হাতের লেখার ছিরি!… বর্ধমান।'

'কতনপুকুর?' কলঘর থেকে আবার একটা বিস্ময় ধ্বনি। একটু চুপ। 'কে লিখেছে দেখ ত।'

জড়ানো অথচ পুরো নাম সই। অনেক কষ্টে নামটা আরতি উদ্ধার করল। 'নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।'

কলঘরের মধ্যে জল আছড়ে পড়ার শব্দ আর হচ্ছে না। স্নান করতে করতে থেমে থেমে গুণগুণ সুরে রত্নময়ী স্তোত্রর মতন কি একটা পাঠ করেন—সেই গুণগুণানিও থেমে গেছে।

আরতি চিঠিটা পড়ছিল। হাতের লেখার ধরনটা বামুন-পণ্ডিতদের মতন—কালিরও তেমনি রঙ, ভুষো কালো। অক্ষরগুলো না স্পষ্ট না সোজা-সোজা। প্রায় প্রত্যেকটি শব্দ বেশ কষ্ট করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সময় নিয়ে পড়ছিল আরতি মনে মনে।

ছাই-পাঁশ মাথামুণ্ডু কি যে লিখেছে লোকটা তার মানেও বুঝছিল না আরতি। দু-তিন লাইন পড়ে রত্নময়ীর উদ্দেশে বলল, 'নারাণচন্দ্র কে মা?'

কলঘর থেকে এবার সংক্ষিপ্ত জবাব এল, 'চিঠিটা রাখ, যাচ্ছি।'

আরতি ঘাড় মাথা এ-পাশ সে-পাশে হেলিয়ে অনেক কষ্টে আরও একটা

লাইন পড়ল। 'এটা কি লিখেছে দেখো ত উমাদি?' আরতি উমাকে একটা জায়গা দেখাল।

ঠাওর করে অক্ষরটা ধরতে উমা হিমসিম। বলল, 'মোহিত—ওটা 'হ'।

'তারপর—?'

'তাহার ক—কন্যা।'

'কন্যা? যাঃ!' আরতির প্রথমে ঘোরতর সন্দেহ, তারপর ভীষণ কৌতূহল। উমার পিঠের পাশ দিয়ে মুখ আরও ঝুঁকিয়ে দিলে। দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ। 'মীনুদির কথা কি লিখেছে?

উমা মুখ ফেরাতে পারছিল না; আরতি তার গালের পাশ দিয়ে মাথাটা এমনভাবে বাড়িয়েছে যে একটুও মুখ সরানো যায় না।

রত্নময়ী কলঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ভেজা নেঙড়ানো কাপড় গায়ে জড়ানো; গামছাটা বুকের ওপর।

আরতি চিঠি হাতে পিঠ সোজা করে তাকাল।

'মীনুদির কথা লিখেছে মা! কে লোকটা?'

'মীনু—!'

'হ্যাঁ, লিখেছে—স্পষ্ট লিখেছে।'

'নাকি, তবে তোর বিয়ের সম্বন্ধ করেছে বোধ হয় মীনু।' রত্নময়ীর এই তরল হাসিটা খুব সরল নয়। অন্যমনস্কতার সঙ্গে সামান্য যেন দায়সারা কৌতুক। 'চিঠিটা নিয়ে আয়—' রত্নময়ী পুজোর ক্ষুদে ক্ষুদে ক'টা বাসন হাতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

আরতি মার পিছু ধরল। 'তুমি চান করে নাও, উমাদি। দেরি করো না আর। তুমি বেরুবে আর আমি ঢুকবো; ধোয়া কাচা আছে আমার।'

ওপরে এসে রত্নময়ী ঠাকুরের বাসন রাখলেন, ভিজে কাপড় ছাড়লেন। তারপর বাইরে বারান্দায় রোদে এসে দাঁড়ালেন। তারের ওপর ভিজে থান মেলে দিয়ে গামছায় ভাল করে চুল মুছতে মুছতে বললেন, 'রতনপুকুর আমাদের দেশের বাড়ির কাছে—এই পাশাপাশি গ্রাম।'

আরতি চিঠির আরও খানিকটা পড়ে ফেলেছে। সব কথা ধরতে পারেনি,

বুঝতে পারে নি—তবু মোটামুটি অনুমান করে নিয়ে বাদ দিয়ে দিয়ে প্রায় আধখানা চিঠি তার পড়া হয়ে গেছে। আর কেমন এক হেঁয়ালির মতন লাগছিল ব্যাপারটা। এত বেশি রকম হেঁয়ালি যে, চিঠিখানা নিছক এক গোলকধাঁধার খেলা বলে মনে হচ্ছিল।

'কি লিখেছেন পড় ত?' রোদে গামছা মেলে দিয়ে রত্নময়ী আরতির সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'যা হাতের লেখা আর পিঁপড়ের পা—অর্ধেক কথা পড়াই যায় না।' আরতি বলল, 'হাবিজাবি কি সব লিখেছে! নারায়ণচন্দ্র কে মা?'

'অমন অছেদ্দা করছিস কি রে মুখপুড়ি, উনি যে সম্পর্কে আমার ভাসুর হন। তোদের জেঠামশাই; পড় কি লিখেছেন?'

আরতি পড়ছিল: পরমকল্যাণীয়া বউমা—শুভাশীর্বাদ-পূর্বক সমাচার এই যে, গুরুকৃপায় তোমাদের বিষয় অবগত হইয়া এই পত্র লিখিতেছি। তোমাদের সোনাটি গ্রামে শ্রীমান মোহিতের সহিত আমার কয়েকবারই সাক্ষাৎ হইয়াছে। বৎসরাধিক হইল তাহার বিধবা কন্যা এখানে; বাড়িঘর সারাইয়া উহারা গ্রামে বাস করিতেছে। মোহিত অবশ্য ব্যবসা ও কাজকর্মের জন্য কলিকাতায় অধিকাংশ সময়ে থাকে, মাঝে মাঝে গ্রামে আসে। তাহাদের নিকট হইতে তোমাদের সকল বিষয় অবগত হইয়াছি এবং ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া এই আবশ্যকীয় পত্র দিতেছি।

আমাদের কালিকিংকর গত এগারোই পৌষ মঙ্গলবার রাত্রে গত হইয়াছে। তাহার কন্যা যে তোমাদের নিজের সন্তানের মতন তাহা আমি জানি। শুনিলাম কন্যাটি বয়স্থা হইয়াছে। কালিকিংকর এখন মৃত; তাহার দুষ্কর্মের কথা তুলিব না। তুমি সকলই জান। কালির তিন সংসারের মধ্যে দুই সংসারই গত। একটি সংসারের বিষয় আমরা কিছু জানি না। তবে কালির মুখে শুনিয়াছি—কোনো সম্পর্ক সে-সংসারের সহিত কোনো-কালেই ছিল না। পার্বতীর গর্ভজাত কন্যাটি তাহার একমাত্র সন্তান। হতভাগা মৃত্যুর পূর্বে আমার হাত-পা ধরিয়া বড়ই কাঁদাকাটা করিয়াছে। অশেষ শোক তাপ লইয়া বেচারী মারা যায়।

ঈশ্বর যাহা করিবার করিয়াছেন। আমরা নিজেরাই কতটুকুই বা বুঝি। কালির শেষ ইচ্ছা ছিল—এবং আমারও ইচ্ছা এই যে, হতভাগ্য মানুষটার পরকালের শান্তির জন্য তাহার অশৌচ পালন শ্রাদ্ধাদি সকল পারলৌকিক কর্ম তাহার একমাত্র সন্তান—কন্যার দ্বারা কৃত হয়। সদ্বংশজাত কুলীন ব্রাহ্মণের পিতৃপুরুষের ও তাহার নিজের সদ্‌গতি না হইলে............"

কেমন একটা আচমকা শব্দে আরতি চিঠি থেকে মুখ তুলে মার দিকে তাকাল। ভীষণ এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে রত্নময়ী যেন ভীত একটা শব্দ করে উঠেছিলেন। এখন পাথরের মতন দাঁড়িয়ে আছেন। পিঠ আর মাথার ওপর গাঢ় রোদ; মুখের দিকটায় ছায়া। চোখের পাতা স্থির, একবারও পলক পড়ছে না, কালচে মণি দুটি আরতির মুখে স্থির হয়ে আছে, একটু নড়ছে না, সরছে না—নিষ্প্রাণ, কঠিন। মুখের ওপর কিসের যেন ভয়ঙ্কর এক আতংক ছোবল মেরেছে। সারাটা মুখ পাংশু, পাথর, কালশিরে পড়ে নীলচে নীলচে হয়ে আসছে যেন চোয়ালের খানিকটা জায়গা। ঠোঁট ফাঁক। রত্নময়ী নিশ্বাস নিচ্ছেন বলে মনে হয় না। হাত ঝুলে আছে; পা কাঠ। মনে হয় রত্নময়ী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন মরে গেছেন, গায়ে একটু ঠেলা দিলেই মাটিতে পড়ে যাবেন কাঠ শরীরটা নিয়ে।

আরতি ভয় পেয়ে গেল। 'মা—ওমা, কি হল তোমার?'

কোনো সাড়া নেই; স্পন্দন নেই।

'মা—' আরতি এবার রীতিমত ভয় পেয়ে ছেলেমানুষের মতন রত্নময়ীকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাপ্টে ধরল।

চমকে উঠলেন রত্নময়ী, চেতনা যেন ফিরে পেলেন। মৃত ভাবটা তরল হয়ে এবার ভীষণ এক বিহ্বল বিমূঢ় ভাব ফুটে উঠল আস্তে আস্তে।... নিশ্বাস ফেললেন। চোখের পাতা পড়ল, নড়ল। আরতির মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। 'চিঠিটা দে—' রত্নময়ী খুব আড়ষ্টভাবে হাত পাতলেন।

দিয়ে দিল আরতি চিঠিটা। তার নিজেরও কেমন বেহুঁশ বিশ্রী লাগছিল। কিছু স্পষ্ট বুঝছে না, আধখাপচাভাবে এটা সেটা বুঝতে পেরে

গোটা হেঁয়ালিটাই তার কাছে ভয়ের মতন ঠেকছে। তার ওপর মা-র এই কেমন হয়ে যাওয়া।

'তুমি অমন করে উঠলে কেন মা, কি লিখেছে তোমার ভাসুর?'

আরতির কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন রত্নময়ী। এলোমেলো ভাসা-ভাসা অস্পষ্ট গলায় বললেন, 'বুড়ো হয়েছেন এখন—মাথাও ঠিক নেই—' রত্নময়ী ঘরের দিকে পা বাড়ালেন, 'যা—যা—তুই চান করে নি গে যা।'

আরতি খানিকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নীচে নেমে গেল।

ঘরের চৌকাটের কাছে এসে রত্নময়ীর মাথাটা আচমকা ঘুরে গেল। কোনো রকম দিশে করতে পারলেন না। মনে হল, সব টাল-মাটাল হয়ে ঘুরে যাচ্ছে—তিনিও হাল্‌কা হয়ে পাক খেয়ে যাচ্ছেন। হাত বাড়িয়ে চৌকাটটা ধরে ফেললেন।

ঘুরনটা কেটে গেলে আস্তে করে পা বাড়ালেন ঘরের মধ্যে। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখলেন, আরতি নীচে নেমে যাচ্ছে। পায়ে আর জোর পাচ্ছিলেন না রত্নময়ী, টলে যাচ্ছিল; চোখে সব ঝাপসা দেখছিলেন; মাথার মধ্যে অনেকগুলো ছেঁড়া-ফাটা ফ্যাকাশে টুকরো ছবি ক্রমাগত ঘুরছিল, বুক ধড়ফড় করতে শুরু করল এবার।

বিছানায় এসে বসে পড়লেন রত্নময়ী। চিঠিটা হাতে করে। বসে থাকতে থাকতে মনে হল, বুকের কোথায় অসাড় হয়ে আসছে। চোখে কিছু ঠাওর করা যাচ্ছে না। রত্নময়ী ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে শুয়ে পড়লেন কাত হয়ে।

কতক্ষণ যে এইভাবে চেতনার আবিল স্রোতের মধ্যে বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে কাটল, রত্নময়ী খেয়াল করতে পারলেন না। অর্ধেক সময়েরও বেশি চোখ বুজে মাথার ওপরকার ধসা বালি-খসা ছাদ আর গাঢ় ধোঁয়াটে ময়লা কড়ি-কাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটু জোর খুঁজে নিলেন। এর মধ্যে কখন যে বাসু বাড়ি এসেছে, শিস্ দিতে দিতে নীচে নেমে যাচ্ছে স্নান করতে রত্নময়ী জানতে পারেন নি। তার গলার স্বর এবার কানে গেল।

বিছানায় বসে এবার অনেক কষ্টে চিঠিটা আগাগোড়া পড়লেন। সব কথা

স্পষ্ট ধরতে পারলেন না; অনুমান করে নিলেন। মোট কথাটা তাঁর অনেক আগেই জানা হয়ে গেছে। আরতির জন্মদাতা পিতা মারা গেছে।

বড়ঠাকুর সব কিছুই বুঝিয়ে লিখেছেন। পার্বতীর স্বামী কালিকিংকর যতই অসৎ বদমাস বাটপাড় হোক, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর নামে কলঙ্ক রটিয়ে তাড়িয়ে দিক না কেন বাড়ি থেকে—তবু দানপত্র বা জোর যুক্তি করে মেয়েকে রত্নময়ীদের দিয়ে দেন নি। পিতৃত্বের দাবী কালিকিংকরের পুরোপুরি আছে। সামাজিক আর ধর্মের দাবিতে মেয়ের কাছ থেকে পরলোকের কড়ি গুণে নিতে চায়। কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের ক্রিয়াকর্ম ধর্ম আচারের সর্বনাশ করা যায় না। এ যে মহাপাপ, চতুর্দশ পুরুষ নরকগামী হবে। পার্বতীর বরের গতি হবে না, তার আত্মা মুক্ত হবে না, শান্তি পাবে না।

না পাক্…রত্নময়ী হঠাৎ শক্ত কঠিন হয়ে উঠলেন। পার্বতীর বর নরকেই যাক আর যেখানেই যাক—তার মুক্তি হয় না-হয়, তাদের চৌদ্দ পুরুষের কি হবে না-হবে তাতে কিছু যায় আসে না রত্নময়ীর। না, পার্বতীর স্বামী কালিকিংকর আরতির বাবা নয়। আরতির বাবা চন্দ্রকান্ত, মা রত্নময়ী। এ-ছাড়া এ-সংসারে আরতির আর কেউ নেই। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করতে লাগল রত্নময়ীর। বড়ঠাকুরকে মনে হল, সত্যি মাথা খারাপ; ভীমরতি ধরেছে ওঁর—তাই পনের বছর পরে একটা চিঠি লিখে আরতির কুলবংশকে উদ্ধার করতে গেছেন।

বড়ঠাকুরের আত্মীয়তা না দেখালেও চলত। কোনো দরকার ছিল না। যখন তাঁর দূর সম্পর্কের ভাই কালিকিংকর পার্বতীর মতন অমন শান্ত লক্ষ্মী অভাগী মেয়েটাকে পোয়াতী অবস্থায় কুৎসা আর কলঙ্ক রটিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়—কোথায় ছিল বড়ঠাকুরের এই ধর্মজ্ঞান? পার্বতীর যখন মাথার গণ্ডগোল শুরু হল, কোথায় ছিলেন বড়ঠাকুর? আরতির জন্মের পর পার্বতীও বদ্ধ পাগল। আঁতুড়েই মেয়ের গলা টিপে দিতে গিয়েছিল; রত্নময়ী সেই সাংঘাতিক পাগলের পাশ থেকে মেয়েকে তুলে এনে নিজের বুকের পাশটিতে রাখলেন। সেই যে আনলেন, আর কোনোদিন দিলেন না কাউকে, দিতে সাহস হল না। আরতির জন্মের মাস দুইয়ের মধ্যে পার্বতী

মারা গেল। কেউ এল না হাত বাড়িয়ে আরতিকে নিতে, রত্নময়ীও বুক ছাড়া করলেন না। সেই থেকে আজ পর্যন্ত যে-মেয়ে তাঁর বুকের ঠাঁইজোড়া হয়ে মানুষ—তাকে নতুন করে মা-বাপ চিনতে হবে!

রত্নময়ীর বুক গলা জমাট হয়ে কান্না উথলে উঠছিল। জল পড়ছিল চোখ বেয়ে গাল ভিজিয়ে।

বাসুর স্নান সারা হয়েছে, আরতিরও। আরতি সাবানকাচা শাড়ি জামা রোদে মেলে দিয়েছে। টসটস করে জল পড়ছে এখনও চুল বেয়ে। মুখটা ভেজা, জলজল—কিন্তু টলটল করছে। চোখে একটু বিহ্বলতা, বিস্ময়-কৌতুহল। আনমনা ভাবও আছে। রত্নময়ী লক্ষ্য করে দেখলেন। মনে হয় না, ও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। আহা! না বোঝে যেন।

বারান্দায় কুলোর ওপর কুচোনো বাঁধাকপির পাতা শুকোচ্ছে রোদে। রত্নময়ী আঙুলে ঘেঁটে চারপাশে ছড়িয়ে দিলেন আরও। উবু হয়ে বসে হাঁটুর ওপর থুতনী বেঁকিয়ে চোরা-চোখে আরতিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। আরতি মাথার চুল ঝাড়ছে গামছা দিয়ে। বাসু একটু দূরে রোদে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে। রত্নময়ীর চোখে রোজকার এই গার্হস্থ্য ছবি—আজ অন্য এক চেহারা নিয়ে ধরা দিল। সংসারের এত সাধারণের মধ্যে কোথায় কখন যে কি লুকিয়ে থাকে! শীতের রোদ, ছোট্ট ছাদ—মা, দুই ভাই-বোন পাশাপাশি···। রত্নময়ীর চোখে জল এসে পড়ল।

মনের ভেতরটা যে কেমন হচ্ছে রত্নময়ীর—সেই তখন থেকে। ফাঁকা অথচ কিসের ভয়ে যেন ছমছমে।

'কই মা, খেতে দাও—বেলা দুটো যে বাজতে চলল।' বাসু অসহিষ্ণু।

'বোস না গিয়ে। আরতিরও হয়ে গেছে। একসঙ্গে দেব। নে তাড়াতাড়ি কর দিকি তুই।' রত্নময়ী উঠতে উঠতে আরতিকে বললেন।

'তুমি ভাত বাড়ো, চুলটা আঁচড়ে আসছি এখুনি।' আরতি তারের ওপর গামছাটা মেলে দিয়ে ঘরের দিকে চলে গেল।

রত্নময়ী আবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। খাটো পুরু শাড়ি, কন্‌ট্রোলের

কেনা, কোমরের কাছে পাক দিয়ে পরেছে আরতি—, গায়ে লংক্লথের জামা। বাড়ন্ত ও পুরন্ত শরীরটায় চমৎকার ঢল নেমেছে মেয়েটার। জন্মেছিল যখন, তখন টিং টিংয়ে রোগা—কাঠি একেবারে। আর কালচে। বড্ড খাই খাই ছিল মেয়েটার ; সারাটা দিন দিন ট্যাঁ-ট্যাঁ—মাই মুখে দাও, সঙ্গে-সঙ্গে চুপ। রত্নময়ীর স্পষ্ট মনে পড়ল সেই দিনগুলোর কথা—বান্নু তখন বছর চারেকের—ওই বুড়ো দামড়ার মাই খাওয়ার জ্বালায় বুকের দুধ ফুরিয়েও তখন একটু একটু আছে। আরতি তাতে ভাগ বসালো। যেন শেষটুকু ছিল তারই জন্যে। আরতির জিব ঠোঁটের ছোঁয়ায় আবার করে বুক আধভরা হয়ে উঠল। মেয়েটার বড় মাই-নেশা ছিল। দুধ নেই তবু ছ-বছর বয়স পর্যন্ত খুঁটেছে, কামড়েছে। আ, ছ-বছর ত কোন ছার—সেদিন পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে বসে বসে যখন তখন মার বুক খুঁটত। সুধার ধমক-ধামকে এখন গেছে। সেই মেয়ে আজ পনেরো বছর পার করে ষোলয় চলেছে। ভাবতেও কেমন লাগে! বেশ চেহারা হচ্ছে মেয়েটার। সুধা বান্নুর মতন মাজা ফরসা রঙ নয়, অমন লম্বা ধরনের আদল নয় মুখের, টিকলো নাকও নয় —তবু আরতির মুখের গড়নটি সুশ্রী, চোখ দুটি বড় সুন্দর, এমন ঘন আর কালো ভুরু, দাঁতের ঠোঁটের ছাঁদটিও বড় চমৎকার। মেয়েটার মাথায় খুব চুল। শরীরও কেমন ভরে এসেছে। আগে মনে হত মেয়েটা বুঝি রোগাটে থাকবে। তা নয়, বয়সে শুধরে গেছে।

রান্নাঘরে এসে ভাত বাড়তে বসলেন রত্নময়ী।

অন্যদিন দুপুরে মাদুরটা ঢাকা বারান্দায় পেতে ছায়ায় মাথা রেখে খানিকটা গড়াগড়ি করতেন রত্নময়ী, সামান্য তন্দ্রা আসত, রোদের রঙ ফিকে হয়ে এলে উঠে বসতেন—এক এক করে ছোট-খাটো কাজগুলো সারতেন। আজ আর হাত-পা উঠছিল না ; মন শান্ত স্থির বা নিরুদ্বেগ নয়। আরতিকে নীচে উমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন ছুতো করে।

আরতি নীচে। বান্নু আবার কোথায় আড্ডা দিতে বেরিয়ে গেছে। বাড়িটা একেবারে চুপচাপ নিঃঝুম। কাক আর চড়ুইয়ের উড়োউড়ি ঝটাপটি

কিচকিচ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। গলিতে কখনও ফেরিঅলার হাঁক, দূর থেকে ট্রাম চলে যাওয়ার ঘড়ঘড়ানি আওয়াজ।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও বার দুই-তিন বড়ঠাকুরের চিঠিটা পড়েছেন রত্নময়ী। প্রথম প্রথম বড়ঠাকুরের ওপর যতটা রাগ হয়েছিল, অশ্রদ্ধা জেগেছিল, বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন—এখন তার উগ্র ভাবটা অনেক কমেছে।

রত্নময়ী এখন বুঝতে পারলেন, বড়ঠাকুর মানুষটি নিতান্ত দায়ে পড়ে কর্তব্যের খাতিরে চিঠিটা লিখেছেন। সম্পর্কে তিনি যেমন রত্নময়ীর ভাসুর হন—তেমন পার্বতীরও। পাশাপাশি গ্রামের পরিজন সব—আত্মীয়তা লতায় পাতায় জড়িয়ে আছে। বড়ঠাকুর নিজে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, গোঁড়া—এবং মানমান্যির মানুষ। বয়স হয়েছে বেশ। এখন বোধ হয় ষাট পেরিয়ে গেছেন। পার্বতীর স্বামীবংশ—শ্বশুরবংশ পারলৌকিক কর্মের ত্রুটিতে দোষণীয় হয়ে থাকবে—এই চিন্তা খুব খারাপ লেগেছে তাঁর। বিশেষ করে পার্বতীর স্বামী মরার আগে যদি বড় ঠাকুরের হাত-পা ধরে কাঁদা-কাটা করে থাকে—মেয়ের হাতের জল পিণ্ডি চেয়ে থাকে—বড়ঠাকুর সেটা না জানিয়ে স্বস্তি পান কি করে!

দশ রকম ভাবতে ভাবতে রত্নময়ীর এখন মনে হচ্ছে বড়ঠাকুরের একটি কথা খুবই সত্যি, বাস্তবিকই সন্তানের কাছে পিতৃমাতৃ কর্মের চেয়ে নিষ্ঠার বেদনার মঙ্গল কামনার সদ্গতি-শান্তির প্রার্থনা আর কি আছে? কিছু না, কিছুই না। আর সারা জীবনে একটি বারই বাপ-মার জন্যে এই শাস্ত্রীয় কর্তব্যটুকু!

বাসু যদি রত্নময়ীর মৃত্যুর পর অশৌচ পালন শ্রাদ্ধ কিছু না করে? যদি সুধা···? রত্নময়ী ভাবতে পারলেন না। মাথা নাড়লেন আপন মনেই। না না, এ-সব কথা ভাবা যায় না। এর চেয়ে বড় অবজ্ঞা পাপ কিছু হয় না।

রত্নময়ীর মনের মধ্যে অস্বস্তির যে কাঁটাটা সেই চিঠি পড়ার পর-পরই ফুটে গেছে তা আর উঠছে না। তখন থেকে ক্রমাগত—ক্রমাগতই খচখচ করছে। তাঁর নিজের অজান্তেই অন্য এক রত্নময়ী আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে একটা জায়গা দখল করে নিচ্ছে। সে-রত্নময়ী ধর্ম ও ঈশ্বর, স্বর্গ-নরক, পাপপুণ্য বিশ্বাসী হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে। গোঁড়া, শুচিশীলা। বহু সংস্কারিক কর্তব্য-অকর্তব্য,

ন্যায়-অন্যায় যাঁর রক্তে চল্লিশ বছর ধরে মিশে আছে। জন্ম থেকে যিনি আচারিত নিয়মগুলি পালন করেছেন, বিশ্বাস করেছেন। এখন সেই বিশ্বাস, সংস্কার, ধর্ম, পিতৃপুরুষের আচার-আচরণ, মঙ্গল-অমঙ্গল চিন্তা, ভয়, দুর্বলতা—রত্নময়ীকে চারপাশ থেকে চেপে ধরছিল, শাসিয়ে উঠছিল।

আবার অন্য রত্নময়ীও সমান কঠিন, সমান দুর্বল। গর্ভের মেয়ে নয় বলে, রক্তের সম্পর্ক নেই বলেই—আজ পনেরো বছর ধরে মানুষ করা মেয়ে পর হয়ে হয়ে যাবে? প্রসবের বেদনা তিনি পান নি যে-মেয়ের জন্যে সে কি নিজের নয়? দু-দিনের প্রসব বেদনা, বা দশ মাসের গর্ভধারণের চেয়ে এই পনেরো বছর ধরে সমানে শত রকমের দুঃখ-কষ্ট উদ্বেগ সহ্য করে যাওয়া কি কম? আর সুখই বা নয় কেন? আরতি কি তাঁকে আনন্দ সুখ হাসি যুগিয়ে দেয় নি? ওই মেয়েকে নিয়ে কতদিন কতভাবে মন ভরে উঠেছে, কত আরাম আর আদর গুড়োগুঁড়ো হয়ে মাখামাখি হয়ে গেছে! তাঁদের স্বামী-স্ত্রীতে এই মেয়েকে নিয়ে কত দাম্পত্য পরিহাস—কখনও বা মান-অভিমান; সে-সব কথা রত্নময়ীর মনের ঝাঁপিতে আজও সঞ্চিত রয়েছে। বের করে গুণে গুণে দেখার মতন নয় সব জিনিস। কিন্তু সবই আছে, সবই থাকবে—।

রত্নময়ী ভেবে পাচ্ছিলেন না, কি করে আরতিকে এই নিষ্ঠুর সত্য কথাটা জানানো যায়। কি করে তাকে বলা যায়, বোঝান যায়, আমি তোর মা নই আরতি, বাসু সুধার বাবা তোর বাবা নয়। তোর মার নাম পার্বতী, বাবার নাম কালিকিংকর মুখোপাধ্যায়। তোর পদবী গোত্র সবই আলাদা।

আরতিকে এ-কথা বলা অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। সে বিশ্বাস করবে না। ভাববে মা-র মাথা খারাপ হয়ে গেছে। হয়ত শুধোবে, মা নয় ত তুমি আমার কে? আমার বাবা যদি অন্য লোক তবে—দাদা দিদির বাবা স্বর্গে গেলে আমি অত কেন কেঁদেছিলুম, কেন দাদা দিদির মতন সব কিছু মেনেছি...! সবকিছু মানতে অবশ্য রত্নময়ী তখনও ঠিক দেননি। উনিশ বিশ ছিল সুধার সঙ্গে। ছোট বলে আরতির অত কিছু বোঝার উপায় ছিল না। কিন্তু সে-দিনই বা এই পার্থক্য কেন রেখেছিলেন রত্নময়ী?

রত্নময়ী আর ভাবতে পারছিলেন না। মাথা গরম হয়ে উঠছিল যন্ত্রণা

হচ্ছিল। দম আটকে আসছিল বুকে। নিজেকে বড় অসহায়, আকুল মনে হচ্ছিল। সুধা না আসা পর্যন্ত এইভাবে তাঁকে উদ্বেগ নিয়ে থাকতে হবে। ও এলে তারপর পরামর্শ করবেন—কি করা যায়, কি করা উচিত।

দুপুর ফুরলো। বিকেল হল। জল এল কলে। সংসারের কাজকর্ম সবই পড়ে আছে। অসাড় শরীরটা টেনে তুলে কাজকর্মে হাত দিলেন রত্নময়ী। আরতিকে ডাকলেন। ঘর দোর ঝাঁট দিতে বললেন, নিজে এঁটো বাসন নিয়ে বসলেন।

মার মুখের ভাব-ভঙ্গি দেখে আরতির সন্দেহটা আরও ঘন হয়েছে। চিঠিটায় নিশ্চয় কিছু খারাপ কথা লেখা ছিল—যা পড়ার পর মার মনটন মুষড়ে পড়েছে। একটা লোক মারা গেছে—আরতি চিঠি পড়ে তা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তার সঙ্গে কি সম্পর্ক মার, কিইবা সম্পর্ক তাদের, আরতি কিছুই দিশে করতে পারছিল না। কিন্তু কেমন একটা অন্যমনস্ক অথচ ভয় ভয় ভাব তারও হয়েছে। মাকে কয়েক বারই আরতি শুধিয়েছে, কিসের চিঠি মা—কালিকিংকর কে, পার্বতী কে—শ্রাদ্ধট্রাদ্ধ ও-সব কি লিখেছে!

আরতির কথার জবাব দেয় নি মা। কখনও কথা কানে না-তুলে, কখনও বিরক্ত হয়ে কিছু বলে পাশ কাটিয়ে গেছে।···দাদাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল আরতি। দাদাও কিছু জানে না। বললে, 'দূর কোনো পাগল টাগল ভুল ঠিকানায় চিঠি দিয়েছে।'

যাই হোক, চিঠিটা যে ভাল খবরের নয়—বরং ঠিক উলটো, মন্দ কিছুর—আরতি তা বুঝেছিল। এবং দুর্জ্ঞেয় এক ভয় তাকে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল।

শীতের বিকেল ফুরল। সন্ধ্যে হল। রত্নময়ী সন্ধ্যে দিলেন। স্বামীর ছবির কাছে প্রদীপ দেখিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে ছোট মেয়ের মতন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

তুমি বলো, আমি কি করি! ও ত তোমারও মেয়ে ছিল, একা আমার নয়। তোমারই বেশি···। রত্নময়ী বিড়বিড় করে বললেন। কিন্তু জবাব

নেই। চন্দ্রকান্ত তাঁর ছবির নিথর চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন শুধু। কী নিষ্ঠুর! সব দায় দায়িত্ব আপদ বিপদ কষ্ট দুঃখ সহ্য করার জন্যে রত্নময়ীকে রেখে দিয়ে দিব্যি চলে গেছেন।

সুধা অফিস থেকে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে চা জলখাবার খেতে এল। রত্নময়ী তার আগেই পড়ার তাগাদা দিয়ে আরতিকে নীচে পাঠিয়েছেন।

সুধার চা খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে, রত্নময়ী কৌটা-বাটার ফাঁক থেকে লুকনো চিঠিটা বের করে মেয়েকে দিলেন। বললেন, 'পড়। আজ এসেছে।'

চিঠিটা পড়ল সুধা। একবার নয়—বার দুই। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মুখ তুলে মার দিকে চাইল; অস্পষ্ট জড়ানো কথাও বলল দু একবার। তারপর নিশ্চল হয়ে মার মুখোমুখি বসে থাকল। রান্নাঘরের হলুদ টিমটিমে বাতিটা শুধু মা মেয়ের স্তব্ধ পাথর করুণ মুখের আর এক সঙ্গী হয়ে জ্বলতে লাগল।

সুধা বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে চলে গেল। খোলা বারান্দায়, শীতে কুয়াশায়—অন্ধকারে এসে দাঁড়াল। চোখ তুলে আকাশটা দেখল।

কথাটা সুধা ভুলেই গিয়েছিল। আরতি যে তার বোন নয় এই সত্যটা তার মনে পড়ত না। কখনও ভেবে দেখে নি, কোনো দিনও না। এ-বাড়িতে কথাটা ভাববার মতন কারণ ঘটে নি কখনও। আজ সুধা নিজের সেই ছ' সাত বছরের স্মৃতিকে উদ্ধার করতে গিয়েও পারল না। শুধু মনে পড়ল, খুব অস্পষ্ট ভাবে—ছোট্ট একটা মেয়ে আর আঁতুড় ঘর—পার্বতী মাসি। মনে নেই পার্বতী মাসিকে। শুধু নামটা মনে আছে।

সুধার গলার কাছে একটা টনটনে বাতাস ঠেলে ঠেলে উঠছিল। কষ্ট আর কান্না জমছিল।

আরতি যে তার সহোদরা নয়—এই জ্ঞানটা মাত্র কোথায় মনের কোন তলায় চাপা পড়েছিল সুধার, কিন্তু সজ্ঞানে অভ্যাসে, চিন্তায় ভাবনায়—কোনোদিন তার ছায়া পড়ে নি। পড়ার কথাও নয়। সুধা তবু কথাটা জানে—বাসু তাও না। বাসুর তিন চার বছর বয়সে আরতি মা-র কোলে

এসেছে—কাজেই সবই তার অজানা। আর জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এ-বাড়িতে কোনোদিন বাবা-মার মধ্যে এমন কোনো সামান্য কথা হয় নি বা আচরণ প্রকাশ পায় নি—যার থেকে ছেলে মেয়েরা কিছু আন্দাজ করবে। বরং ওরা দেখেছে, আরতি বাবার যত স্নেহ আদর পেয়েছে এমন ওরা নয়; মা আঁচলে গিঁট বেঁধে রাখার মতন করে বেঁধে রেখেছে আরতিকে। তাদের মা বাবার সবটুকু স্নেহ ভালবাসা আদর নিঃশেষ করে যে-মেয়ে বড় হয়ে উঠছে—সে যে এ-বাড়ির তাদের ভাইবোনের আর একজন নয়—এ-কথা কি করে ভাবা যায়! যায় না।

সুধা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যে এক কষ্ট পাচ্ছিল, তা জানতে পারল না, বুঝতে পারল না।

কখন আবার মার কাছে এসে বসেছে সুধা।

রত্নময়ী হাতের কাজ করে যাচ্ছিলেন যন্ত্রের মতন। কথা বললেন না অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে করে শুধোলেন, 'কি করি বল ত?'

সুধা বঁটি টেনে নিয়ে অযথা একটা ফুলকপির ডাঁটা কুচোতে লাগল। মুখ হাঁটুতে চেপে রেখেছে।

'এ-কথা জানলে ত মেয়ে এখন কেঁদেকেটে একসা করবে।' রত্নময়ী জড়ানো গলায় বললেন।

'দরকার কি বলে!' সুধা বলল।

'বলতে কি চাই রে, কিন্তু—তবু যে কেমন খটকা লাগে—' রত্নময়ীর ব্যাকুলতা এবং উদ্বেগ স্পষ্ট, 'হাজার হোক ওর বাপ। ছেলেপুলে আর কেউ কোথাও নেই তার। শ্রাদ্ধ শান্তি না করলে—'

'মুখাগ্নি করেছে যে সেই করুক—!'

'তা হয় না; মেয়ে যখন রয়েছে। তাও আবার আইবুড়ো। শ্রাদ্ধ শান্তি না করলে দোষ পাবে।' রত্নময়ী বললেন ধীরে ধীরে, 'আমাদের এই অবস্থা—আমিও ত ছেলেপুলের মা। সংসারের ভাল মন্দ আছে; দোষ খুঁত রাখতে ভয় হয়।'

খানিকটা চুপচাপ। রত্নময়ী আবার বললেন, 'আমি অনেক ভেবেছি।

আজ এ-কথা লুকিয়ে রাখলেও চিরকাল পারা যাবে না! এ-সব কথা কখন কোন বাতাসে আসে। ওর বিয়ে-থার সময়...' রত্নময়ী আর কথাটা শেষ করলেন না।

সুধা যেন নদীর জলে ঘূর্ণিতে পড়েছে। কিছুই ভাবতে পারছে না, ঠাওর করতে পারছে না—পথ খুঁজে পাচ্ছে না—শুধু জলের পাক খাওয়া টানে তলিয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল।

রত্নময়ীর মুখের দিকে আলস্যের চোখে তাকাল সুধা। রান্নাঘরের মিটমিট হলুদ মতন আলো, ঝুল আর ধোঁয়া জমে জমে কালো তেল হয়ে যাওয়া চিটচিটে দেওয়াল—কৌটো-বাটা, হাঁড়ি কড়াই—এর মধ্যে মা-কে এখন আর-একটা অক্ষম আসবাবের মতন দেখাচ্ছিল।

বিয়ে থা—সুধার মনে ফিকে একটা হাসি ভেসে যেতে যেতে হঠাৎ কিসে বাধা পেয়ে থামল। চিঠির কথা মনে পড়ল। ভাবনাটা বার কয়েক একই জায়গায় পাক খেল।

'খারাপ ভাল দুই-ই হল আরতির।' সুধা মন-মরা ভাবটা কাটিয়ে একটু সহজ, বিচক্ষণ হয়ে বলল।

'ভাল—ভালটা কিসের?' রত্নময়ী তাকালেন।

'ভাল নয়! ওর বাপ ওকে জমিজায়গা ঘর বাড়ি সবই ত দিয়ে গেছে।'

রত্নময়ী হঠাৎ নতুন কোনো কথা শুনছেন এমন চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, কথাটা ত ঠিকই। বড়ঠাকুর লিখেছেন বটে, আরতির বাবা তার সামান্য যা জমিজায়গা ভিটেমাটি আছে সবই আরতিকে দিয়ে গেছে মরার সময়। একমাত্র সন্তান বলে প্রাপ্যটা অবশ্য তারই হয়। তবু কালিকিংকর স্বেচ্ছায় দিয়ে গেছে। মরার সময় বোধ হয় মানুষটার কাণ্ডজ্ঞান জন্মেছিল।

কথাটা রত্নময়ী ভুলেই ছিলেন; হয়ত পরে মনে পড়ত। হতে পারে, গাঁ-গ্রামের সামান্য কিছু জমিজমা কিংবা মাথা গোঁজার চাল-চালার তেমন কোনো দাম দেন নি তিনি। হয়ত বা মনের আর কোনো অদ্ভুত উপেক্ষা

ছিল। সুধার কথায়, পাশে-সরিয়ে-রাখা ভুলে-থাকা প্রসঙ্গটা মনে না করে পারলেন না।

অল্প একটু ভাবলেন রত্নময়ী। পার্বতীর বরের অবস্থা নেহাৎ খারাপ ছিল না। বদমাশ বাটপাড় লোক—ফন্দি-ফিকির নানা রকম জানত। হয়ত নেশা ভাঙ নষ্টামি করেও শেষ পর্যন্ত কিছু রেখে গেছে। একেবারে ফেলনা নাও হতে পারে।

'মরার সময় মেয়ের শোক উথলে উঠেছিল নচ্ছারটার—' রত্নময়ী বিরস বিরক্ত স্বরে বললেন।

সুধা চট্ করে কিছু জবাব দিল না। পরে বলল, ভাবুক গলায়, 'তা আর কি করবে, কেউ যখন নেই—তখন মেয়ে—'

'মেয়ে! বলো না মা,' রত্নময়ী ঘেন্নায় ঠোঁট কোঁচকালেন, 'এতকাল মেয়ের কথা মনে পড়েনি?'

'পড়ে নি—সে ভালই হয়েছে মা এক রকম। মনে পড়লে ত তোমার ছোট মেয়েকে ছাড়তে হত আগেই।' সুধা যেন কার তরফের হয়ে হঠাৎ ওকালতি করছিল।

'ছাড়তে হত—!' রত্নময়ী অবাক। সুধার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন যুক্তিটা খুঁজছিলেন। না, কোনো যুক্তি তিনি পেলেন না। নিজের দাবী আর প্রত্যয়টা দৃঢ় করে শুধু বললেন, 'ছাড়তাম মেয়েকে।'

সুধা বঁটিটা সরিয়ে রেখেছে আগেই। মেঝের ওপর আঙুল ঘষে ঘষে লেখা বুলোচ্ছিল। চুপচাপ। ফোড়নের ঝাঁঝ লাগছে নাকে। আঁচলটা নাকে মুখে চাপা দিয়ে চুপ-মুখে বসে থাকল আরও খানিকটা সুধা। বলল হঠাৎ, 'ধরে রেখে তুমিই বা আর কি করবে মা! লাভটাই বা কি। বরং ওর যদি—' সুধা কথা শেষ করতে পারল না, রত্নময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

রত্নময়ীর মুখে যে-ভাষা ফুটে উঠেছে, যে-বিস্ময় এবং বেদনা—সুধা তা অনুভব করতে পারল। খারাপ লাগছিল সুধার। কোন্ কথা থেকে কি ভাবে এই নিষ্ঠুর সত্য-র মুখোমুখি হয়ে গেছে সে নিজেই জানে না।

উঠে পড়ল সুধা। চলে গেল।

রত্নময়ী বিহ্বল হয়ে এই-মেয়ের শেষ ছায়াটুকুও দেখলেন যেন। কী স্বার্থপর, আত্মসুখী হয়ে গেছে সুধা! কী ছোট! আরতিও আজ তার কাছে গলগ্রহ! —

রত্নময়ীর বুকটা টনটন করছিল। শূন্য লাগছিল সব। সমস্ত।

•

সময় যে কি করে বয়ে যাচ্ছে কারও হুঁশ নেই। রাত বেড়েছে। ছেলে মেয়েদের খাওয়া-দাওয়া শেষ। যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে। রত্নময়ীও শুয়ে পড়েছেন। ঘরের মধ্যে ঘন অন্ধকার আর শীত।

আরতি ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন কত রাত কে জানে। হয়ত একটা, হয়ত দুটো। রত্নময়ীর চোখে ঘুম নেই। বুকের পাশে আরতি আরও কুঁকড়ে ঘন হয়ে এসেছে। তার মাথার চুলের রুক্ষ গন্ধ রত্নময়ীর নাকে লাগছে, তার গায়ের তাপ অনুভব করতে পারছেন। মেয়েটা যে কতখানি বুক জুড়ে আছে রত্নময়ী এখন তা আরও স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারছিলেন।

সারাদিন কত কথাই ভাবলেন রত্নময়ী। রাগ, দুঃখ, কষ্ট কল্যাণ অকল্যাণের ভয়, শ্রাদ্ধ শান্তি সবই। ভাবনা এবার শেষ হয়ে গেছে। মনও ঠিক করে ফেলেছেন।

এই মাঝরাতে—সব যখন অসাড—নিঃশ্বাসের অস্ফুট শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই, অন্ধকার ছাড়া চোখে আর কিছু দেখা যায় না—এখন কি আশ্চর্য, অদ্ভুত একটা কথা মনে আসছিল রত্নময়ীর।

নিজের মাতৃত্ব আর স্নেহ, লালন-পালনের দাবী, সংসারের মঙ্গল অমঙ্গলের কথাই ভেবেছেন সারাদিন, ধর্ম ভয় আর বিবেক, সংস্কার শুচিতা জ্ঞান নিয়ে ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন। এখন মনে হচ্ছে, এ-সব তুচ্ছ—অন্তত অতটা নয় যতটা মেয়ের ভবিষ্যত। রত্নময়ী জানেন, আরতির ভবিষ্যত তাঁর হাতে নেই। তিনি কিছুই করে উঠতে পারবেন না—তাঁর সাধ্যে কিছুই কুলোবে না। মেয়ে এখন ষোলোয় পড়েছে, আজ বাদে কাল সতের হবে···তার পর আঠার···বিশ···। বয়স বাড়বে—বেড়েই যাবে। তাকে কেউ রুখতে পারবে না। অথচ এ-ঘর বাড়বে না, ভরবে না। এমনি অভাব অনটন, উপোস, দুর্দিন আরও

ঘটা করে আসবে। আরও কষ্ট দুঃখ খেয়ো-খেয়ি, রাগারাগি, কদর্যতা বাড়বে। আরতির ভবিষ্যত—আরতির সেই চেহারা—আজ সুধার দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারেন। সুধারই মতন আরতিকেও পথে নামতে হবে, চাকরি করতে হবে, শরীরেরও লাবণ্য যাবে, যৌবন ভাঙবে, মেজাজ, মন রুক্ষ কঠিন হয়ে উঠবে। মার কাছ থেকে, সংসারের কাছ থেকে ওই মেয়েও সরে যাবে তারপর। রত্নময়ীকে তখন ওই মেয়ে শত দোষে দোষী দেখবে। ঝগড়া করবে, চিৎকার করবে, চোখ রাঙাবে। কেন—? এই ত তাঁর কপাল। তুমি মা হয়েও মেয়েকে বিয়ে-থা, তার নিজের ঘর সংসার, সুখ দুঃখ কিছুই দিতে পারলে না। শুধু তোমার এই ময়লা মরচে-ধরা সংসারের জাঁতায় বেঁধে রাখলে। নিজেরা বাঁচতে এই ত করলে তুমি আমার।

রত্নময়ী এখন সব বুঝে ফেলেছেন। সুধার দিকে চেয়ে চেয়ে, তাকে দেখে দেখে বুঝতেই পারেন, মা আর মেয়ের সম্পর্ক কোথায় কেমন করে টিকে আছে। কী অসহ্য বিরক্তি আর ঘৃণা সুধার চোখে ঠিকরে ওঠে, যেন জ্বলে পুড়ে মরছে মেয়েটা; রত্নময়ীকে দূরে দূরে রাখছে। সরিয়ে সরিয়ে। রত্নময়ী পর হয়ে পড়েছেন। এক বাড়ি-ঘরে পাশাপাশি থেকে, একই সঙ্গে খেয়ে শুয়েও, গর্ভধারিণী হয়েও সবচেয়ে অনাত্মীয় আজ তিনি।

আরতিও তাঁকে এমনি করে একদিন পর করে দেবে। দোষ তার নয়, দোষ রত্নময়ীর। দোষ তাঁর অক্ষমতার।

সেই পর যদি করতেই হয়, এখনই করুক; তবু মেয়েটা তাতে সুখ পাবে। বড়ঠাকুর লিখেছেন—দেশে এখনও আরতির বাবার কিছু জমিজমা ভিটে বাড়ি আছে। সবই আরতির প্রাপ্য। দেশে তার বাপের ভিটেয় ফিরে যাক আরতি। সুধা তাই চাইছে। বড়ঠাকুর চেষ্টা চরিত্র করলে একটা বিয়ে-থাও দিয়ে দিতে পারবেন। মোটা ভাত কাপড়, স্বামী, ছেলেপুলে নিয়ে সুখে শান্তিতে বাঁচতে পারবে। রত্নময়ীর কাছে কি আছে? অন্যের কাছে হাত পেতে নেওয়া পয়সায় দুটো লাল মোটা-চালের আধপেটা ভাত, এক হাতা জোলো ডাল, শাক চচ্চড়ি—। মেয়েকে পরনের কাপড় দিতে পারেন না, চুলের তেল, শীতের জামা···। না, এখানে সত্যিই কিছু নেই।

এ-বাড়িতে সুখ হারিয়ে গেছে, শান্তি ফুরিয়ে গেছে। এখানে শুধু খিদে আর কাতরানি, বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা। ক্ষুদ্রতা আর দীনতা। মন নেই আর, সবই ছোট হয়ে গেছে।

রত্নময়ী নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। বালিশের পাশে মুখ রেখে কচি মেয়ের মতন। গলা বুক ফেটে যাচ্ছিল কষ্টে আর হাহাকারে।

ঘুম নয় একটু তন্দ্রার মতন এসেছিল সুধার; তাও ভেঙে গেল। কেমন একটা অবয়বহীন তালগোল পাকানো স্বপ্ন না ঘোর চোখে জড়িয়ে এসে সুধাকে চমকে দিল। সুধা ভয় পেয়ে চোখ চাইল। ঘোরটা ভাঙল, স্বপ্ন ছিঁড়ে গেল। অনুভব করতে পারল সুধা—চোখের কোলে একটা বিশ্রী রকম মিথ্যে তাকে ঠকাতে এসেছিল। কিছু সত্যি নয়।

সত্যি এই—এই শুকনো খটখটে মাটি—ছেঁড়া তোশক, একটা ঠাস কাঁথা—আর শীত। আর এই অন্ধকার।···বাস্তবিকই আরতি ঘোড়ার গাড়ি চেপে চলে যাচ্ছে না। সে আছে। এই ঘরে। মার পাশে শুয়ে।

এমনি করেই সে থাকবে। এই নোংরা ঘরে। মাথার কাছের জানলার ফাঁক দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা আসবে। নোনা দেওয়ালের ভ্যাপসা নাকের কাছে। চিট বালিশ মার মুখের দোক্তা-পাতার গন্ধ—তার পাশে তোর মাথা।

আরতি চলে যাচ্ছে না। ঘোড়ার গাড়ি আসে নি। মা চাউমাউ করে কাঁদছে না। আরতি গাড়ির বাইরে গলা বাড়িয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছে না: দিদি আমি যাব না; ও দিদি—দিদি গো।

সুধা কেন যে এমন বেযাড়া স্বপ্নটা দেখল, বুঝতে পারল না। গলার কাছে অসহ ভার আর ভয়টা এখনও আছে। আস্তে করে ঢোক গিলল সুধা।

তারপর অন্ধকারের মধ্যে খানিকক্ষণ চোখ খুলে রাখল। ভাল লাগল না। চোখের পাতা বন্ধ করল। ভাবল, ভাবতে লাগল। যেন এক একটা দমকা হাওয়া এসে খড়কুটো বালি শুকনো পাতা ছিটকে ফেলতে লাগল তার মনে।

তুই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যা আরতি! সুধা মনে মনে বলল কি যেন

ভাবতে ভাবতে : চলে যা তুই। বাবা মা নিয়ে কেউ ধুয়ে খায় না। বাবা মা তুই দুই-ই হারিয়েছিস। গেছে ভালই হয়েছে। থাকলে এই কষ্টই পেতিস। তুই যা, তোর বাবা তোর জন্যে তবু কিছু রেখে গেছে। মাথার ওপর আশ্রয় পাবি, খাবার দুটো ভাত পাবি। কি করবি এখানে থেকে? আমায় দেখ। আমার অবস্থাই হবে তোর।

সুধা সত্যিই যেন অন্ধকারে ছোট বোনকে আজ তার মন বুক সব খুলে দেখাচ্ছিল। কোনো রকম লুকোচুরি রাখছিল না।

মা-র পাশ ঘেঁষে শুয়ে থেকে তোর জীবন কাটবে না, আরতি। সুধা বোনকে বোঝাচ্ছে যেন : একদিন বুঝতে পারবি ওখানে কিছু নেই। তুই যা, আমার দায়-দায়িত্ব একটু হাল্কা কর। আমার মতন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে তোর কি দরকার! আজ যদি আমি মরে যাই, কাল তোর কি হবে বুঝছিস না? রাস্তায় গিয়ে মরবি, না হয় এই পাড়ার বকাটে কোনো ছোঁড়া তোকে ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে পালাবে।

সুধা তর তর করে এতগুলো কথা ভেবে হঠাৎ যেন থেমে গেল। মনে হল, আরতি যেন অবাক ফ্যালফ্যালে চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ঠোঁট নড়ছে আরতির। স্বপ্নের ঘোড়ার গাড়িতে ঠিক এইভাবে, এমন মুখ করে ও গলা বাড়িয়েছিল। সুধা বুঝতে পারল আরতির ঠোঁট নড়ার ভাষা।

বুঝতে পেরে বড় চাপা গভীর দুঃখের একটু হাসি হাসল সুধা। যেন বলল, হ্যাঁ—আমরা এমনই। আমাদের মন এমনই ছোট। পনেরো বছরকে ভুলে যাই, যদি সুযোগ পাই ভুলে যাবার। আমরা সবাই মনে এখন ঠিক এইরকম ছোট হয়ে গেছি। বাঁচার, পেট ভরাবার, গায়ের কাপড়ের রেষারেষিতে—এখন এই রাক্কুসে দিন আমাদের এই রকম ছোট করে তুলেছে। আমরা মেয়ে বেচছি, বোন তাড়াচ্ছি, বউ ছাড়ছি—ওই রাস্তার কাঙালদের মতন। কি করব, কি করতে পারি বল!

সুধা মুখের মধ্যে কাঁথার অনেকখানি কামড়ে চেপে গলায় ঠাস করে ঢুকিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু চোখ যেন ছিঁড়ে ফেটে একটা অদ্ভুত ভয়ংকর কান্না বাইরে আসতে চাইছিল।

কুড়ি

রিক্‌শাটা গণেশ অ্যাভিন্যুর মুখে এসে পড়েছে। রোদ ঠিকরে এসে লাগছে মুখে। শীতের হাওয়ায় মাঝে মাঝে পথের ধুলো জঞ্জাল উড়ে আসছে।

বাসু সোজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে। পাশে আরতি। গঙ্গায় স্নান করে সেই যে রিক্‌শায় বসেছে—ঠিক সেই ভাবেই বসে আছে। মাথার ভিজে চুল রোদ লেগে লেগে কেমন শক্ত শক্ত। পায়ের কাছে পরনের ভিজে শাড়িটা পড়ে আছে। গায়ে খাটো মোটা একটা কোরা শাড়ি, গামছাটা বুকের ওপর জড়ানো। রোদে শুকিয়ে এসেছে।

আরতির অল্প কিছু চুল কপালের পাশ দিয়ে এলোমেলো হয়ে কাঁধে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখটা রুক্ষ, একটা অস্বাভাবিক শুষ্কতা। চোখ লাল, পাতা কেমন ফোলা ফোলা। জল পড়ে পড়ে গালে শুকোচ্ছে। আবার কখন জল টলটল করে আসছে চোখে, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ফোঁপানির শব্দ, নাক টানার শব্দ ছাড়া আর একটিও কথা নেই। পুরু ভাঙা ঠোঁট দুটো থেকে থেকে কাঁপছে থর থর করে। দাঁত দিয়ে কামড়ে সেই আবেগকে চাপবার চেষ্টা করেছে আরতি আগে—এখন আর তাও না।

রিক্‌শাটা বড় রাস্তার পাশ দিয়ে ঘন্টি বাজিয়ে অনেকটা এসে এবার গলি ধরল।

রিক্‌শায় ওঠার পর থেকে না বাসু না আরতি কেউ কোন কথা বলেনি। বাসু বার কয়েক মাথা চুলকেছে, দুহাত হাঁটুতে ঘষেছে, কাঁধ ঝেড়েছে—এবং এত ভুমিকার পর—কিছু বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত কি বলবে ঠিক করতে না পেরে বোকার মতন একবার আরতির মুখের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

বাসুর কেমন যেন লাগছে। গঙ্গায় স্নান করে কোরা কাপড় পরে দুচোখ-ভাসানো-কান্না আর ফোলা ঠোঁটের কাঁপুনি নিয়ে আরতি যখন রিকশায় এসে

বসল, তখন থেকে বাসুর চোখে আরতি যেন অন্য কেমন হয়ে গেল। বাসুর কেমন লাগছিল, কী রকম অদ্ভুত যে! গায়ের পাশে গা, পায়ের পাশে পা— সেই আরতি—তবু কেমন অন্য মানুষ।

বাসু বেশ কয়েক বারই চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে আরতিকে। তার বোন নয় এ—তবে কে? জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত দেখেছে তাদের বাড়িতে, তাদের কাছে—আর ব্যাস্ কোথা থেকে এক চিঠি এল, আর সব কিছু কাটাকুটি হয়ে গেল। ইয়ার্কি নাকি?

এই দুনিয়াই তাজ্জব! ভানুমতীর খেল। কিন্তু মা দিদি ত আর ঠাট্টা করছে না। না না এ-সব নিয়ে ঠাট্টা কেউ করে না। ঠাট্টা তামাশা হলে— সকালে বাড়ির চেহারাটা অমন হয়ে যেত না। বাবা মারা যাওয়ার সময় এমনি করে সকলে কেঁদে উঠেছিল, চিৎকার করে ফুঁপিয়ে হাউমাউ করে। না, তামাশা ঠাট্টা নয়। সবই সত্যি।

কিন্তু কি করে যে সত্যি হয়—বাসু তার মাথা অনেক ঘামিয়েও কোনো কূল-কিনারা করতে পারল না। ছেলেবেলায় এবং সেদিন পর্যন্ত আরতিকে যখন তখন মার-ধোর দিয়েছে মনে করে বাসুর হঠাৎ এখন খুব দুঃখ হচ্ছিল।

রিকশা গলির একটা মোড় ঘুরল। বাসু আবার একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখল আরতিকে। ইস্—কী ভীষণ কাঁদছে রে বাবা! চোখের জমিটা লাল টক-টকে হয়ে উঠেছে; রোদ লাগছে নাকি? পর্দাটা ফেলে দেবে?

বাসু পর্দা ফেলল না। যে লোকটা চিঠি লিখেছে, তার একটা চেহারা কল্পনা করে নিয়ে সেই শয়তানটাকে মনে মনে গালাগাল দিতে লাগল।

রিকশাটা একবার টাল খেল। আরতি বাসুর গায়ে একটু টলে পড়েই আবার সোজা হয়ে বসল।

আরতির চোখের সামনে সবটাই ফাঁকা। এই রাস্তাঘাট, গঙ্গাস্নান, কোরা শাড়ি—সবই শূন্য। মনের মধ্যে একটা হু-হু বাতাস বয়ে যাচ্ছে যেন। গঙ্গায় ডুব দেবার সময় যেমন মাথার ওপর—চোখের কানের পাশে একটা টানা সোঁ সোঁ—হু-হু বয়ে যাচ্ছিল—অনেকটা তেমনি। কিছু ভাবতে পারছে না আরতি, ভাবতে চাইছে না। শুধু মা আর মা। মার মুখ, দিদির

মুখ—সেই কেমন থমকে ওঠা কাঠ শক্ত মুখ, তারপর আরতিকে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা।

আরতির নাকি অন্য মা ছিল, অন্য বাবা ছিল। মা কবেই মরে গিয়েছিল, বাবা গত মঙ্গলবার মারা গেছে। আরতির তার জন্যে কোথাও একটু দুঃখ হচ্ছিল না। সত্যি, হচ্ছিল না। তাদের কথা আরতি ভাবছিল না। কিন্তু যখনই মনে পড়ছিল, এই মা তার মা নয়—তখন কোথা থেকে একটা সাঙ্ঘাতিক কান্না ঝাঁপ দিয়ে গলায় এসে পড়ছিল—বুকের মধ্যে যেন কেউ নোড়া দিয়ে জোরে জোরে কী গুঁড়ো করে দিচ্ছে। বুকের হাড়গুলো ভেঙে যাচ্ছিল।

এই মা তার মা নয়? এই বাবা তার বাবা নয়? মা বলেছে, না; দিদি মাথা নেড়ে বলেছে, না।

আরতি যদি মরে যেত আজ সকালে—বেশ হত। মা বলেছে, কেঁদে কেঁদে বুকে জড়িয়ে, অমন করিস না আরতি, আমরাও কি মরে গেছি নাকি? নেহাত করতে হয় তাই অশৌচটা কর। তিল-কাঞ্চন শ্রাদ্ধ। না করলে অকল্যাণ হয়, পাপ হয়। তারপর আর কি—? যেমন আছিস—যেমন ভাবছিস, সবই তেমনি থাকবে।

আরতি ফাঁকা চোখে মরা মন নিয়ে তাকিয়ে থাকল। কিছু দেখল না, দেখতে পাচ্ছিল না।

কার সাইকেল প্রায় রিকশার গায়ে এসে পড়েছিল। রিকশাটা আবার টাল খেল। আরতি বাসুর গায়ে টলে পড়ে সোজা হয়ে বসল। একটু হুঁশ হল তার।

তারপর চেয়ে দেখে—মদন বড়াল লেন শেষ হয়ে রিকশাটা তাদের গলিতে ঢুকছে। দুটো কাক ঝটপট করতে করতে উড়ে গেল। সব চেনা, সব জানা, সব তার হাতের কাছে। ওই ত তাদের বাড়ি। মা হয়ত দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, দিদিও চৌকাঠের পাশে।

আর কি যে হল আরতির—হঠাৎ ভীষণ ফুঁপিয়ে শব্দ করে কেঁদে উঠল।

বাসু যেন চমকে উঠে মুখ ফেরাল। আবার কাঁদছে; আ, কী ভীষণ বিশ্রীভাবে কাঁদছে! বাসুর নিজেরও কান্না পাচ্ছিল সেই মুখের দিকে চেয়ে।

বাসু হঠাৎ বললে—যেন বিরক্ত হয়েই বলতে চাইল অথচ অন্য সুরে বলে ফেলল, 'আঃ! তা তুই অত কাঁদছিস কেন?' কাঁধে ঠেলা দিল আরতির, 'তোর এত কাঁদবার কি আছে রে! অ্যাঁ—! আমার বাবা আর মরে নি, না—?'

আরতি চোখ ছাপানো জল নিয়ে বাসুর চো[illegible] চোখে পাথরের মতন তাকিয়ে থাকল। সমস্ত মুখটা যেন সাঙ্ঘাতিক এক চাবুক খেয়ে অসাড় হয়ে গেছে। কালশিটে ফুটেছে।

তবু আরতির ঠোঁট ফুলে ফুলে কি যেন বলতে চাইছিল।

কথাটা বলার পর বাসুরও কানে লেগেছে নিজেরই। বাসু শুধরে নেবার জন্যে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে পারল না। না, এতকালের দুজনের বাবা—আজ একজনের। বাসুর। আমাদের বাবা নয়, আমার।

আরতির ফোলা কাঁপা ঠোঁটে একটুও শব্দ নেই। শীতের রোদ তার ঠাণ্ডা অসাড় ঠোঁটে আর সাড়া তুলতে পারল না।